এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

পঞ্চম খন্ড

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক : মাসিক মদীনা

সহযোগিতায় : মাওলানা আবদুল আজীজ (রহঃ)

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা : ৫৫/বি. পুরানা পল্টন (দোতলা), ঢাকা-১০০০

এহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন
ইমাম গাযযালী (রহ.)
(পঞ্চম খণ্ড)

অনুবাদক :
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক :
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১১৪৪৬

প্রথম প্রকাশ :
রবিউল আউয়াল ১৪১৫ হিজরী

নবম সংস্করণ :
আগস্ট ২০১৭ইংরেজী
শ্রাবণ ১৪২৪ বাংলা
জিলকদ ১৪৩৮ হিজরী

কম্পিউটার :
বিশ্বাস কম্পিউটার
৩৮/২ খ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN- 984-8367-92-6

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতে ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালী (রহঃ) (৪৫০ হিঃ– ৫০৫ হিঃ) রচিত অমর গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর পঞ্চম তথা শেষ খণ্ডের অনুবাদ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হল। প্রায় নয়শ' বছর আগে এ মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে সমভাবে পঠিত ও সমাদৃত। মানব রচিত দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হওয়ার নযীর আছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রহঃ) মহান আল্লাহর নিকট কতটুকু মকবুলিয়ত অর্জন করেছিলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোই তা প্রমাণ করে। এ মহান সাধক সম্পর্কে অনেক মনীষীরই মন্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি আশ্চর্য মু'জেযাবিশেষ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের উম্মত যাতে গোমরাহ না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন যেসব লোক সৃষ্টি করবেন বলে হাদীস শরীফে সুসংবাদ রয়েছে, ইমাম গায্যালী (রহঃ) ছিলেন তারই অন্যতম বাস্তব নমুনা।

'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' অর্থ, ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের নবজীবন দান। কিতাবখানি তার নামের কতটুকু সার্থকতা দান করেছে, সেকথা ব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন পড়ে না।

'এহইয়ার' অনেকগুলো ব্যাখ্যা-গ্রন্থ এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ, টীকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোক অবশ্য এ মহান গ্রন্থের সমালোচনাও করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ইমাম সাহেব এ গ্রন্থে যে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো কোন্ কিতাব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা যেমন লিখেননি, তেমনি কোন সনদ বা বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করেননি। ফলে, হাদীসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাঁর প্রকাশভঙ্গি ওয়ায়েযসুলভ তাঁর আগে কেউ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ধারা অবলম্বন করেননি। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকটা গাম্ভীর্য হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গাযযালী (রহঃ) নিজেই ছিলেন একজন স্বীকৃত ইমাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সনদসূত্র ছিল। তাঁর

উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আল্লামা জোয়াইনী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সে সূত্রটি ছিল এতই প্রসিদ্ধ যে, প্রতিটি হাদীসের সাথে সে বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী (রহঃ) যে অনন্য রীতিটি অবলম্বন করেছেন এটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। পূর্ববর্তী রচনাশৈলীর সাথে এর মিল না থাকাটা বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত নয় কোনক্রমেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম গায্যালীর (রহঃ) এ পুস্তক পৃথিবীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটিও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদ দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। বাংলা ভাষায় এহইয়ার অনুবাদ ইতোপূর্বে হয়েছে। তারপরও আমি কেন পুনরায় এ মহান গ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিলাম, সে কৈফিয়ত দিতে চাই না। বিজ্ঞ পাঠকগণই তা অনুভব করতে পারবেন। তাছাড়া, মুসলিম জনগণের নিত্যপাঠ্য এ মহান গ্রন্থটির প্রচার-প্রসার যত বেশি হয়, ততই সেটা কল্যাণকর বলে আমার ধারণা।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারও পাঠকগণই করবেন।

আল্লাহর রহমতে গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সমাপ্ত হলো।

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত কারণে আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করতে পারি না। তাছাড়া আমার শক্তিও নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুবাদ বা মুদ্রণে ভুল-ক্রটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজ্ঞজনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যে কোন ধরনের ক্রটি ধরা পড়লে দরদের সাথে জানিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। এতদসঙ্গে সকলের দোয়া চাই, আল্লাহ্ পাক যেন এ ধরনের কাজ আরো অধিক পরিমাণে করার তাওফীক দান করেন।

বিনীত

রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিঃ

মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়
তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল ধর্মের মনযিলসমূহের মধ্যে একটি মনযিল এবং বিশ্বাসের মকামসমূহের মধ্যে অন্যতম মকাম। এটি জানার দিক দিয়ে যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আমলের দিক দিয়েও তেমনি কঠিন। জানার দিক দিয়ে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণ, উপায়-উপকরণ ও কারণাদির উপর ভরসা করা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকের নামান্তর। আবার এগুলো থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও শরীয়তের উপর আপত্তি উঠে। সুতরাং কারণাদির প্রতি দৃষ্টি না দেয়া এবং এগুলোর উপর ভরসাও করা–এ বিষয়টি দুর্বোধ্য। তাই তাওয়াক্কুলের অর্থ এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, যা তাওহীদেরও অনুকূল এবং বিবেক ও শরীয়তের সাথেও সামঞ্জস্যশীল হয়, নেহায়েত কঠিন ও সূক্ষ্ম ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে যে সকল আলেমের দৃষ্টিতে বস্তুনিচয়ের স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাঁদের ছাড়া এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার সাধ্য কারও নেই। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণ দেখে জেনে নিয়েছেন এবং আল্লাহতা'আলা তাঁদের দ্বারা যেভাবে বর্ণনা করিয়েছেন, তাঁরা সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আমরা এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখানে একটি ভূমিকা ও দু'টি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করব। ভূমিকায় তাওয়াক্কুলের ফযীলত এবং প্রথম পরিচ্ছেদে তাওহীদ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

তাওয়াক্কুলের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

অর্থাৎ, ভরসাকারীদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার জন্যে যথেষ্ট।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।

সুতরাং সেই মকামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়, সেখানে পৌঁছলে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। যার জন্যে আল্লাহতা'আলা যথেষ্ট হন এবং যাকে ভালবাসেন, সে অত্যন্ত সফলকাম। কেননা, যাকে ভালবাসা হয়, তার আযাব হবে না এবং সে দূরে ও অন্তরালে থাকবে না। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নয়?

এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যথেষ্ট মনে করবে, সে তাওয়াক্কুল বর্জনকারী হবে। আরও এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ, তিনি এমন শক্তিধর যে, কেউ তাঁর আশ্রয়ে এলে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করেন না। আর তিনি এমন কৌশলী যে, কেউ তাঁর কৌশলের উপর ভরসা করলে তিনি তাকে নিরাশ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের এবাদত কর, তারা তোমাদের মতই বান্দা।

এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত সবাই তোমাদের মত অভাবগ্রস্ত। অতএব, তাদের উপর কেমন করে ভরসা করা যায়? আরও এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের রুযীর মালিক নয়। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে রুযী অন্বেষণ কর এবং তাঁর এবাদত কর। অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই; কিন্তু কপট বিশ্বাসীরা তা বুঝে না।

এসব আয়াত ছাড়াও কোরআন মজীদে তাওহীদ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতসমূহে একথাই বলা হয়েছে যে, অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

হাদীস গ্রন্থসমূহেও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে হজ্জের মওসুমে উম্মতসমূহ দেখানো হয়েছে। আমি আমার উম্মতকে দেখেছি, তাদের দ্বারা সকল পাহাড় - পর্বত, উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকেনি। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হল ঃ তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। অতঃপর বলা হল ঃ এদের সাথে আরও সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ যারা অঙ্গে দাগ দেয় না, ভাবী শুভাশুভ বিশ্বাস করে না এবং নিজের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। একথা শুনে ওকাশা ইবনে মুহসিন দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ

আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ আমার জন্যেও দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ এ দোয়ায় ওকাশা অগ্রগামী হয়ে গেছে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে– যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থ ভরসা কর, তবে আল্লাহ পাখিদের মত তোমাদেরও রিযিক দেবেন। পাখিরা ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নীড় ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنِ انْقَطَعَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ مُؤْنَةٍ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهَا ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহতা'আলার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে যাবতীয় পরিশ্রম থেকে রক্ষা করেন এবং ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার হাতেই ছেড়ে দেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি সবার চাইতে অধিক বিত্তবান হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত নিজের সামনের বস্তুর তুলনায় আল্লাহতা'আলার নিকটবর্তী বস্তুর উপর অধিক ভরসা করা। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবারের লোকজন যখন উপবাসের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তিনি আরও বলতেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার আমাকে এ নির্দেশই করেছেন। সে মতে কোরআনপাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ, আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দিন এবং আপনি তাতে অটল থাকুন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে তাবীযগণ্ডা করায়, সে তাওয়াক্কুল করে না। অর্থাৎ, কোরআন মজীদ ও শরীয়তের সাধারণ নীতি অনুযায়ী তাবীযগণ্ডা করানো যদিও জায়েয; কিন্তু এদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করা তাওয়াক্কুলের দাবী।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। একথা বলার কারণ এই যে, তাঁকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য ধরা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

অর্থাৎ, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী।

এ উক্তি বাস্তবায়িত করার জন্যেই তিনি জিবরাঈলকে একথা বলেছিলেন। তাঁর এই কথা রক্ষা করার প্রতি ইঙ্গিত করেই কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى

অর্থাৎ, সেই ইবরাহীম, যে তার কথা রক্ষা করেছিল।

আল্লাহতা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, হে দাউদ! যে ব্যক্তি কেবল আমার মযবুত রশি ধারণ করবে, মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না, তার সাথে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই প্রবঞ্চনা করলেও আমি তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেব।

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি এই যে, একবার হযরত ইবরাহীম খাওয়াস এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা কর, যিনি চিরজীবী– কখনও মৃত্যুবরণ করেন না।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ এ আয়াতের পর আল্লাহ ছাড়া আর কারো

কাছে ভিক্ষা চাওয়া বান্দার উচিত নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ মানবের পক্ষে নিন্দনীয় রিযিকের অন্বেষণে নিজের ফরয কর্ম থেকে গাফেল হয়ে পড়া এবং পরকালের অধঃপতন ডেকে আনা উচিত নয়। সে দুনিয়াতে রিযিক ততটুকুই পাবে, যতটুকু লিখা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যখন মানুষের কাছে অন্বেষণ ছাড়াই রিযিক আসে, তখন বুঝা যায়, রিযিকের প্রতিও মানুষ খুঁজে নেয়ার নির্দেশ রয়েছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ আমি জনৈক দুনিয়াত্যাগী দরবেশকে প্রশ্ন করলামঃ তুমি কোথা থেকে রিযিক খাও? সে বলল ঃ এটা আমার জানার বিষয় নয়। পরওয়ারদেগারকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কোথা থেকে আমাকে খাওয়ান? হরম ইবনে হাব্বান হযরত ওয়ায়েস করনীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন। হরম প্রশ্ন করলেন ঃ জীবিকা কিভাবে চলে? তিনি বললেন ঃ সে সব অন্তরের জন্যে পরিতাপ, যাতে সন্দেহ মিশ্রিত রয়েছে। উপদেশে তাদের কি উপকার হবে?

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাওহীদের মাহাত্ম্য

জানা থাকা দরকার যে, ঈমানের প্রকারসমূহের মধ্যে তাওয়াক্কুলও একটি। এর মূল হচ্ছে এলম তথা জ্ঞান। এর ফলাফল হচ্ছে, আমল তথা কর্ম। এরপর তাওয়াক্কুল শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে এর হাল বা অবস্থা। এখানে আমরা তাওয়াক্কুলের মূল জ্ঞান সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব। মূল অভিধানে এটাই ঈমান। কেননা, ঈমানের অর্থ তাসদীক তথা সত্যায়ন করা। যে সত্যায়ন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হয়, তাই জ্ঞান। ঈমানের প্রকার অনেক। কিন্তু আমরা সে সব প্রকার বর্ণনা করব, যেগুলোর উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তাওহীদ, যা পবিত্র এই কলেমা থেকে বুঝা যায়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করা, যা لَهُ الْمُلْكُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্য তাঁরই। তৃতীয় প্রকার আল্লাহর দানশীলতা ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করা, যা لَهُ الْحَمْدُ বাক্য থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, তার ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়, যা তাওয়াক্কুলের মূলভিত্তি।

বলা বাহুল্য, তাওহীদের চারটি স্তর রয়েছে– এক, সারাংশ, দুই, সারাংশের সারাংশ, তিন, বাকল এবং চার, বাকলের উপরকার বাকল। অজ্ঞ লোকদেরকে বুঝাবার জন্যে আমরা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। তাওহীদকে একটি আখরোটের উপরকার বাকল মনে করা উচিত। আখরোটের উপরিভাগে উপর-নিচে দু'টি বাকল থাকে, একটি সারাংশ থাকে এবং সারাংশে থাকে তৈল। সুতরাং তাওহীদের প্রথম স্তর হচ্ছে আখরোটের উপরকার বাকল। তা হচ্ছে শুধু মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করা, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে গাফেল থাকা কিংবা মনে মনে তা অস্বীকার করা– এটা হচ্ছে মুনাফিক তথা কপট বিশ্বাসীদের তাওহীদ। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মুখে কলেমা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা। এটা হচ্ছে সাধারণ জনগণের তাওহীদ। তৃতীয় স্তর হচ্ছে সত্যের নূরের মাধ্যমে কলেমার অর্থ স্বর্গীয় প্রেরণায় প্রকটিত হওয়া এবং তা প্রত্যক্ষ করা। এটা নৈকট্যশীলদের তাওহীদ। চতুর্থ স্তর এই যে, অস্তিত্ব জগতে এক ও অভিন্ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু না দেখা। এটা সিদ্দীকগণের তাওহীদ। সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় এর নাম "ফানা ফিত্তাওহীদ" (তাওহীদে বিলুপ্তি)। কারণ, এই স্তরে ব্যক্তি যেখানে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া কিছুই দেখে না, সেখানে নিজের অস্তিত্বকেও দেখে না। সুতরাং তার সত্তা নিজের চোখেও বিলুপ্ত থাকে।

উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কেবল মৌখিক তাওহীদপন্থী। তার তাওহীদের উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই পাবে। অর্থাৎ সে মুজাহিদদের তরবারি থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, সে কলেমার অর্থ বুঝে এবং অন্তর দ্বারা তা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের তাওহীদ অন্তরের উপর এক গ্রন্থিবিশেষ, যাতে উন্মোচন ও উদ্দীপনা হয় না। এতদসত্ত্বেও এই তাওহীদ দ্বারা আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যদি এর উপরই জীবনাবসান হয় এবং গুনাহের কারণে তা দুর্বল না হয়। এই গ্রন্থিকে ঢিলে করার ও খুলে দেয়ারও কতকগুলো কৌশল রয়েছে। সেগুলোকে "বেদআত" বলা হয়। আরও কিছু পন্থা রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা এই গ্রন্থিকে মযবুত করা ও ঢিলেকারীদের কৌশল প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এসব পন্থাকে বলা হয় "কালাম শাস্ত্র"। যে কালাম শাস্ত্র জানে, তাকে মুতাকাল্লিম এবং তার বিপরীতকে মুবতাদে' বলা হয়। জনসাধারণের অন্তর থেকে তাওহীদের গ্রন্থি খুলে ফেলার জন্য মুবতাদে' যে অপচেষ্টা চালায়, তা ব্যর্থ করে দেয়াই মুতাকাল্লিমের লক্ষ্য থাকে।

তৃতীয় ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, সে বিশ্ব-জাহানের হর্তাকর্তা একজনকেই বিশ্বাস করে। সে যদিও জানে, বস্তু সামগ্রী অনেক; কিন্তু এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেগুলোকে সে এক পরাক্রমশালী আল্লাহ থেকেই প্রকাশিত বলে জানে।

চতুর্থ ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে বস্তুসামগ্রীকে বহুত্বের দৃষ্টিতে নয়; বরং একত্বের দৃষ্টিতে দেখে। এটি তাওহীদের সর্বোচ্চ স্তর।

অতএব, প্রথম স্তর হচ্ছে আখরোটের উপরের ছাল, দ্বিতীয় স্তর দ্বিতীয় ছাল, তৃতীয় স্তর সারাংশ এবং চতুর্থ স্তর তৈলের ন্যায়, যা সারাংশ থেকে নির্গত হয়। উপরের ছাল কোন উপকারে আসে না। খেলে তিক্ত লাগে। আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন নিভিয়ে দেয় এবং ধোঁয়া বৃদ্ধি করে। ঘরে রাখলে অহেতুক জায়গা আবদ্ধ রাখে। মোটকথা, কয়েকদিন আখরোটের হেফাযত করা ছাড়া এটা কোন কাজে লাগে না। সারাংশ বের করে ফেললে এটা ফেলে দেয়া হয়। মৌখিক তাওহীদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। এরূপ তাওহীদে উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। স্বল্পকালীন উপকার এই যে, মন ও দেহকে রক্ষা করার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত কাজে লাগে এবং মুনাফিকের দেহকে মুজাহিদদের তরবারির গ্রাস হতে দেয় না। কারণ, তাদের প্রতি অন্তর চিরে দেখার নির্দেশ নেই। তারা কেবল বাহ্যিক ইসলামকে দেখে। কিন্তু মৃত্যুর সময় এই তাওহীদ তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাজে আসবে না।

আখরোটের দ্বিতীয় ছাল প্রথম ছালের তুলনায় বাহ্যত উপকারী। এর দ্বারা সারাংশের হেফাযত হয় এবং রেখে দিলে সারাংশকে বিগড়ে যেতে দেয় না। পৃথক করে নিলে জ্বালানি কাজেও আসে। কিন্তু এই উপকার সর্বাবস্থায় সারাংশের তুলনায় কম। এমনিভাবে অন্তরে কেবল কলেমার অর্থের বিশ্বাস রাখা মৌখিক কলেমার তুলনায় অনেক উপকারী। কিন্তু কাশফ্ ও প্রত্যক্ষকরণের তুলনায় এর মান কম। কাশফ ও প্রত্যক্ষকরণের ফলস্বরূপ যে উন্মোচন ও প্রশস্ততা অর্জিত হয়, তাই নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে—

فمن يرد الله ان يهد يه يشرح صدره للاسلام

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দেন।

এ আয়াতেও তাই উদ্দেশ্য—

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কি নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে?

সারাংশ স্বয়ং ছালের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য। তবু তৈল বের করার পর তাতে কিছু গাদের মিশ্রণ থাকে। এমনিভাবে জগতের হর্তাকর্তাকে বিশ্বাস করাও সাধকদের একটি সুউচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এতে কিছু না কিছু ভ্রূক্ষেপ গায়রুল্লাহ্র প্রতিও থেকে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই দেখে না, তার তুলনায় এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি বহুত্বের দিকে থাকে।

এখানে প্রশ্ন হয়, মানুষ পৃথিবীতে এক সত্তা ছাড়া কিছুই প্রত্যক্ষ করবে না, তা কেমন করে সম্ভব? কেননা, সে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, তরুলতা ও অন্যান্য শরীরী বস্তুসমূহ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে। এসব বস্তু এক নয়— অনেক। অতএব, অনেক বস্তু এক কেমন করে হবে? এর জওয়াব এই, কোন কোন বস্তু কোন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখলে অনেক হয়; কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে দেখলে একই হয়। উদাহরণতঃ মানুষকে যদি আমরা আত্মা, দেহ, হাত-পা, শিরা-উপশিরা, অস্থি ও অন্ত্রের দিক দিয়ে দেখি, তবে তাতে বহুত্ব থাকে; কিন্তু যদি অন্যদিক দিয়ে অর্থাৎ মানবতার দিক দিয়ে দেখি, তবে সে এক। অনেকেই মানুষকে দেখে এবং তাদের অন্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহুত্ব ও পৃথক হওয়া ধারণাও থাকে না। আসলে মানুষ যখন একত্বের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকে, তখন সে একের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য দেখে না। আর যখন বহুত্বের দিকে লক্ষ্য করে, তখন এসব বস্তু যে আলাদা আলাদা, সেদিকে কল্পনা ধাবিত হয়। এমনিভাবে স্রষ্টা হোক কিংবা সৃষ্টি সকলকে দেখার আলাদা আলাদা ও বহু দৃষ্টিকোণ রয়েছে। কোন দৃষ্টিকোণে তারা এক এবং কোন দৃষ্টিকোণে অনেক। এখানে দৃষ্টান্তটি যদিও উদ্দেশ্যের সাথে পুরাপুরি খাপ খায় না, তবু এর মাধ্যমে মোটামুটিভাবে প্রত্যক্ষকরণে অনেক যে এক হতে পারে, তা বুঝা যায়।

সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়ার অবস্থাটি কখনও সার্বক্ষণিক হয়ে থাকে, আবার কখনও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। সত্য বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ীই হয়ে থাকে। এটা সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকা খুবই বিরল। বর্ণিত আছে, হুসাইন

ইবনে মনসূর হাল্লাজ ইবরাহীম খাওয়াসকে সফর করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি বর্তমানে কি কাজে মশগুল আছ? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ তাওয়াক্কুল পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে আজকাল আমি সফর করছি। হুমায়ুন ইবনে মনসূর বললেন ঃ তুমি অন্তর আবাদ করার কাজে সারা জীবন বিনষ্ট করেছ। ফানা ফিত্তাওহীদ (তাওহীদে বিলুপ্তি) কোথায় গেল? সেটা অবলম্বন কর না কেন? উদ্দেশ্য এই, হযরত খাওয়াস তৃতীয় স্তরের তাওহীদ পাকাপোক্ত করার কাজে মশগুল ছিলেন, আর হুমায়ুন তাঁকে চতুর্থ স্তর অবলম্বন করতে বলেছিলেন।

এ পর্যন্ত তাওহীদপন্থীদের মকামসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। এখন সেই তাওহীদের ব্যাখ্যা শোনা দরকার, যার উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। সে মতে চতুর্থ স্তরের তাওহীদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করা উচিত নয়। তাওয়াক্কুলও এর উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং তৃতীয় প্রকার তাওহীদ থেকেই তাওয়াক্কুলের হাল অর্জিত হয়। প্রথম প্রকার তাওহীদ হল নিফাক, যার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর পাকাপোক্ত করার নিয়মপদ্ধতি কালাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। বেদআতীদের আপত্তিসমূহের জওয়াবও তাতে বর্ণিত হয়েছে। বাকী রইল তৃতীয় প্রকার তাওহীদ। বলা বাহুল্য, এর উপরই তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। কেননা, কেবল বিশ্বাসগত তাওহীদই তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে না— এতে কিছু কাশফ ও প্রত্যক্ষণেরও দরকার। সুতরাং তৃতীয় প্রকার তাওহীদের ক্ষেত্রে যতটুকুর উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল, নিম্নে আমরা ততটুকুই বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

সংক্ষেপে কথা হল, মানুষের কাছে এটা দিবালোকের ন্যায় প্রতিপন্ন হতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া জগতের সর্বময় কর্তা আর কেউ নেই। সৃষ্টি, রিযিক, বখ্‌শিশ, জীবন, মরণ, প্রাচুর্য, দরিদ্রতা ইত্যাদি যত বিষয়াদি রয়েছে, সবগুলোর স্রষ্টা, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এতে কেউ তাঁর অংশীদার নেই। এ বিষয়টি যখন মানুষের কাছে প্রকটিত হয়ে যাবে, তখন সে অন্য কারও দিকে লক্ষ্য করবে না, অন্য কাউকে ভয় করবে না। তাঁরই কাছে আশা করবে এবং তাঁরই উপর ভরসা করবে। কেননা, সর্বাধিপতি তো কেবল তিনিই। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে, সবই তাঁর অধীন ও পদানত। মানুষের সামনে যখন কাশফের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন এটা সে চর্মচক্ষেও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

শয়তান মানুষকে এই তাওহীদ থেকে দু' উপায়ে বিরত রাখে এবং তার সাথে শিরক মিশ্রিত করে দেয়। প্রথমত, প্রাণিকুলের ক্ষমতার প্রতি

দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, জড় পদার্থের ক্ষমতার প্রতি মনোযোগের মাধ্যমে। জড়জগতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হল এই, মানুষ শস্য উৎপাদনের জন্যে বৃষ্টির উপর ভরসা করে এবং বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে মেঘমালার উপর ভরসা করে। নৌকা পানির উপর সঠিকভাবে ভেসে থাকা এবং চলার ব্যাপারে অনুকূল বায়ুর উপর ভরসা। এ সমস্ত বিষয় তাওহীদের ক্ষেত্রে শিরক এবং আসল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البراذا هم يشركون -

অর্থাৎ, তারা যখন নৌকায় আরোহণ করে, তখন একান্তভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে উদ্ধার করে ডাঙ্গায় পৌছে দেন, তখনই তারা শিরক করতে শুরু করে।

কতক তাফসীরকারের মতে এখানে শিরক করার অর্থ এই, তারা বলতে শুরু করে— যদি বায়ু অনুকূল না হতো, তবে আমরা তীরে পৌছুতে পারতাম না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত সে জানে, অনুকূল বাতাসও স্বেচ্ছায় চলে না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ পাক তাকে চালান।

অতএব, নাজাতের ক্ষেত্রে বায়ুর প্রতি মানুষের মনোযোগ এমন, যেমন কোন প্রাণদণ্ডযোগ্য ব্যক্তি গ্রেফতার হয়, অতঃপর বাদশাহ তার মুক্তি ও ক্ষমার আদেশ লিখে দেন। এখন এই ব্যক্তি বাদশাহের দোয়াত, কলম ও কাগজকে স্মরণ করে বলে— যদি দোয়াত, কলম ও কাগজ না হত, তবে আমি রক্ষা পেতাম না। অর্থাৎ, সে কলম ইত্যাদিকেই নাজাতের কারণ মনে করে। যিনি কলম চালিয়েছেন, তাকে স্মরণ করে না। বলা বাহুল্য, এটা চূড়ান্ত মূর্খতা। যে ব্যক্তি জানে, কলম কোন আদেশ দিতে পারে না, বরং সে লেখকের অনুগত, সে কলমের দিকে মনোযোগ দিবে না এবং লেখক ছাড়া অন্য কোন কিছুর কাছে কৃতজ্ঞ হবে না। এমনকি, মুক্তির আনন্দ এবং বাদশাহের কৃতজ্ঞতায় কলম ও কালির কল্পনাও তার অন্তরে জাগ্রত হবে না। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, বৃষ্টি, মেঘমালা, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এমনিভাবে অনুগত, যেমন লেখকের হাতে কলম-কাগজ ইত্যাদি। এ দৃষ্টান্তটিও কেবল

বুঝানোর জন্যে, নতুবা দস্তখত বাদশাহ্ করলেও বাস্তবে লেখক আল্লাহ্ তা'আলাই। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

অর্থাৎ, আপনি যখন ধূলি নিক্ষেপ করলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন।

মানুষের কাছে যখন প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অনুগত, তখন শয়তান তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় এবং তার তাওহীদে জড়পদার্থের অংশীদারিত্ব মিশ্রিত করতে পারে না। শয়তান তখন অন্য উপায় অবলম্বন করে। অর্থাৎ, প্রাণিকূলের ক্ষমতার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং বলে— সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়— এ কথা তুমি কেমন করে বিশ্বাস করতে পারলে? দেখ, অমুক ব্যক্তি তার ক্ষমতা বলে তোমাকে রূযী-রোযগার দেয়। সে ইচ্ছা করলে তা বন্ধও করে দিতে পারে। বাদশাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে। অতএব, বাদশাহকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর কাছেই আশা করা উচিত। কেননা, তুমি তাঁর অধীন। শয়তানের এই প্ররোচনায় অনেক মানুষের পা পিছলে যায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি বান্দার উপর শয়তানের কোন প্রভাব নেই। তারা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে, লেখক অনুগত ও বাধ্য। কিন্তু যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য আল্লাহর নূর দ্বারা উন্মোচিত হয়নি, তার অন্তর্দৃষ্টি আকাশ ও পৃথিবীর মহাপ্রভুকে দেখতে অক্ষম। সে দেখে না যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর প্রবল। পক্ষান্তরে যারা "মোশাহাদা" তথা প্রত্যক্ষকরণের স্তরে উন্নীত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নিজের কুদরত দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে বাকশক্তি সম্পন্ন করে দেন। এ সাধকগণ এসব অণু-পরমাণু আল্লাহর উদ্দেশে যে তাসবীহ্ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তা নিজের কানে শুনে। অবশ্য তাদের কান এরূপ কান নয়, যা ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছু শুনতে পারে না। এরূপ কান তো গাধারও থাকে। অতএব, যে বস্তুতে চতুষ্পদ জন্তুও শরীক, তার তেমন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাওয়াক্কুলের ক্রিয়াকর্ম

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। তাদের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাওয়াক্কুলের নিজ নিজ "মকাম" তথা অবস্থান লিপিবদ্ধ করেছেন। সূফী বুযুর্গদের এটাই রীতি। তাই সবগুলো বক্তব্য উদ্ধৃত করার মধ্যে কোন উপকার নেই দেখে আমরা এখানে বাস্তব বিষয়টি বর্ণনা করছি।

তাওয়াক্কুল শব্দটি "ওকালত" থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অপরের উপর ভরসা করে কাজ সমর্পণ করা। যাকে কাজ সমর্পণ করা হয়, তাকে উকিল এবং যে সোমর্পণ করে, তাকে "মোতাওয়াক্কেল" (মক্কেল) বলা হয়। এখন আমরা এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মামলা-মোকদ্দমার উকিলের কথাই উল্লেখ করছি। যদি কোন ব্যক্তি অপরের কাছে মিছামিছি টাকা-পয়সা দাবী করে, তবে অপরপক্ষ বাদীর সাথে লড়াই করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করবে, যাতে সে বাদীর মিথ্যা দাবী ফাঁস করে দেয়। এমতাবস্থায় মক্কেল ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে না, যে পর্যন্ত সে উকিলের মধ্যে চারটি বিষয়ের বিশ্বাস না রাখবে। এক— চূড়ান্ত বিচক্ষণতা, দুই— সত্য প্রকাশে পূর্ণ সক্ষমতা। তিন— চূড়ান্ত বাকপটুতা এবং চার— মক্কেলের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি। বিচক্ষণতার কারণে উকিল ধোকা ও প্রবঞ্চনার স্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকবে। এমনকি, নাজুক ও সূক্ষ্ম কৌশলও তার অজানা থাকবে না। সক্ষমতার প্রয়োজন এজন্যে, যাতে সে সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে দেয়, বিচারকের সামনে ভীত না হয় এবং সত্য প্রকাশে লজ্জা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় না দেয়। বাকপটুতাও এক প্রকার সক্ষমতা। কিন্তু এটা মুখের সক্ষমতা, যাতে মনের কথা উত্তমরূপে বর্ণনা করতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি ধোকার স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত, তার জন্য জরুরী নয় যে, সে নিজের বাগ্মিতার দ্বারা তার সমাধান করে দিবে। পূর্ণ সহানুভূতির প্রয়োজন এজন্যে, যাতে উকিল মক্কেলের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব, সবই করে। কেননা, মক্কেলের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি ও মনোযোগ না থাকা পর্যন্ত কেবল মামলাবাজির ক্ষমতা যথেষ্ট হয় না। যদি উকিল এমন উদাসীন হয় যে, প্রতিপক্ষ মামলায় জিতলেও কোন দোষ নেই এবং মক্কেল জিতলেও কোন পরওয়া নেই, তবে তার প্রচেষ্টা যে কতটুকু সফল হবে, তা জানা কথা।

যদি মক্কেলের মনে উপরোক্ত চারটি বিষয় অথবা সেগুলোর কোন একটি বিষয়েও সন্দেহ থাকে, তবে সে উকিলের ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে না। সে সর্বপ্রযত্নে উকিলের এসব ত্রুটি দূর করতে সচেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে মক্কেল উকিলের এসব বৈশিষ্ট্যে যে পরিমাণ বিশ্বাস রাখবে, সে পরিমাণে তার উপর ভরসা ও প্রশান্ত হবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাস ও ধারণা শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য অপরিসীম। এ কারণেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারীদের অবস্থার বেলায়ও অনেক পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। এর সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস, যাতে কোন দুর্বলতা নেই। অর্থাৎ. মানুষের অন্তরে কাশফ অথবা দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে একথা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের জন্যে যথেষ্ট হওয়ার পূর্ণ সক্ষমতাও তাঁর আছে। প্রত্যেক বান্দার উপর তাঁর রহমত ও করুণাদৃষ্টি রয়েছে। তাঁর কুদরতের উপর কোন কুদরত নেই এবং তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞান নেই। এরূপ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করবে এবং অন্য কারও প্রতি মনোনিবেশ করবে না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের ভেতরে এই বিশ্বাস না পায়, তবে এর কারণ দু'টি। এক— উপরোক্ত বিষয় চতুষ্টয়ের কোন একটি সম্পর্কে দুর্বল বিশ্বাসী হওয়া অথবা দুই— অন্তরে কাপুরুষতা ও কুসংস্কারের কারণে বক্রতা প্রবল হওয়া। কেননা, মাঝে মাঝে এমন হয় যে, বিশ্বাসে কোন ত্রুটি না থাকলেও কুসংস্কারের আনুগত্য করার কারণে অন্তরে বক্রতা এসে যায়। উদাহরণতঃ যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলা হয়, মৃত লাশের কাছে বিছানায় অথবা কক্ষে শুয়ে পড়, তবে সে তাতে সম্মত হবে না। যদিও সে নিশ্চিত রূপে জানে যে, এটা মৃত লাশ এবং চেতনা ও অনুভূতিহীন জড়পদার্থ। আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশ্বাসে কোন সন্দেহ-সংশয় না আসা সত্ত্বেও সে মৃতের সাথে বিছানায় কিংবা বদ্ধকক্ষে একাকী থাকতে পছন্দ করে না। এটা মনের কাপুরুষতা ও এক প্রকার দুর্বলতা, যা থেকে কম মানুষই মুক্ত। মোটকথা, তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য মন ও বিশ্বাস উভয়টিই শক্তিশালী হওয়া দরকার। এই উভয় প্রকার শক্তি দ্বারাই অন্তরে স্থিতি ও আশ্বস্ততা আসে। অন্তরের স্থিতি ভিন্ন বিষয় এবং বিশ্বাস ভিন্ন বিষয়। অনেক বিশ্বাস এমন থাকে, যার সাথে স্থিতি ও আশ্বস্ততার সম্পর্ক

নেই। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ -

অর্থাৎ, আল্লাহ বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে আমার অন্তর আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে একথা বলেছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিরূপে জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান— যাতে বিষয়টি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল হয়ে যায়। মোটকথা, কাপুরুষতা ও কুসংস্কার মানুষের মজ্জার অন্তর্গত। এগুলোর কারণে বিশ্বাস উপকারী হয় না। জানা গেল যে, এটাও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী একটি বিষয়। যখন বিশ্বাস, আশ্বস্ততা ইত্যাদি সববিষয় অর্জিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা পূর্ণ হয়ে যায়। তাওরাতে লিখিত আছে— যে ব্যক্তি নিজের মতই কোন মানুষের উপর ভরসা করে, সে অভিশপ্ত। এক হাদীসে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সম্মান ও ইযযত কামনা করে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন।

তাওয়াক্কুলের অর্থ জানার পর এখন জানা দরকার যে, শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর আল্লাহ তা'আলার উপর এমন ভরসা করা, যেমন মক্কেল তার উকিলের উপর করে। এটা তাওয়াক্কুলের সর্বনিম্ন স্তর। দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ তা'আলার উপর এমন ভরসা করা, যেমন শিশু তার মায়ের উপর করে। সে মা ব্যতীত অন্য কাউকে চিনে না এবং তাকে ছাড়া অন্য কারও কাছে ফরিয়াদ করে না। মায়ের উপরই ভরসা করে। মাকে দেখলে তার আঁচল জড়িয়ে ধরে এবং ছাড়ে না। মায়ের অনুপস্থিতিতে কোন কষ্টের সম্মুখীন হলে সে প্রথমে মাকেই ডাকে এবং তার কথাই প্রথমে মনে আসে। কেননা, তার ঠিকানা মা পর্যন্তই সীমিত। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই মনোনিবেশ করে এবং লক্ষ্য ও আস্থা তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ রাখে, সে আল্লাহর আশেক হবে, যেমন শিশু তার মায়ের আশেক হয়ে থাকে। এ স্তরের তাওয়াক্কুল প্রথম স্তরের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। উভয় স্তরের মধ্যে পার্থক্য এই, দ্বিতীয় স্তরের তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কেও বেখবর থাকে। অর্থাৎ, তার অন্তর তাওয়াক্কুলের প্রতি মনোযোগ

দেয় না; বরং যার উপর তাওয়াক্কুল, তার প্রতিই মনোযোগ রাখে। তার অন্তরে অন্য কোন কিছুর অবকাশ থাকে না। কিন্তু প্রথম স্তরের তাওয়াক্কুলকারী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ও উপার্জনের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করে। তাই সে নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বেখবর থাকে না। এটা কেবল আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিপন্থী। হযরত সহল তস্তরীর উক্তিতে এই স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ নিম্নতম তাওয়াক্কুল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা। প্রশ্নকারী বলল ঃ মধ্যবর্তী স্তর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ এখতিয়ার ও অধিকার বর্জন করা। এতে দ্বিতীয় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশ্নকারী সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে শুধু বললেন ঃ এটা সে'ই জানে, যে মধ্যবর্তী স্তরে পৌঁছে যায়।

তাওয়াক্কুলের তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহর হাতে তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির নিজের গতিবিধিতে এমন হওয়া, যেমন মৃত ব্যক্তি গোসলদাতার হাতে থাকে। অর্থাৎ, নিজেকে মৃত মনে করা, যাকে কেবল খোদায়ী কুদরতই গতিশীল করে থাকে। যেমন গোসলদাতার হাত মৃতকে গতিশীল করে। এরূপ তাওয়াক্কুলকারীর সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে, গতিশীলতা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহ তা'আলাই জারি করেন। এ ধরনের লোক তার সাথে কি ঘটনা ঘটবে সে অপেক্ষায় থাকবে। সে শিশু থেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র হবে যে, শিশু মায়ের কাছে আবদার করে এবং তার আঁচল জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে তা করবে না; বরং সে এমন শিশুর মত, যে মনে করে, মায়ের কাছে আবদার না করলে মা তাকে খুঁজবে, তাকে জড়িয়ে না ধরলে সে নিজেই বুকে টেনে নেবে এবং তার কাছে দুধ না চাইলে সে নিজেই দুধ পান করাবে। এই স্তরের তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও দানে ভরসা করে সওয়াল ও দোয়া বর্জন করে এবং মনে করে, তিনি সওয়াল ছাড়াই সওয়ালের চেয়ে উত্তম দান করবেন। কেননা, তিনি সওয়াল ও দোয়ার পূর্বেই অনেক নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। এ ধরনের তাওয়াক্কুলের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়; কিন্তু খুবই বিরল। মুখমন্ডলে ভয়জনিত পাণ্ডুরতা যেমন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, এই তাওয়াক্কুলও তেমনি আসা-যাওয়া করতে থাকে। কেননা, নিজের গতি ও কুদরতকে ব্যবহার করা এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার এবং এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা একটি সাময়িক ব্যাপার। দ্বিতীয় স্তরের

তাওয়াক্কুলের স্থায়িত্ব জ্বরাক্রান্ত রোগীর পাণ্ডুরতার ন্যায়, যা কখনও দু'চার দিন থেকে যায়। প্রথম স্তরের স্থায়িত্ব সেই রোগীর পাণ্ডুরতার মত, যার রোগ স্থায়ী হয়ে গেছে। এই পাণ্ডুরতা সর্বক্ষণ থাকাও কঠিন নয় এবং বিলীন হয়ে যাওয়াও অবান্তর নয়।

তাওয়াক্কুলের এ সকল স্তরে বাহ্যিক উপায়াদির সাথে তাওয়াক্কুলকারীর কোন সম্পর্ক থাকে কি না, এ প্রশ্নের জওয়াব এই, তৃতীয় স্তরে কোন সম্পর্কই থাকে না। এই স্তরে তাওয়াক্কুলকারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তিদের মত থাকে। দ্বিতীয় স্তরে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া ও সওয়াল করা ছাড়া অন্য কোন তদবীর থাকে না। প্রথম স্তরে তদবীর ও এখতিয়ার কোন কিছুই বিলুপ্ত হয় না। তবে কতক তদবীর বিলুপ্ত হয়। যেমন, মক্কেল তার উকিলের উপর ভরসা করে কতক তদবীর বর্জন করে। কিন্তু উকিল যে তদবীর করতে বলে তা বর্জন করে না। উদাহরণতঃ উকিল যদি বলে যে, আপনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত থাকলে আমি কথা বলার জন্যে মুখ খুলব, তবে মক্কেল আদালতে উপস্থিতি বর্জন করে না। এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ, এর অর্থ এই হয় না যে, সে উকিলকে ত্যাগ করে শুধু নিজের চেষ্টা-তদবীরের উপর ভরসা করেছে। বরং এটা তাওয়াক্কুলের পরিপূরক বিষয়। কেননা, উকিল তার জন্যে উপযুক্ত বিবেচনা করে যা বলেছে, সে তাই করেছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সত্যিকারভাবে অনুধাবন করলে তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত অনেক আপত্তি দূরীভূত হয়ে যায় এবং বুঝা যায় যে, যাবতীয় তদবীর বর্জন করা এবং সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়। বরং তাওয়াক্কুলে কতক তদবীর বর্জন করা জায়েয এবং কতক তদবীর বর্জন করা নাজায়েয। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লিখিত হবে।

তাওয়াক্কুল ও মাশায়েল ঃ এখানে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বুযুর্গদের কিছু কিছু উক্তি উল্লেখ করা হবে, যাতে জানা যায়, এ সম্পর্কে তারা যা কিছু বলেছেন, তা সমস্তই আমাদের বর্ণিত তাওয়াক্কুলের তিন স্তরের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক উক্তির মধ্যে কতক অবস্থার প্রতি ইশারা আছে।

আবু মূসা বলেন ঃ আমি আবু এয়াযীদ বুস্তামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাওয়াক্কুল কি? তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? আমি বললাম ঃ আমাদের সঙ্গী বলেন, যদি সাপ ও বিচ্ছু কোন ব্যক্তিকে ডান ও

বাম দিক থেকে ঘিরে ফেলে, তবে তার অন্তরে কোনরূপ নড়চড় না হওয়া চাই। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাওয়াক্কুল এরই কাছাকাছি। কিন্তু যদি জান্নাতীরা জান্নাতে সুখভোগ করে এবং দোযখীরা দোযখে আযাব ভোগ করে, তবে তাওয়াক্কুলকারী তাদের মধ্যে পার্থক্য করলে সে সম্পূর্ণই তাওয়াক্কুলের সীমার বাইরে চলে যাবে। এখানে হযরত আবু মূসার উক্তিতে তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ, তৃতীয় স্তর বর্ণিত হয়েছে। আর আবু এয়াযীদের বক্তব্যে উত্তম প্রকার অর্থাৎ, খোদায়ী হেকমত ও প্রজ্ঞা বিধৃত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু করেছেন, তাই হওয়া উচিত। ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়টি অত্যধিক গভীর। হযরত আবু এয়াযীদ এ ধরনের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না।

তাওয়াক্কুলের প্রথম স্তরে সাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করার শর্ত নেই। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হেরা গুহায় অবস্থানকালে সাপের গর্তসমূহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা তাওয়াক্কুল বিরোধী হলে তিনি তা করতেন না।

হযরত যুন্নুন মিসরীকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং 'আসবাব' তথা উপায়াদির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নাম তাওয়াক্কুল। এখানে অন্যান্য প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বলে তিনি তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং উপায়াদির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কথা বলে তাওয়াক্কুলের করণীয় বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন।

হামদুন গাযর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ যদি কারও কাছে দশ হাজার দেরহাম থাকে এবং এক দেরহাম ঋণ থাকে, তবে এ আশংকা থেকে মুক্ত না থাকা যে, ঋণ ঘাড়ে রেখেই সে মারা যাবে। পক্ষান্তরে যদি কারও যিম্মায় দশ হাজার দেরহাম ঋণ থাকে এবং তা শোধ করার জন্যে কোন কিছুই না থাকে, তবু এ বিষয়ে নিরাশ না হওয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই ঋণ শোধ করে দিবেন। এ উক্তিতে কেবল আল্লাহ্র বিস্তৃত কুদরতে বিশ্বাস করা এবং কুদরতের জন্যে বাহ্যিক উপায়াদি ছাড়া গোপন উপায়াদিও রয়েছে একথা মেনে নেয়াকে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে।

হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ কারশীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার নাম

তাওয়াক্কুল। প্রশ্নকারী বলল ঃ আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ যে উপায় অন্য উপায়ের দিকে পৌঁছে, তা বর্জন করা এবং কেবল আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যনির্বাহী মনে করা। এখানে প্রথম বাক্যে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তরই শামিল এবং দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষভাবে তৃতীয় স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাওয়াক্কুলের অনুরূপ। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। কেননা, জিবরাঈলের প্রশ্ন তাঁর হেফাযতের একটি উপায় ছিল, যা অন্য উপায়ের দিকে পৌঁছত। হযরত ইবরাহীম এটা এই ভরসায় বর্জন করলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি জিবরাঈলকে হেফাযত করতে বাধ্য করে দিবেন। এমতাবস্থায় এ কাজের কার্যনির্বাহী তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ্) হবেন।

হযরত আবু সাঈদ খারায বলেন ঃ দু'টি বিষয়ের নাম তাওয়াক্কুল— স্থিতিহীন চাঞ্চল্য এবং চাঞ্চল্যহীন স্থিতি। এতে তিনি সম্ভবত দ্বিতীয় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, চাঞ্চল্যহীন স্থিতির মানে এই যে, উকিলের প্রতি অন্তর দ্বিধাহীনভাবে স্থিতিশীল হবে। পক্ষান্তরে স্থিতিহীন চাঞ্চল্য বলে বুঝানো হয়েছে, কাকুতি-মিনতি ও ফরিয়াদ আল্লাহর সামনে হবে; যেমন শিশু আপন দেহ দিয়ে মায়ের দিকে চঞ্চল থাকে।

তাওয়াক্কুলকারীদের ক্রিয়াকর্ম ঃ কেউ কেউ মনে করে, তাওয়াক্কুল হচ্ছে দেহ ও মন সহযোগে কোন কাজকর্ম ও কৌশল-চিন্তা না করা এবং ছিন্নবস্ত্র অথবা মাংসপিণ্ডের ন্যায় মাটিতে পড়ে থাকা। এটা মূর্খদের ধারণা, যা শরীয়তের আইন অনুযায়ী হারাম। শরীয়তে তাওয়াক্কুলকারীদের প্রশংসা বর্ণিত আছে। এমতাবস্থায় একটি হারাম কাজ করে কিরূপে প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? তাই আমরা এখানে বাস্তব ও সুচিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

মানুষের ইচ্ছাধীন চেষ্টা-চরিত্র চারটি উদ্দেশ্যের জন্যে হয়ে থাকে। এক— কোন উপকারী বস্তু অর্জন করা, যা তার কাছে নেই। যেমন, ধন উপার্জন করা। দুই— নিজের উপকারী বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করা। যেমন, ধন সঞ্চয় করা। তিন— কোন উৎপীড়নকারীকে উৎপীড়নের পূর্বেই প্রতিহত করা। উদাহরণতঃ হিংস্র জন্তু অথবা চোর-ডাকাতের উপদ্রব দূর করা। চার— যে বিপদ উপরে এসে গেছে, তা দূর করার চেষ্টা করা। যেমন, রোগের চিকিৎসা করা ইত্যাদি। মানুষের চেষ্টা-চরিত্র এই চারটি উদ্দেশ্যের

বাইরে নয়। আমরা এই চার প্রকার ক্রিয়াকর্মে তাওয়াক্কুলের শর্ত ও স্তর প্রমাণসহ চারটি ভাগে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

(১) যে সকল উপায়ে মানুষ উপকারী বস্তু অর্জন করতে পারে, সেগুলো তিন প্রকার। এক— নিশ্চিত উপায়। অর্থাৎ, সদাসর্বদা যা একইভাবে হয়— এর খেলাফ হয় না। উদাহরণতঃ ক্ষুধা দূর করার জন্যে হাত বাড়িয়ে খাদ্য মুখে দেয়া, চিবানো এবং গলাধঃকরণ করা। এখন কেউ যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সামনে রাখা খাদ্যের দিকে হাত না বাড়ায় এবং বলে ঃ আমি তো তাওয়াক্কুল করেছি, আর তাওয়াক্কুলের শর্ত হচ্ছে— কোন কাজ না করা। হাত বাড়ানো, দাঁতে চিবানো এবং গলাধঃকরণ করা কাজ বৈ নয়। তাই আমি এগুলো করব না। এ ধরনের কথাবার্তা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং একে বলা হবে পাগলামি। কেননা, ক্ষুধা দূর করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এসব ক্রিয়াকর্মকে অকাট্য উপায় হিসাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। কখনও এর বিপরীত হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই তার উদরপূর্তি করে দেবেন অথবা খাদ্যকে গতিশীল করে দেবেন, ফলে সে আপনা-আপনি মুখে চলে আসবে অথবা কোন ফেরেশতাকে আদেশ করবেন, সে খাদ্য চিবিয়ে পাকস্থলীতে রেখে যাবে, তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রবর্তিত রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম বর্জনের নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুলে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'আলা খাদ্য গ্রহণের জন্যে হাত, দাঁত, শক্তি ও নড়াচড়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং খাদ্য ও পানীয় দেয়া তাঁরই কাজ। তবে হাত ও খাদ্যের উপরই মনে স্বস্তি ও ভরসা না থাকা উচিত। বাস্তবেও হাতের উপর ভরসা করা যায় না। কেননা, মাঝে মাঝে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত অবশ হয়ে যায়। শক্তির উপরও ভরসা করা যায় না। কারণ, মানুষ প্রায়ই এমন আঘাতের সম্মুখীন হয়, যার ফলে তার বুদ্ধি-জ্ঞান ও নড়াচড়ার শক্তি রহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে খাদ্য বিদ্যমান থাকার উপরও ভরসা করা যায় না। কেননা, মাঝে মাঝে কোন শক্তিধর এসে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অথবা কোন সাপ এসে যায়, যার কারণে মানুষকে খাদ্য রেখেই পালাতে হয়। মোটকথা, এগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে এবং এর প্রতিকার আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই হয় না। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

দ্বিতীয় প্রকার উপায় নিশ্চিত নয়; কিন্তু প্রায়শ এই উপায় ছাড়া উদ্দেশ সিদ্ধ হয় না কিংবা সিদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি শহর ও কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে এমন জঙ্গলে সফর করে, যেখানে মানুষের যাতায়াত খুবই বিরল। এরূপ সফরে পাথেয় না নেয়া তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়। বরং জঙ্গলের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া পূর্ববর্তীদের রীতি ও সুন্নত। এতে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হয় না। তবে ভরসা আল্লাহর অনুগ্রহের উপর থাকা কর্তব্য— পাথেয়ের উপর নয়। কিন্তু যদি কেউ পাথেয় সঙ্গে না নেয়, তবে তাও জায়েয এবং তা অনেক উচ্চস্তরের তাওয়াক্কুল। কেননা, বিশিষ্ট বুযুর্গদের এটাই ছিল রীতি। প্রশ্ন হয়, পাথেয় সঙ্গে না নেয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া, যা শরীয়তে হারাম। এর জওয়াব এই, এটা দু' কারণে হারামের বাইরে থাকতে পারে। এক, কোন ব্যক্তি সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে এক সপ্তাহ অথবা কমবেশী সময় ক্ষুধার্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এ সময়ে সে মনের সংকীর্ণতা, অস্থিরতা ও কঠিনতা ছাড়াই আল্লাহর যিকর করতে সক্ষম হয়। দুই, ঘাস ও লতাপাতা ইত্যাদি খেয়েও মানুষ কিছুদিন জীবিত থাকতে পারে। তবে এতে মুজাহাদার দরকার হবে। মুজাহাদা তাওয়াক্কুলের মূল। বিশিষ্ট বুযুর্গগণ এর উপরই ভরসা করতেন। তারা এ ধরনের সফরে সুঁই, কাঁচি, রশি ও ছোট বালতি অবশ্যই সঙ্গে রাখতেন এবং বলতেন ঃ এতে তাওয়াক্কুলের ত্রুটি হয় না। কারণ, তারা জানতেন, জঙ্গলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্যে রশি ও বালতি ছাড়া পানি উপরে উঠে আসে না। এটা আল্লাহ তা'আলার রীতি নয়। জঙ্গলে অধিকাংশ সময় বালতি ও রশি পাওয়া যায় না। ঘাস, শাক-পাতা ইত্যাদি অনেক পাওয়া যায়। সফরে প্রত্যহ কয়েকবার উযু করার জন্যে এবং পান করার জন্যে পানির প্রয়োজন পড়ে। এমনিভাবে তাদের কাছে একটিমাত্র বস্ত্র থাকত। এটা ছিঁড়ে গেলে সুঁই-সুতা কোথাও পাওয়া যায় না। সুঁই-সুতার বিকল্পও জঙ্গলে কোন কিছু থাকে না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের কারণে জঙ্গলে সফর করার সময় এসব প্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করা জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি পাহাড়ের কোন উপত্যকায় তাওয়াক্কুল করার জন্যে যায়, তবে সে গোনাহ্গার হবে এবং নিজেই নিজের প্রাণ বধ করবে। বর্ণিত আছে— জনৈক দরবেশ লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন পাহাড়ের পাদদেশে সাত দিন অবস্থান করল। সে বলল ঃ আমি কারও কাছে কিছু চাইব না, যে পর্যন্ত আল্লাহ

আমাকে আমার রিযিক পৌছে না দেন। সাত দিন বসে থাকার পর সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে গেল; কিন্তু রিযিক এল না। সে আল্লাহ্‌র দরবারে মিনতি করে বলল ঃ ইলাহী! যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখতে চাও, তবে আমার জন্যে যে রিযিক লিখে দিয়েছ, তা আমাকে দান কর। নতুবা আমার রূহ কবজ করে নাও। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হল ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যতদিন তুমি লোকালয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে না বসবে, তোমাকে রিযিক দেব না। দরবেশ লোকালয়ে চলে গেল। কেউ তার কাছে খাদ্য নিয়ে এল এবং কেউ পানি নিয়ে এল। কিছু পানাহার করে যখন সে কিছুটা সুস্থ হল, তখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বলা হল ঃ তুমি দুনিয়াতে দরবেশী করে আমার প্রজ্ঞাময় নীতি বিনষ্ট করতে চাও। তুমি কি জান না যে, আমি আমার বান্দাদেরকে নিজের কুদরতের হাতে রিযিক পৌছানোর তুলনায় অন্য মানুষের হাত দিয়ে রিযিক পৌছানোকে অধিক ভাল মনে করি? এ থেকে জানা গেল, যাবতীয় উপায়াদি থেকে দূরে থাকা আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞানীতির বিরোধী এবং আল্লাহ্‌র রীতি ও অভ্যাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী কাজ করলে অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল উপায়াদির উপর না করে আল্লাহ্‌র উপর করলে তা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। তবে উপায়াদি দু'প্রকার— বাহ্যিক ও গোপনীয়। তাওয়াক্কুলকারীর উচিত, বাহ্যিক উপায়াদি থেকে মুখ ফিরিয়ে গোপন উপায়াদি অবলম্বন করা।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, জীবিকার জন্যে কোন পেশা অবলম্বন না করে লোকালয়ে অবস্থান করা কিরূপ? এটা হারাম, মোবাহ্, না মোস্তাহাব? জওয়াব এই যে, এটা হারাম নয়। কেননা, পাথেয় ছাড়া জঙ্গলে সফরকারী ব্যক্তি যখন আত্মহন্তা সাব্যস্ত হল না, তখন লোকালয়ে বসবাসকারী কিছুতেই নিজেকে বিনাশকারী হতে পারে না। এখানে সে ধারণাতীত জায়গা থেকে খাদ্যপ্রাপ্ত হতে পারে, তবে তা পেতে কখনও বিলম্ব হতে পারে, যাতে সবর করা সম্ভব। তবে ঘরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে বসা, যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে— এটা হারাম। কিন্তু যদি ঘরের দরজা খোলা রেখে আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল না থাকে— বেকার বসে থাকে, তবে এটা হারাম না হলেও অনাহারে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে যেতে পারে। তখন জীবিকা উপার্জনের জন্যে বের হওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে আন্তরিকভাবে এবাদতে মশগুল থাকলে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর

নির্ভর করে কে আসে, কে যায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করলে তা অবশ্যই তাওয়াক্কুলের অন্যতম মকাম। এরূপ ক্ষেত্রে জনৈক আলেম বলেন— বান্দা রিযিক থেকে পলায়ন করলে রিযিক তাকে তালাশ করবে, যেমন কেউ মৃত্যু থেকে পলায়ন করলে মৃত্যু তাকে খুঁজে বের করে ছাড়ে। এটাও এই আলেমেরই উক্তি যে, মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করে— ইলাহী! আমাকে রুযী দিয়ো না, তবে এ দোয়া কবুল হবে না এবং দোয়াকারী গোনাহ্গার হবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ ওহে মূর্খ! এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমি তোমাকে সৃষ্টি করব, আর রুযী দেব না? এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ প্রত্যেক বিষয়েই মতভেদ করে; কিন্তু রিযিক ও মৃত্যুর ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন রিযিকদাতা ও মৃত্যুদাতা নেই। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير

تغد وخماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال -

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি পক্ষীকুলের ন্যায় তোমাদেরকে রিযিক দিতেন। পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত বের হয়ে যায় এবং বিকালে উদরপূর্তি অবস্থায় নীড়ে ফিরে আসে। এছাড়া তোমাদের দোয়ায় পাহাড় পর্যন্ত টলে যেত।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ পাখীদের দেখ, তারা ফসল উৎপন্ন করে না এবং খাদ্য সঞ্চয় করে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতভাবে প্রত্যহ রিযিক দান করেন। যদি তোমরা বল, আমাদের পেট বড়, তবে চতুষ্পদ জন্তুদের প্রতি তাকাও— আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রিযিকের জন্যে মানুষকে কিভাবে নিয়োজিত করেছেন।

আবু এয়াকুব যুসী বলেন ঃ তাওয়াক্কুলকারীদের রিযিক তাদের শ্রম ছাড়াই মানুষের হাতে চালু থাকে এবং অবশেষে তারা বিনা দ্বিধায় পেয়ে যায়। অন্যরা দিবারাত্রি রিযিকের চিন্তায় মশগুল থাকে এবং কষ্ট স্বীকার করে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাকে রিযিক

দেন; কিন্তু কেউ কেউ অপমান সহকারে তা পায়। যেমন, ভিক্ষাবৃত্তি করে এবং কেউ কেউ পরিশ্রম ও অপেক্ষা করে পায়। যেমন, ব্যবসায়ী। আবার কেউ কেউ প্রাণান্ত চেষ্টা-চরিত্র করে; যেমন, কারিগর এবং কেউ কেউ ইযযত ও সম্মান সহকারে; যেমন সূফী বুযুর্গগণ।

তৃতীয় প্রকার উপায় এমন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। যেমন, ধন উপার্জনে সূক্ষ্ম কলাকৌশল অবলম্বন করা। মানুষ এক্ষেত্রে যে সব কলা-কৌশল অবলম্বন করে, তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া জরুরী নয়। এ ধরনের উপায় অবলম্বন করলে তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ মানুষ এতেই লিপ্ত রয়েছে। তারা বৈধ ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম কলাকৌশল বের করতে থাকে। অবৈধ ধন অর্জনে কলাকৌশল প্রয়োগ করার ফলে যে তাওয়াক্কুল বাতিল হয়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রকার উপায়াদির সংখ্যা এত বেশী যে, গণনা করা সম্ভবপর নয়। হযরত সহল বলেন ঃ কলাকৌশল বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ও নিজের মধ্যে আড়াল রাখেননি। মানুষের কলাকৌশলই মানুষের আড়াল। চিন্তাভাবনা করে দূরবর্তী উপায়সমূহ বের করাই সম্ভবত এখানে হযরত সহলের উদ্দেশ্য। কেননা, এ জাতীয় উপায়ের মধ্যেই কলাকৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, কোন কোন উপায়াদি অবলম্বন করার ফলে মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং কোন কোন উপায়াদি অবলম্বনের ফলে তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার উপায়াদির মধ্যে কতক এমন যে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া সুনিশ্চিত এবং কতক এমন, যা সন্দিগ্ধ তথা নিশ্চিত নয়। সুনিশ্চিত উপায়াদি অবলম্বন করলে কেউ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না— যদি ভরসা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার উপর হয় এবং উপায়াদির উপর না হয়। সন্দিগ্ধ উপায়াদি অবলম্বন করলেও মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না— যদি মনের শান্তি আপন শক্তি ও পুঁজির সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়। এই ধরনের উপায়াদি বর্জন করে যারা তাওয়াক্কুল করে, তা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম, বিশিষ্ট বুযুর্গগণের স্তর, যারা পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই নির্জন জঙ্গলে সফর করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কৃপার উপর আস্থা রাখেন যে, তিনি

এক সপ্তাহ কিংবা আরও সময় পর্যন্ত সবর করার শক্তি দেবেন অথবা বেঁচে থাকার জন্যে শাক, লতাপাতা ইত্যাদি পাওয়া যাবে। যদি কিছু পাওয়া না যায়, তবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধা নেই। কেননা, যাদের কাছে পাথেয় থাকে, তারাও মাঝে মাঝে অনাহারে মারা যায়। কারণ, তাদের পাথেয় বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা জঙ্গলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুর মুখে চলে যায়। পাথেয় থাকা এবং না থাকা উভয় অবস্থাতেই যখন মৃত্যু হতে পারে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করাই উত্তম।

দ্বিতীয় স্তর এমন তাওয়াক্কুলকারীদের, যারা নিজ গৃহে অথবা মসজিদে বসে থাকে। এই স্তরে অবস্থানকারী প্রথম স্তর থেকে কম হলেও তাকে তাওয়াক্কুলকারীই বলতে হবে। কারণ, সে উপার্জন ও বাহ্যিক উপায়াদি বর্জন করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর ভরসা করে এবং মনে করে তিনি গোপন উপায়াদির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করে দেবেন। অবশ্য শহরে থাকাও রিযিক লাভের অন্যতম উপায়। কিন্তু এতে তার তাওয়াক্কুল বাতিল হবে না যদি লক্ষ্য কেবল সেই আল্লাহর উপর থাকে, যিনি শহরবাসীদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং শহরবাসীদের উপর লক্ষ্য না থাকে।

তৃতীয় স্তর এমন তাওয়াক্কুলকারীদের, যারা চলাফেরার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করে। তবে উপার্জন করলেও কেউ তাওয়াক্কুলের মকাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। তবে এ জন্যে শর্ত এই যে, মনের স্বস্তি আপন পুঁজি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের উপর নির্ভরশীল না হওয়া চাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন। বরং আল্লাহ তা'আলার কৃপার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এই উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি আপন পরিবারবর্গের জন্যে অথবা ফকীর-মিসকীনকে দান করার জন্যে উপার্জন করে, তবে সে বাহ্যতঃ উপার্জনকারী এবং আন্তরিকভাবে উপার্জন থেকে আলাদা গণ্য হবে এবং সে গৃহে উপবেশনকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ তাওয়াক্কুলকারী বিবেচিত হবে।

শর্তসহ উপার্জন যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, তার প্রমাণ এই যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা মনোনীত হন, তখন কাপড়ের পুঁটলি বগলে দাবিয়ে বাজারে চলে যান। মুসলমানদের কাছে ব্যাপারটি খারাপ মনে হলে তারা আরয করল ঃ আপনি এরূপ করেন কেন? এখন তো আপনি পয়গাম্বর (সাঃ)-এর খলীফা। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি আমার পরিবারবর্গের জন্যে উপার্জন না করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি নিজের

পরিবারকেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তবে মুসলমানদেরকে রক্ষা করব কিরূপে? অতঃপর খলীফাকে ভাবনামুক্ত করার জন্যে মুসলমানরা তাঁর জন্যে একটি সাধারণ মুসলিম পরিবারের অনুরূপ ভাতা নির্ধারিত করে দেয়। তিনি যখন এর মধ্যেই মুসলমানদের মর্জি ও সন্তুষ্টি দেখতে পেলেন, তখন তাদের কাজেই তিনি নিজের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে শুরু করলেন।

এখন একথা বলা অসম্ভব যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাওয়াক্কুলের মকামে ছিলেন না। তাঁর চেয়ে বেশী তাওয়াক্কুলকারী আর কে ছিল? তিনি নিশ্চিতই তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন। তবে তাঁর তাওয়াক্কুল উপার্জন ও চেষ্টা-তদবীর না করার দিক দিয়ে ছিল না; বরং নিজের শক্তি-সামর্থের উপর ভরসা না করার দিক দিয়ে ছিল। তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকেই জীবিকা সরবরাহকারী এবং উপায়াদির নিয়ন্ত্রক জ্ঞান করতেন। উপার্জনের পথে যে সকল শর্ত ছিল, সেগুলো তিনি পালন করতেন। অর্থাৎ, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উপার্জন করেই বিরত থাকতেন। অনেক উপার্জনের বাসনা করতেন না এবং সঞ্চয়ের লালসা করতেন না।

সংসারের প্রতি অনাসক্তি ছাড়া তাওয়াক্কুল ঠিক হয় না। হ্যাঁ, সংসার অনাসক্তি তাওয়াক্কুল ছাড়াও হতে পারে। কেননা, তাওয়াক্কুলের মকাম সংসার অনাসক্তির পরে। হযরত জুনায়দের পীর আবু জা'ফর হাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বিশ বছর পর্যন্ত তাওয়াক্কুলকে গোপন রেখেছি এবং বাজার থেকে আলাদা হইনি। আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এক দীনার উপার্জন করতাম; কিন্তু রাতের জন্যে একটি কানাকড়িও রাখতাম না। নিজের সুখের জন্যও তা থেকে কিছু ব্যয় করতাম না। হযরত জুনায়দ পীরের সামনে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেন না এবং বলতেন ঃ আপনি তাওয়াক্কুলের মকামে আছেন। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলতে আমি লজ্জাবোধ করি।

মানুষের হাত গুটিয়ে বসে থাকা উত্তম, না চলাফেরা করে কিছু উপার্জন করা উত্তম? এ প্রশ্নের জওয়াব এই, যদি উপার্জন ত্যাগ করলে যিকর, ফিকর ও এবাদতে সমস্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ পাওয়া যায়, মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লোভ না হয়; বরং সবর ও আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার ব্যাপারে অন্তর মযবুত থাকে, তবে ঘরে

বসে থাকাই উত্তম। আর যদি ঘরে বসে থাকলে মন চঞ্চল হয় এবং মানুষের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে কাজ-কর্ম করে উপার্জন করা উত্তম। কেননা, অন্তর দিয়ে মানুষের অপেক্ষা করা যেন অন্তর দিয়ে সওয়াল করা। এটা বর্জন করা কাজ-কর্ম বর্জন করার চেয়ে অধিক জরুরী। পূর্ববর্তী তাওয়াক্কুলকারীগণের রীতি ছিল যে, তারা মন যে বস্তুর লালসা করত, তা গ্রহণ করতেন না। সে মতে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একবার আবু বকর মরুযীকে বললেন ঃ অমুক ফকীরকে সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেবেন। তিনি বেশী মজুরি দিলে ফকীর তা ফিরিয়ে দিল এবং সেখান থেকে প্রস্থান করল। ইমাম আহমদ বললেন ঃ এখন গিয়ে তাকে দিয়ে দিন। সে গ্রহণ করবে। আবু বকর মরুযী গেলেন এবং মজুরি পেশ করতেই ফকীর তা গ্রহণ করল। অতঃপর ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ফকীর এখানে তা গ্রহণ করল না, সেখানে তা গ্রহণ করল, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ প্রথমে তার মনে বেশী পাওয়ার লালসা ছিল। তাই গ্রহণ করেনি। এখান থেকে প্রস্থান করার পর তার মন নিরাশ হয়ে গেল। তাই সে গ্রহণ করল।

মোটকথা, তাওয়াক্কুলকারী যখন বেশী পাওয়ার লোভ না করবে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ ও পুঁজির উপর ভরসা না করবে, তখন সে প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী হবে। পুঁজির উপর ভরসা না করার আলামত এই যে, যদি ধন-সম্পদ চুরি হয়ে যায় অথবা ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে যায়, তবে তাতেও সন্তুষ্ট থাকবে, মনের স্বস্তি বিনষ্ট হবে না এবং অন্তরে কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখা দেবে না। কেননা, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, মন যে বস্তুর সাথে জড়িয়ে না পড়ে, তা বিনষ্ট হয়ে গেলে মন চঞ্চল ও বিচলিত হয় না। এখন প্রশ্ন হয়, পুঁজি ছাড়া উপার্জন হয় না— একথা জানার পর পুঁজির সাথে অন্তর জড়িত না হওয়া কিরূপে সম্ভব? এর উত্তর হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে পুঁজি ছাড়া রিযিক দেন, তাদের সংখ্যা অনেক। আর যাদের কাছে পুঁজি থাকে, তাদেরও অনেকের পুঁজি চুরি হয়ে যায় অথবা অন্যভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। মনে-প্রাণে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে সে ব্যবহারই করবেন, যা আমার জন্যে মঙ্গলজনক। তিনি আমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিলে তাঁর মতে এতেই কল্যাণ নিহিত আছে। ধন-সম্পদ কাছে থাকলে তা সম্ভবত ধর্ম-কর্ম বিনষ্টের কারণ হত। ধর্ম-কর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ। এসব বিষয়ে বিশ্বাস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে

গেলে পুঁজি থাকা না থাকা উভয়ই সমান হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে— কেউ রাতের বেলায় কোন একটি ব্যবসা করার ইচ্ছা করে, যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর থেকে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাকে সেই ব্যবসা থেকে বিরত রাখেন। প্রত্যুষে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বিষণ্ন মনে প্রতিবেশী অথবা অন্য কাউকে অলক্ষুণে সাব্যস্ত করে বলে ঃ আজ কার অশুভ মুখ দেখে বের হয়েছিলাম, যার ফলে আমার এই ব্যর্থতা; অথচ এটা তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার একটি অনুগ্রহ বৈ নয়। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ধনী হই কিংবা ফকীর— এতে আমার কোন পরওয়া নেই। কেননা, প্রাচুর্য ও দরিদ্রতার মধ্যে কোনটি আমার জন্যে মঙ্গলজনক, তা আমি জানি না।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী নয়, তার দ্বারা তাওয়াক্কুল সম্ভব নয়। এ কারণেই হযরত আবু সোলায়মান দারানী আহমদ ইবনে আবুল জাওয়ারীকে বললেন ঃ প্রত্যেক মকামেই আমার দখল আছে; কিন্তু তাওয়াক্কুলের গন্ধও আমি পাইনি। এতে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই, উচ্চস্তরের তাওয়াক্কুল তার হাসিল হয়নি।

সারকথা, তাওয়াক্কুলের মকাম দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু এটা মনের শক্তি ও বিশ্বাসের জোর দাবী করে। তাই হযরত সহল বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপার্জনের কারণে ভর্ৎসনা করে, সে সুন্নতকে ভর্ৎসনা করে। আর যে ব্যক্তি উপার্জন বর্জনের কারণে তিরস্কার করে, সে তাওহীদের প্রতি তিরস্কার করে।

এখন এমন প্রতিকার লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা অন্তরকে বাহ্যিক উপায়াদি থেকে ফিরিয়ে নিতে উপকারী এবং গোপন উপায়াদি সরবরাহ করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক। জানা উচিত যে, কুধারণা শয়তানের উপদেশ এবং সুধারণা আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা। সে মতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً وَّفَضْلًا -

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ করে। আর আল্লাহ্ আপন বখশিশ ও কৃপার অঙ্গীকার করেন।

কেননা, মানুষ মজ্জাগতভাবে শয়তানের ভীতি প্রদর্শনের আনুগত্য

করে। যখন তার মধ্যে ভীরুতা ও আন্তরিক দুর্বলতা বেড়ে যায়, তখন কুধারণা প্রবল হয়ে যায় এবং তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করতে থাকে। মসজিদের ইমাম তাকে বলল ঃ কিছু কাজ-কর্ম করে খেলে তোমার জন্যে ভাল হবে। আবেদ কোন উত্তর দিল না। ইমাম সাহেব তিনবার একই কথা বলে কোন জওয়াব পেল না। চতুর্থবার বলার পর আবেদ বলল ঃ মিয়া সাহেব, মসজিদের নিকটবর্তী জনৈক ইহুদী আমাকে প্রত্যহ দু'টি রুটি দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। ইমাম বলল ঃ যদি সে দায়িত্ব গ্রহণে সত্যবাদী হয়, তবে তোমার মসজিদে অবস্থান ভাল। আবেদ বলল ঃ আপনি কি আল্লাহ তা'আলার সামনে এবং মুসল্লীগণের সামনে এমন অসম্পূর্ণ তাওহীদ নিয়ে দণ্ডায়মান হন? ইমামতি না করাই আপনার জন্যে উত্তম। কারণ, আপনি ইহুদীর সত্য ওয়াদাকে আল্লাহ তা'আলার রিযিক সম্পর্কিত ওয়াদার উপর অগ্রাধিকার দেন।

একবার কোন এক মসজিদের ইমাম জনৈক মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথা থেকে খাওয়া-দাওয়া কর? মুসল্লী বলল ঃ একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে সে নামায পুনরায় পড়ে নেই, যা আপনার পেছনে পড়েছি। এরপর আপনার প্রশ্নের জওয়াব দেব।

গোপন উপায়াদির মাধ্যমে রিযিক প্রেরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা রাখার জন্যে সে সব কাহিনী শ্রবণ করা উপকারী, যাতে তাঁর অভূতপূর্ব কৃপা ও অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের ধন-সম্পদ বরবাদ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খাদেম ছিল হুযায়ফা মারআশী। তাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি হযরত ইবরাহীমের মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় কি দেখেছ? হুযায়ফা বলল ঃ আমরা একবার মক্কা মোয়াযযমার পথে খাদ্যাভাবে কয়েকদিন অভুক্ত থাকি। এরপর কুফায় পৌঁছে একটি উজাড় মসজিদে প্রবেশ করি। হযরত ইবরাহীম আমাকে দেখে বললেন ঃ মনে হয় তুমি খুব ক্ষুধার্ত। আমি বললাম ঃ আপনার ধারণা যথার্থ। তিনি বললেন ঃ কাগজ ও কালি নিয়ে এস। আমি কাগজ ও কালি নিয়ে এলে তিনি তাতে লিখলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— সর্বাবস্থায় তুমিই লক্ষ্য এবং সবকিছুতে তুমিই প্রার্থিত। অতঃপর নিজেদের

দুরবস্থা ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা সম্বলিত কয়েক লাইন কবিতা লিখে চিরকুটটি আমার হাতে অর্পণ করে বললেন ঃ বাইরে যাও এবং আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কারও সাথে মন লাগিও না। পথে সর্বপ্রথম যাকে পাবে, তাকেই এই চিরকুট দেবে। আমি বের হলাম এবং সর্বপ্রথম যাকে পেলাম, সে ছিল খচ্চর আরোহী। আমি তাকে চিরকুটটি দিলে সে তা পাঠ করে কান্নাকাটি করল। সে প্রশ্ন করল ঃ এই চিরকুট লেখক এখন কোথায় আছেন? আমি বললাম ঃ অমুক মসজিদে। সে আমার হাতে একটি থলে দিল, তাতে ছয়শ' দীনার ছিল। এরপর কিছুদূর এগুতেই আমি অন্য এক ব্যক্তিকে দেখলাম। আমি তার কাছে প্রথম ব্যক্তির অবস্থা জানতে চাইলে সে বলল ঃ সে একজন খৃস্টান।

অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ এখনই এসব দীনার স্পর্শ করবে না। লোকটি এক্ষণি আসবে। এরপর এক মুহূর্ত অতিবাহিত হতেই সে খৃস্টান এল এবং হযরত ইবরাহীমের মস্তক চুম্বন করতে লাগল।

আবু এয়াকুব বসরী বলেন ঃ আমি একবার হেরেম শরীফে দশদিন ক্ষুধার্ত ছিলাম। ফলে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। মনে মনে বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম এবং দুর্বলতা দূর করার জন্যে কিছু পাব ভেবে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে আমি একটি শালগম মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তা তুলে নিলাম। কিন্তু সেটা খেতে কেন জানি আমার মন প্রস্তুত হল না। অতঃপর মনে হল কে যেন আমাকে বলছে— তুমি দশদিনের ভুখা থেকে অবশেষে একটি পচা শালগম তুলে নিলে? আমি শালগমটি ফেলে দিয়ে আবার হেরেম শরীফে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, এক অনারব আমার দিকে চলে আসছে। সে এসে আমার সামনে বসে গেল এবং একটি পুঁটলি আমার সামনে রেখে বলল ঃ এটা আপনার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম— আপনি এটা বিশেষভাবে আমাকে দিলেন কেন? সে বলল ঃ আসলে ঘটনা হল, আমরা দশদিন সমুদ্রে ছিলাম। আমাদের জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আমি মানত করলাম, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন, তবে আমি এই পুঁটলি কা'বার খাদেমদের মধ্য থেকে তাকেই দেব, যার উপর আমার প্রথম দৃষ্টি পড়বে। এখন আপনাকেই আমি সর্বপ্রথম দেখেছি। সুতরাং বিশেষভাবে আপনাকে দেয়ার এটাই কারণ। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, এটা খুলুন।

খোলার পর দেখা গেল তাতে মিসরের ময়দা, খোসা ছাড়ানো বাদাম এবং বরফী (চিনি দুধ দ্বারা তৈরী এক প্রকার মিষ্টি) ছিল। আমি প্রত্যেক প্রকার থেকে এক এক মুষ্টি নিয়ে বললাম ঃ অবশিষ্টটুকু আমার পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গীদেরকে উপহার দেবেন। আমি আপনার মানত কবুল করলাম। এরপর আমি মনে মনে বললাম ঃ তোমার রিযিক তো দশ মনযিল দূর থেকে চলে তোমার কাছে আসে, আর তুমি জঙ্গলে তা তালাশ কর!

আবু সাঈদ সেরায বলেন ঃ আমি পাথেয় ছাড়াই এক জঙ্গলে গেলাম এবং উপোসের পর উপোস করতে লাগলাম। একদিন দূরে একটি মনযিল দেখে এই ভেবে খুশী হলাম যে, আর দেরী নয়— এই তো পৌঁছে গেলাম। পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করলাম, আমি গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করেছি। তখনই কসম খেলাম, আমি এই জনপদে যাব না, যে পর্যন্ত কেউ নিজে আমাকে না নিয়ে যায়। অতঃপর আমি নিজের জন্যে বালুর মধ্যে একটি গর্ত খনন করে তাতে নিজের দেহ বুক পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। মাঝরাতে সেখানকার লোকেরা শুনতে পেল, কে যেন উচ্চস্বরে বলছে— হে বস্তিবাসীরা! আল্লাহ্ তা'আলার একজন ওলী নিজেকে এই বালুর মধ্যে বন্দী করে নিয়েছে। তোমরা তার খবর নাও। অতঃপর কয়েকজন লোক এসে আমাকে টেনে বালু থেকে বের করল এবং বস্তিতে নিয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরজায় পড়ে থাকত। একদিন হঠাৎ সে শুনল ঃ তুমি ওমরের উদ্দেশে হিজরত করেছিলে, না আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে? যাও এবং কোরআন শিখ। কোরআন তোমাকে ওমরের দরজা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে। লোকটি তখনই সেখান থেকে প্রস্থান করল এবং নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। হযরত ওমর তার খোঁজ করালেন। জানা গেল, সে নির্বাস অবলম্বন করেছে এবং এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাকে দেখার জন্যে আমার খুব বাসনা হয়েছিল। কি কারণে তুমি আমার সাথে দেখা কর না? সে বলল ঃ আমি কোরআন শিখেছি। কোরআনই আমাকে ওমর ও ওমর পরিবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি কালামে মজীদে কি পেয়েছ? লোকটি বলল ঃ আমি পেয়েছি – وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

অর্থাৎ, 'আকাশে নিহিত রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা

তোমাদেরকে দেয়া হয়।' তখন আমি ভাবলাম, আমার রিযিক তো আকাশে। আমি এটা পৃথিবীতে খুঁজলে কোথায় পাব? হযরত ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ তোমার কথা ঠিক। এরপর থেকে তিনি লোকটির কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন।

আবু হামযা খোরাসানী বলেন ঃ এক বছর আমি হজ্জে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ এক কূয়ায় পড়ে গেলাম। আমার মন বলল ঃ সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা দরকার। কিন্তু আমি বললাম, আল্লাহর কসম, কখনও ফরিয়াদ করব না। এমন সময় দু'ব্যক্তি সে কূয়ায় এল। তাদের একজন অন্যজনকে বলল এস, এই কূয়ার মুখ বন্ধ করে দেই, যাতে কেউ এতে না পড়ে যায়। এরপর তারা বাঁশ ও চাটাই এনে কূয়ার মুখ বন্ধ করে দিল। আমি চীৎকার করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আবার ভাবলাম, যার কাছে চীৎকার করব, তিনি তো এই ব্যক্তিদ্বয়ের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই চুপ করে রইলাম। এর এক মুহূর্ত পরেই সেখানে কি যেন এল এবং কূয়ার মুখ খুলে পা ভেতরে নামিয়ে দিল। সে গুন্‌গুন্‌ শব্দে আমাকে বলল ঃ আমার পা জড়িয়ে ধর। আমি তাই করলাম। বাইরে আসার পর দেখি সেটি এক হিংস্র প্রাণী। প্রাণীটি তৎক্ষণাত সেখান থেকে চলে গেল। তখন গায়বী আওয়াজ শুনলাম, হে আবু হামযা! দেখ, আমি তোমাকে মৃত্যুর সাহায্যেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলাম।

এমনি ধরনের অসংখ্য গল্প ও কাহিনী রয়েছে। কত উল্লেখ করা যায়! যদি ঈমান মযবুত হয়, এক সপ্তাহ অনাহারে থাকার ক্ষমতা থাকে এবং এই বিশ্বাসও পাকাপোক্ত হয় যে, সাতদিন পর্যন্ত রিযিক না পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মৃত্যুই উত্তম, তবে এসব গল্প-কাহিনী শুনে তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। নতুবা দুর্বল ঈমান সহকারে এসব ঘটনা মোটেই উপকারী নয়।

এখন সন্তান-সন্ততিবিশিষ্ট ও ছাপোষা ব্যক্তির তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রকাশ থাকে যে, ছাপোষা ব্যক্তির বিধান একা এক ব্যক্তির বিধান থেকে আলাদা। কেননা, একা এক ব্যক্তির তাওয়াক্কুল দু'টি বিষয় ছাড়া জায়েয নয়। এক, সপ্তাহকাল পর্যন্ত মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা না করে এবং মনেও সংকীর্ণতা অনুভব না করে কোন কিছু না খেয়ে থাকতে সক্ষম হওয়া। দুই, উপরে যে সকল বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো অর্জিত হওয়া। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, রিযিক পাওয়া না গেলে মৃত্যুর জন্যে এই ভেবে আন্তরিকভাবে সম্মত থাকা যে, এ ক্ষেত্রে

মৃত্যুই রিযিক। অর্থাৎ, তার জন্যে যে রিযিক উত্তম, অর্থাৎ আখেরাতের রিযিক, তাই সে পাবে। একা এক ব্যক্তির তাওয়াক্কুল এভাবেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ছাপোষা ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন। তার সন্তান-সন্ততিকে খামাখা ক্ষুধায় সবর করার জন্যে চাপ দেয়া জায়েয নয়। তাদের সামনে তাওহীদের পন্থায় বক্তৃতা দেয়াও সম্ভব নয় যে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করা একটি উত্তম ও ঈর্ষাযোগ্য রিযিক। এমনিভাবে অন্যান্য বিশ্বাসও তাদের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। অতএব, ছাপোষা ব্যক্তির জন্যে উপার্জনকারীর অনুরূপ তাওয়াক্কুল করাই সমীচীন, যা তাওয়াক্কুলের তৃতীয় স্তর। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তাওয়াক্কুল এমনি ছিল। তিনি জীবিকার জন্যে বাজারে রওয়ানা হয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাওয়া এবং তাওয়াক্কুলের বাহানায় তাদের খবরদারী না করা হারাম। কেননা, মাঝে মাঝে এটা তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, যার দায়িত্ব থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুক্তি পাবে না। হাঁ, যদি সন্তান-সন্ততিও কিছুদিন ভুখা থাকা মেনে নেয় এবং ক্ষুধায় মৃত্যুবরণকে রিযিক ও সৌভাগ্য মনে করে, তবে তার জন্যে তাওয়াক্কুল করা জায়েয।

মানুষের নফ্স তথা মনও তার সন্তান। একে বিনষ্ট করাও জায়েয নয়। যদি ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা নফসের না থাকে এবং ক্ষুধার কারণে মন অস্থির থাকে— ঠিকমত এবাদত হতে না পারে, তবে এরূপ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে, আবু তোরাব বখশী এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার পর খাওয়ার জন্যে তরমুজের ছাল তুলে নিয়েছে। তিনি তাকে বললেন ঃ তাসাওউফ তোমার জন্যে উপযুক্ত নয়। তুমি বাজারে গিয়ে কাজ-কর্ম কর। অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল ছাড়া তাসাওউফ হয় না। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী পানাহার থেকে সবর করতে পারে, তারই তাওয়াক্কুল করা সাজে। হযরত আলী রুদবারী বলেন ঃ যদি কেউ পাঁচ দিন পরেই বলতে থাকে, সে ক্ষুধার্ত, তাকে বাজারে গিয়ে কাজ-কর্ম করতে বল।

মানুষের দেহও তার সন্তান। দেহের জন্যে ক্ষতিকর বস্তুতে তাওয়াক্কুল করা সন্তানের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করার অনুরূপ। নফ্স ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে মানুষ যদি ক্ষুধায় সবর করার জন্যে নফসের উপর চাপ দেয়, তবে তা জায়েয; কিন্তু সন্তান-সন্ততিকে চাপ দেয়া নাজায়েয।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, উপায়াদি থেকে সরে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং দীর্ঘদিন ক্ষুধায় সবর করতে অভ্যস্ত হওয়া এবং ঘটনাক্রমে কোন সময় রিযিক আসতে বিলম্ব হলে মৃত্যুবরণে সম্মত থাকার নামই তাওয়াক্কুল।

যে ব্যক্তি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যাবলী নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে, সে নিশ্চিতরূপে জানে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর ভেতরে এমন ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, যাতে মানুষের কাছ থেকে তার রিযিক বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, যদি সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে। কেননা, যে মানুষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার ক্ষমতাই রাখে না, সে-ও তো রিযিক পায়। যেমন, শিশু তার মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার রিযিকের ব্যবস্থাকল্পে তার নাভি মায়ের নাভির সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন! ফলে মায়ের খাদ্য থেকে কিছু অংশ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তা নলের সাহায্যে শিশুর পেটে পৌছানো হয়। অথচ এতে শিশুর কোন কলাকৌশল নেই।

এরপর শিশু যখন মায়ের গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন মায়ের মনে এমন স্নেহ ও দয়ার্দ্রতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়, যার ফলে সে অহরহ শিশুর ভরণপোষণে নিয়োজিত থাকে। এই ভরণ-পোষণ করতে সে বাধ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই তার অন্তরে মায়া-মমতার দুর্নিবার অনল জ্বালিয়ে রাখেন। খাদ্য চিবানোর জন্যে যেহেতু শিশুর মুখে দাঁত থাকে না, তাই তার খাদ্য দুধ নির্দিষ্ট করা হয়, যা চিবানোর প্রয়োজন হয় না। শিশু তার নরম গঠন প্রকৃতির কারণে ঘন খাদ্য সহ্য করতে পারে না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে মায়ের স্তন থেকে পাতলা দুধ তার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। জিজ্ঞাসা করি, এতে শিশুর কোন চেষ্টা-তদবীর এবং মায়ের কোন কলাকৌশল থাকে কি?

এরপর যখন শিশু ঘন খাদ্য খাওয়ার বয়সে পৌছে, তখন তার মুখে চিবানোর জন্যে দাঁত, চোয়াল ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। এরপর যখন আরও বড় হয় এবং নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করতে পারে, তখন তার জন্যে জ্ঞানার্জন ও আখেরাতের দিকে চলার পথ সুগম করে দেয়া হয়। এখন সাবালক হওয়ার পর রিযিকের জন্যে ভীরুতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা চরম মূর্খতা নয় কি? কেননা, সাবালক হওয়ার পর তার জীবিকার উপায়াদি হ্রাস পায়নি; বরং অনেক বেড়ে গেছে। প্রথমে সে উপার্জন করতে সক্ষম ছিল না। এখন সে ক্ষমতা এসে গেছে। পূর্বে তার প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ ও বাৎসল্য প্রদর্শনকারী ছিল মাত্র পিতামাতা। এখন আল্লাহা তা'আলা সে

মায়া-মমতা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সমস্ত মুসলমান ও সমস্ত নগরীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে করুণায় তার হৃদয় ভরে যায়, তার প্রতি দয়ার্দ্র হয় এবং তার অভাব মোচনে আগ্রহী হয়। সুতরাং পূর্বে তার প্রতি স্নেহশীল ছিল মাত্র একজন, আর এখন হাজারো। এতীমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এক ব্যক্তি অথবা অনেক ব্যক্তির অন্তরে তার প্রতি করুণা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে এতীমকে নিজের কাছে এনে ভরণ-পোষণ করায়। দুর্মূল্যের বাজারেও আজ পর্যন্ত শুনা যায়নি, কোন এতীম অনাহারে ও অযত্নে মারা গেছে। অথচ সে নিজের ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা বোধ করে না এবং তার কোন বিশেষ ভরণ-পোষণকারী থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার ভরণ-পোষণ সেই করুণার মাধ্যমেই করেন, যা তিনি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক এতীমকে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, যা পিতামাতা বর্তমান আছেন এমন শিশুদের জন্যেও সহজলভ্য নয়।

এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি কারণে মানুষ এতীমের ভরণ-পোষণ করে। তা এই যে, মানুষ তাকে বাল্যাবস্থার কারণে অক্ষমও অপারগ মনে করে। কিন্তু কর্মক্ষম সাবালক ব্যক্তির প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। তার সম্পর্কে বলা হয়, সে সুস্থ্ সবল দেহের অধিকারী হয়েও নিজের জন্যে উপার্জন করে না কেন? ফলে সে যাবতীয় করুণা ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত থাকে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, যদি সাবালক ব্যক্তি অলস ও বেকার হয়, তবে তার জন্যে তাওয়াক্কুলের কোন অর্থ নেই, তার উচিত উপার্জন করে খাওয়া। পক্ষান্তরে যদি সে কোন মসজিদে অথবা কক্ষে আল্লাহ্র কাজে মশগুল থাকে, জ্ঞানচর্চা করে অথবা এবাদতে নিয়োজিত থাকে, তবে তাকে কোন ব্যক্তিই তিরস্কার করে না যে, তুমি উপার্জন কর না কেন? বরং আল্লাহ্র কাজে মশগুল থাকার কারণেই মানুষের অন্তরে তার প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তারাই তার প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ করতে থাকে। তার দায়িত্ব কেবল এতটুকুই থাকে যে, মানুষের সামনে তার দরজা বন্ধ রাখবে না এবং তাদের কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে জঙ্গলে ও পাহাড়ে পলায়ন করবে না। কোন আলেম ও আবেদ শহরে থেকে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র কাজে মশগুল থাকার পর অনাহারে মারা গেছে আজ পর্যন্ত একথা শুনা যায়নি, বরং এ ধরনের ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আরও দশ জনকে কেবল

ইশারার মাধ্যমে খাওয়াতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হয়ে যায়, আল্লাহ্ও তার হয়ে যান। যে আল্লাহ্র কাজে মশগুল থাকে, আল্লাহ্ও তার মহব্বত মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন এবং মানুষের অন্তরকে তার এমন বশীভূত করে দেন, যেমন মায়ের অন্তর সন্তানের জন্য। তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যবস্থা করেননি যে, যে ব্যক্তি তার কাজে মশগুল থাকবে, সে সুমিষ্ট হালুয়া, কোরমা, পোলাও ও আকর্ষণীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সদাসর্বদা পেতে থাকবে; যদিও মাঝে মাঝে এসব পাওয়া যায়। তবে তিনি এই ব্যবস্থা অবশ্যই রেখেছেন যে, সে প্রতি সপ্তাহে যবের রুটি অথবা শাক, তরকারি ব্যঞ্জন অবশ্যই পাবে। অধিকাংশ সময় প্রয়োজনের অতিরিক্তও মিলে। এখন যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল বর্জন করে, সে শুধু এ কারণে বর্জন করে যে, তার মন সর্বদা আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, উত্তম পোশাক ও চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যের প্রতি অনুখ। আখেরাতের পথে এসব বিষয়ের কোন মূল্য নেই এবং এগুলো উৎকণ্ঠা ছাড়া সহজলভ্য নয়। উৎকণ্ঠার মাধ্যমেও যৎকিঞ্চিতই অর্জিত হয়।

অতএব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে চেষ্টা ও উৎকণ্ঠার প্রভাব দুর্বল। এ কারণে এরূপ ব্যক্তি নিজের কলাকৌশল ও উৎকণ্ঠার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে না; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কৌশল দ্বারাই শান্তি লাভ করে, যিনি মানুষের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, কোন মানুষের রিযিক থেকে যায় না এবং কেউ নিজের রিযিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে কদাচিৎ রিযিক পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যায়, যা খুবই বিরল ঘটনা। কৌশল ও উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও তো মাঝে মাঝে বিলম্ব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এসব বিষয় হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করবে এবং সাথে সাথে অন্তরে বীরত্বও থাকবে, তার অবস্থা হযরত হাসান বসরীর অনুরূপ হবে। তিনি বলেন, আমার মন চায়, বসরার সমস্ত অধিবাসী আমার পরিবারভুক্ত হোক অর্থাৎ, সকলের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্বে থাকুক। হযরত ওয়াহাব ইবনে ওয়ার্দ বলেন ঃ যদি আকাশ তামা এবং পৃথিবী রাঙতা হয়ে যায়, তারপরও যদি আমি রিযিকের জন্যে যত্নবান হই, তবে আমার ধারণায় আমি মুশরিক।

এসব বিষয় অনুধাবন করার পর পাঠকবর্গের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাওয়াক্কুল একটি বোধগম্য বিষয়। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী, তার জন্যে তাওয়াক্কুলে পৌঁছা সম্ভব। আরও বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল ও তার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে, তার অস্বীকার আদ্যোপান্ত মূর্খতা।

প্রিয় পাঠক, আপনারা তাওয়াক্কুলের অস্তিত্ব ও সম্ভাব্যতার বিশ্বাস হারিয়ে বসবেন না। প্রত্যেকের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা এবং দিনাতিপাতের জন্যে যা দরকার, তা নিয়েই রাযী থাকা। এ পরিমাণ রিযিক প্রত্যেকের কাছে আসবে, যদিও সে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কেউ এরূপ বিশ্বাস সহকারে জীবন যাপন করলে আল্লাহ্ পাক এরূপ ব্যক্তির হাতে তার রিযিক পাঠিয়ে দেবেন, যার সম্পর্কে পূর্বে ধারণাও করা যায় না। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলে মশগুল হওয়ার পর অভিজ্ঞতার দ্বারা এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করা যাবে—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং ধারণাতীত স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনায় রিযিকের যে সব গোপন উপায় রয়েছে, তা মানুষের জানা উপায়াদির তুলনায় অনেক বেশী; বরং রিযিক আসার পথ অসংখ্য। কেউ এসব পথ বর্ণনা করতে পারে না। কেননা, এগুলোর প্রকাশ পৃথিবীতে এবং কারণ আকাশে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আকাশে নিহিত আছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

আকাশের রহস্য সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। এর কারণেই এক দল লোক হযরত জুনায়দের খেদমতে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি খুঁজছ? তারা বলল ঃ আমরা রিযিক খুঁজছি। তিনি বললেন ঃ যদি এর স্থান তোমাদের জানা থাকে, তবে খোঁজ। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাইব। হযরত জুনায়দ বললেন ঃ যদি তোমরা মনে কর, তিনি তোমাদেরকে ভুলে যাবেন, তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দাও। তারা আরয করল ঃ আচ্ছা, আমরা ঘরে বসে থেকে তাওয়াক্কুল করব। এরপর কি হয় দেখব। তিনি বললেন ঃ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে তাওয়াক্কুল করা সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত। তারা আরয করল ঃ তা হলে আমরা কি করব? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ চেষ্টা-তদবীর পরিহার কর।

আহমদ ইবনে ঈসা খেরায বলেন ঃ একবার জঙ্গলে অবস্থানকালে আমার খুব ক্ষুধা লাগল। আমার মনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করার প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু আমি বললাম ঃ এটা তাওয়াক্কুলকারীদের কাজ নয়। তখন মন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবর প্রার্থনা করার উপর জোর দিল। আমি যখন সবরের দোয়া করার ইচ্ছা করলাম, তখন গায়েবী আওয়াজ হল— তুমি আমার নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা রাখ। যে আমার নিকটবর্তী হয়, সে ধ্বংস হতে পারে না। তুমি সংকটে পড়ে সবর প্রার্থনা করছ। মনে হয়, আমি তোমাকে দেখি না এবং তুমি আমাকে দেখ না।

সারকথা, পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল হচ্ছে বান্দার তরফ থেকে অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত রিযিক পৌঁছানো। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সাচ্চা। কেউ পরীক্ষা করতে চাইলে অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করে দেখে নিতে পারে।

প্রখ্যাত আলেম ও আবেদ ব্যক্তি যদি দিনে একবার যে কোন ধরনের খাদ্য দ্বারা এবং ধর্মপরায়ণদের জন্যে উপযুক্ত মোটা বস্ত্র দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে, তবে এই পরিমাণ বস্তু সর্বদাই তার কাছে ধারণাতীত স্থান থেকে পৌঁছে যাবে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল বর্জন করা এবং উপার্জনে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর কথা। অবশ্য কেউ যদি অন্যের হাতে খেতে না চায় বরং নিজে উপার্জন করে খেতে চায়, তবে এটা সেই আলেমের জন্যে সমীচীন, যে বাহ্যিক এলেম ও আমল অনুযায়ী চলে এবং বাতেনী জগতের খবর রাখে না। কেননা, জীবিকার চিন্তা বাতেনী জগতের পরিপন্থী। অতএব, যে বাতেনী জগতে ভ্রমণ করে, তার জন্যে আধ্যাত্মিক কাজে মশগুল হওয়া এবং নিজ আগ্রহে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণকারীদের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করা উত্তম। কেননা, এতে করে সে জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলারই হয়ে থাকবে। এছাড়া সে দাতার সওয়াব লাভে সহায়ক হবে। আল্লাহ্ তা'আলার অব্যাহত রীতির প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায়, যে পরিমাণ উপায় অবলম্বন করা হয়, সে পরিমাণ রিযিক আসে না। এ কারণেই জনৈক পারস্য সম্রাট এক দার্শনিককে প্রশ্ন করলেন, কিছু কিছু নির্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত রিযিক দেয়া হয় এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে, এর কারণ

কি? দার্শনিক জওয়াব দিলেন ঃ স্রষ্টার ইচ্ছা হল, মানুষ তাঁকে চিনুক। তাই এভাবে রিযিক দেয়া হয়েছে। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রিযিক পেত এবং নির্বোধ বঞ্চিত থাকত, তবে মানুষ মনে করত, বুদ্ধি বুদ্ধিমানকে রিযিক দিয়েছে। ব্যাপার যখন উল্টো হয়েছে, তখন সকলেই জেনেছে রিযিকদাতা বুদ্ধি নয়— অন্য কেউ।

এক্ষণে তাওয়াক্কুল ও উপায়াদি সম্পর্কে একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তাঁর সৃষ্টি মানবকুল কোন রাজকীয় প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিশাল ময়দানে দাঁড়ানো অগণিত ভিক্ষুকের মত। বাদশাহ্ তার গোলামদের কাছে রুটি দিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ কোন কোন ভিক্ষুককে দুটি এবং কোন কোন ভিক্ষককে একটি করে রুটি দেবে। আর চেষ্টা করবে, যাতে কেউ রুটি থেকে বঞ্চিত না হয়। এরপর বাদশাহ্ জনৈক ঘোষককে একথা ঘোষণা করতে বললেন, তোমরা সকলেই নিজ নিজ জায়গায় সস্থিরে দাঁড়িয়ে থাক এবং আমার গোলামদের জড়িয়ে ধরো না। তারা নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের কাছে রুটি পৌঁছে দেবে। যে ব্যক্তি গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং তাদের কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করবে, সে দু'রুটি নিয়ে চলে যাবে ঠিক, কিন্তু আমি তার পেছনে একটি গোলাম নিয়োজিত করব এবং এর শাস্তি সে দিন দেব, যে দিনকে আমি এর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি। সে দিনটি কবে আসবে, তা আমি কাউকে বলি না। আর যে ব্যক্তি গোলামদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদের কাছ থেকে এক রুটি নিয়ে চুপচাপ চলে যাবে, তাকে আমি সেই একই দিনে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করব। যে ব্যক্তি নিজ স্থানেই দণ্ডায়মান থেকে দুটি রুটি পাবে, তাকে শাস্তিও দেব না, পুরস্কারও দেব না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোলামদের কাছ থেকে কোন রুটি না পেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়বে, গোলামদের প্রতি রাগান্বিত হবে না এবং রুটি পাওয়ার বাসনাও করবে না, আমি তাকে নিজের উযীর নিযুক্ত করব এবং সরকারী ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত করব।

উপরোক্ত ঘোষণা শোনার পর ভিক্ষুকরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে প্রতিশ্রুত শাস্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা বলল ঃ আজ থেকে কাল পর্যন্ত অনেক সময়। আমাদের

ক্ষুধা এ মুহূর্তেই। এই বলে তারা গোলামদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুটি করে রুটি নিয়ে গেল। ফলে তারা প্রতিশ্রুত শাস্তির যোগ্য হয়ে গেল। ভিক্ষুকদের দ্বিতীয় দলটি শাস্তির ভয়ে গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরল না; কিন্তু তীব্র ক্ষুধার কারণে রুটি দুটিই নিয়ে নিল। ফলে তারা শাস্তির কবল থেকে রক্ষা পেল এবং পুরস্কারও পেল না। তৃতীয় দল বলল ঃ গোলামদের দৃষ্টিপথে বসা উচিত, যাতে তারা আমাদেরকে ছেড়ে না যায়। কিন্তু রুটি একটিই গ্রহণ করা উচিত— দুটি নয়। হয়তো আমরা পুরস্কার পাব। সে মতে তারা ওয়াদা অনুযায়ী পুরস্কারের যোগ্য হল। ভিক্ষুকদের চতুর্থ দলটি ময়দানের কোণে কোণে আত্মগোপন করে গোলামদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ যদি আমাদেরকে খুঁজে বের করেই ফেলে, তবে একটিমাত্র রুটি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। আর যদি ধরা না পড়ি, তবে সারারাত ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করলে উযীরের পদ ও বাদশাহের নৈকট্য লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা সফল হল না। গোলামরা প্রতি কোণে কোণে তালাশ করে তাদেরকে বের করে ফেলল এবং একটি করে রুটি পৌঁছে দিল। প্রত্যহ এমনি ধারা অব্যাহত রইল। কয়েকদিন পর ঘটনাক্রমে তাদের তিন ব্যক্তি এক কোণে লুকিয়ে রইল। গোলামদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল না। ফলে তারা তীব্র ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাদের দু'ব্যক্তি বলল ঃ গোলামদের সামনে গেলেই আমাদের জন্যে ভাল হত। আমরা সবর করতে পারছি না। তৃতীয় ব্যক্তি কিছুই বলল না এবং ভোর হয়ে গেল। সে-ই উযীরের পদ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হল।

এই দৃষ্টান্তে ময়দান হচ্ছে পার্থিব জীবন, অজ্ঞাত মেয়াদ হচ্ছে কেয়ামত দিবস এবং উযীর পদের ওয়াদা হচ্ছে শাহাদতের অঙ্গীকার, যা তাওয়াক্কুলকারীর প্রাপ্য। কিন্তু শর্ত হল, ক্ষুধায় সম্মত অবস্থায় ওফাতপ্রাপ্ত হওয়া। এই অঙ্গীকারের প্রতিপালন কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত হবে না। কেননা, শহীদগণ আল্লাহ তা'আলার কাছে জীবিত থাকেন এবং রিযিক পান। বাদশাহের অনুগত গোলাম দ্বারা উপায়াদি বুঝানো হয়েছে। গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরার অর্থ হল, উপায়াদি অবলম্বনে সীমা অতিক্রম করা। যারা ময়দানের মাঝখানে গোলামদের দৃষ্টিপথে স্থির বসে আছে,

তারা সেসব লোক, যারা শহরের খানকা ও মসজিদে বসে থাকে। কোণে আত্মগোপনকারী তারা, যারা তাওয়াক্কুল করে লোকালয় ত্যাগ করে এবং জঙ্গলে ভ্রমণ করে। উপায়াদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তারা রিযিক পেয়ে যান। না পাওয়া খুবই বিরল। তাদের মধ্যে কেউ ক্ষুধার্ত ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মারা গেলে সে শাহাদত ও নৈকট্য লাভ করে।

মানুষের মধ্যে সম্ভবত শতকরা নব্বই জন উপায়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাত জন এমন, যারা শহরে অবস্থান করে এবং নিজের সুখ্যাতির মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে। অবশিষ্ট তিন জন জঙ্গলে ঘুরাফেরা করে। তাদের দু'জন উপায়াদি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ এবং কেবল একজন নৈকট্য লাভে সক্ষম। সম্ভবত অতীত যমানায় এই পরিসংখ্যান হবে। আজকাল তো দশ হাজারের মধ্যে একজনও উপায়াদি বর্জন করে না।

(২) দ্বিতীয় ভাগে উপকারী বস্তুসমূহ সঞ্চয় ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্র, উপার্জন অথবা অন্য কোন উপায়ে ধনপ্রাপ্ত হয়, তার জন্যে সেই ধন সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে তিনটি অবস্থা রয়েছে। এক, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত হলে খাবে, বস্ত্রহীন হলে পরবে এবং গৃহের প্রয়োজন হলে গৃহ ক্রয় করবে। অবশিষ্ট যা থাকবে, তা তৎক্ষণাৎ দান করে দেবে। প্রয়োজনের এই পরিমাণ ছাড়া গ্রহণ করবে না এবং নিজের কাছে সঞ্চিত রাখবে না। রাখলেও এ নিয়তেই রাখতে পারবে। এরূপ ব্যক্তি বাস্তবে তাওয়াক্কুলের দাবী পূরণকারী। এটা সর্বোচ্চ অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা হল, প্রাপ্ত ধন-সম্পদ এক বছর অথবা আরও বেশী সময়ের জন্যে সংরক্ষিত রাখা। এ অবস্থা তাওয়াক্কুলকে বাতিল করে দেয় এবং এরূপ ব্যক্তি কিছুতেই তাওয়াক্কুলকারী নয়। কেউ কেউ বলেন ঃ কেবল তিন প্রকার প্রাণী সঞ্চয় করে থাকে— ইঁদুর, পিঁপড়া ও মানুষ। তৃতীয় অবস্থা হল, চল্লিশ দিন অথবা তারও কম সময়ের জন্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা। এ অবস্থা মানুষকে তাওয়াক্কুলকারীদের জন্যে প্রতিশ্রুত প্রশংসনীয় মকাম থেকে বঞ্চিত করে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ এ অবস্থা মানুষকে তাওয়াক্কুলের আওতা থেকে বের করে দেয়। খাওয়াস বলেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধন-সম্পদ রেখে দিলে মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয়ে যায় না। এর বেশী দিন রাখলে খারিজ হয়। আবু

তালেব মক্কী বলেন ঃ চল্লিশ দিনের বেশী রাখলেও তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না। মূল সঞ্চয় যখন বৈধ, তখন এই মতভেদের কোন অর্থ নেই। হাঁ, কেউ মনে করতে পারে, সঞ্চয় করাই মূলত তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। অতএব সঞ্চয় না করাই উত্তম। যদি মনের দুর্বলতার কারণে সঞ্চয় করতেই হয়, তবে সঞ্চয় যত কম হবে, ততই উত্তম। হাদীসে জনৈক ফকীরের কিস্সা বর্ণিত আছে। মৃত্যুর পর তার গোসল দেয়ার জন্যে রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসামা (রাঃ)-কে নির্দেশ করেন। তাঁরা তাকে গোসল দিয়ে যখন তারই চাদর দিয়ে তাকে কাফন পরালেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন যখন উঠবে, তখন তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত আলোকোদ্ভাসিত হবে। যদি একটি অভ্যাস তার মধ্যে না থাকত, তবে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে উঠত। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ সেটি কি অভ্যাস? তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি রোযাদারও ছিল, তাহাজ্জুদও পড়ত এবং আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরও খুব করত। কিন্তু যখন শীতকাল আসত, তখন গ্রীষ্মকালীন কাপড়-চোপড় পরবর্তী গ্রীষ্মকালের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখত। এরপর যখন গ্রীষ্মকাল আসত, তখন শীতকালীন বস্ত্র পরবর্তী শীতকালের জন্যে রেখে দিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ

من اقل ما اوتيتم منه اليقين وعزيمة الصبر -

অর্থাৎ, যে বস্তু তোমাদেরকে স্বল্প পরিমাণে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে একীন তথা বিশ্বাস এবং সবরের দৃঢ়তা।

লোটা-বদনা, ঘটিবাটি, দস্তরখান ইত্যাদি যেসব বস্তু সর্বক্ষণ কাজে লাগে, সেগুলো এসবের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, এগুলো রেখে দেয়া তাওয়াক্কুলের মর্তবা হ্রাস করে না। কিন্তু শীতকালীন কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন গ্রীষ্মকালে থাকে না। এ বিধান সে ব্যক্তির জন্যে, যার অন্তর সঞ্চয় বর্জন করার কারণে উদ্বিগ্ন হয় না। পক্ষান্তরে যদি সঞ্চয় না করলে মন অস্থির থাকে এবং এবাদত ও যিকির-ফিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তার পক্ষে সঞ্চয় করাই উত্তম। কেননা, অন্তরের সংশোধনই উদ্দেশ্য, যাতে সে আল্লাহর যিকিরের জন্যে প্রস্তুত থাকে। বলা বাহুল্য, রসূলে আকরাম (সাঃ) সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী,

কারিগর ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিও ছিল। তিনি ব্যবসায়ীকে ব্যবসা ত্যাগ করার হুকুম দেননি এবং কোন পেশাদারকে তার পেশা বর্জন করতে বলেননি। যারা এসব বিষয় বর্জনকারী ছিল, তাদেরকেও তিনি ব্যবসা অথবা পেশা অবলম্বন করার হুকুম দেননি। বরং তিনি সকলকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের সাফল্য ও মুক্তি অন্তরকে দুনিয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করার মধ্যেই নিহিত।

উপরে বর্ণিত যাবতীয় বিধানই একা ব্যক্তির জন্যে। সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তির বিধান, যদি সন্তান-সন্ততির দুর্বলতা দূর করা ও তাদের মনের স্থিরতার জন্যে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রাখে, তবে তা তাওয়াক্কুলের গণ্ডির বাইরে যাবে না। এর বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করলে তা তাওয়াক্কুলকে বাতিল করে দেবে। কেননা, উপায়াদি প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে। অতএব, বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রেখেছেন এবং হযরত উম্মে আয়মন প্রমুখকে বলেছেন ঃ আগামীকালের জন্যে কিছু রেখো না। হযরত বেলাল ইফতারের জন্যে রুটির একটি টুকরা রেখে দিয়েছিলেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ হে বেলাল, আরশের অধিপতি তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন, এরূপ ভয় করো না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে যে সঞ্চয় করেছেন, তাতে তাঁর তাওয়াক্কুল হ্রাস পায়নি। কারণ, তিনি নিজের সে সঞ্চয়ের উপর ভরসা করেননি; বরং তাঁর সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের জন্যে একটি সুন্নত পন্থা রেখে যাওয়া। কারণ, উম্মতের শক্তিশালী ব্যক্তিও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শক্তির তুলনায় দুর্বল। কাজেই তারা যাতে নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যা করার ক্ষমতা আছে, তাও বর্জন না করে, সেজন্যে তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেছে, সঞ্চয় করা কিছু লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং কিছু লোকের জন্যে ক্ষতিকর নয়। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতই এর প্রমাণ। সুফ্ফায় বসবাসকারী জনৈক সাহাবীর ইন্তেকাল হলে তাঁর কাছে কাফনও পাওয়া গেল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তার পোশাক-পরিচ্ছদ তালাশ কর। তালাশ করার পর তা থেকে দুটি দীনার বের হল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

বললেন, এ দুটি দীনার হচ্ছে তার কলংকের দাগ। অথচ অন্য মুসলমানরা আরো বেশী ধন-সম্পদ রেখে মারা গেলে তিনি তাদের বেলায় এরূপ মন্তব্য করতেন না। এ হাদীসের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, এগুলো দোযখের আগুনের দাগ। কেননা, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم -

অর্থাৎ, অতঃপর এর দ্বারা তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।

দুই, দাগ মানে পূর্ণতার স্তরে ত্রুটি। অর্থাৎ, মানুষের চেহারায় দাগ থাকার কারণে যেমন সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি এ দুটি দীনারের কারণে তার পূর্ণতার চেহারায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ছেড়ে মারা যায়, তা আখেরাতে তার জন্যে লোকসানের কারণ হয়। তাই আখেরাতে পুরোপুরি লাভবান হতে হলে দুনিয়াতে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

হযরত বিশরের শিষ্য হোসাইন মানাযেলী বলেন ঃ আমি সকাল বেলায় হযরত বিশরের খেদমতে বসে ছিলাম, এমন সময় মাঝারি বয়সের গোধূম বর্ণের জনৈক বুযুর্গ গলা খাকারি দিতে দিতে তাঁর কাছে আসলেন। হযরত বিশর তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে কারও জন্যে আমি তাঁকে দাঁড়াতে দেখিনি। অতঃপর তিনি আমার হাতে কয়েকটি দেরহাম দিয়ে বললেন ঃ ভাল খাবার নিয়ে আস এবং আমাদের জন্যে উপযুক্ত কোন সুগন্ধি আন। এর আগে এরূপ কথা তিনি কখনও আমাকে বলেননি। আমি খাবার নিয়ে এলে তিনি বুযুর্গের সাথে বসে আহার করলেন। অথচ এর আগে আমি তাঁকে কারও সাথে বসে আহার করতে দেখিনি। আহার শেষে দেখা গেল, অনেক খাবার বেঁচে গেছে। তখন সে বুযুর্গ বাড়তি খাদ্য নিজের কাপড়ে বেঁধে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। বুযুর্গের এই কাণ্ড দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। হযরত বিশর আমাকে বললেন ঃ মনে হয় তুমি মেহমানের এ আচরণ অপছন্দ করেছ। আমি আরয করলাম ঃ অবশ্যই। কারণ, তিনি অবশিষ্ট খাদ্য বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেলেন। হযরত বিশর বললেন ঃ এই বুযুর্গ আমার ভাই হযরত ফাতাহ্ মুসেলী। আজ আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে তিনি সুদূর মুসেল থেকে এসেছিলেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি আমাকে এ শিক্ষা দিতে এসেছেন

যে, যখন তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সঞ্চয় কোনরূপ ক্ষতি করে না।

(৩) তৃতীয় ভাগে উপকারী বস্তু থেকে উৎপীড়ন ও ক্ষতি প্রতিহত করা সম্পর্কে বলা হবে। জানা উচিত, ক্ষতির আশংকা কখনও অন্তরে এবং কখনও ধন-সম্পদে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ক্ষতি প্রতিহতকারী উপায়সমূহ বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়। উদাহরণতঃ হিংস্র প্রাণীবহুল ভূখণ্ডে, বন্যার মুখে অথবা ভগ্ন প্রাচীরের নীচে শুয়ে থাকা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পরিষ্কার নিষিদ্ধ। এরূপ ব্যক্তি নিজেকে অহেতুক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

ক্ষতি প্রতিহত করার উপায়গুলো তিন প্রকার— নিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও কল্পনাপ্রসূত। শেষোক্ত উপায়াদি বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত। কল্পনাপ্রসূত উপায়াদি যেমন, লোহা পুড়িয়ে জন্তু-জানোয়ারকে দাগ দেয়া, মন্ত্র পড়া ইত্যাদি। এগুলো কখনও কোন ভয়ংকর রোগ দেখা দেয়ার পূর্বে এবং কখনও রোগ দেখা দেয়ার পরে করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াক্কুলকারীদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কেবল দাগ ও মন্ত্র বর্জন করাই উল্লেখ করেছেন। একথা তিনি কখনও বলেননি যে, তাওয়াক্কুলকারী যখন কোন শীতপ্রধান এলাকায় যাবে, তখন গরম জুব্বা পরিধান করবে না।

যদি কোন মানুষের পক্ষ থেকে নিপীড়ন হয় এবং তাতে সবর করতে পারে অথবা নিপীড়ন প্রতিহত করে প্রতিশোধ নিতে পারে, তবে সবর ও বরদাশত করাই তাওয়াক্কুলের শর্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا

অর্থাৎ, তাদের কটূক্তির উপর সবর করুন এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ করুন।

ولنصبرن على ماآذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

অর্থাৎ, আমরা তোমাদের নিপীড়নে সবর করব। তাওয়াক্কুলকারীদের উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।

دع اذاهم وتوكل على الله

অর্থাৎ, তাদের নিপীড়ন ছাড়ুন এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন।

نعم اجر الحا مين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون -

অর্থাৎ, সেই কর্মীদের পুরস্কার কি চমৎকার, যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর তাওয়াক্কুল করে।

এসব আয়াত মানব কর্তৃক নিপীড়ন সম্পর্কিত। কিন্তু সাপের দংশন, হিংস্র জন্তুদের ক্ষতি সাধন ও বিচ্ছুদের দংশনে সবর করা এবং তাদেরকে প্রতিহত না করা তাওয়াক্কুলের মধ্যে গণ্য নয়।

ধনসম্পদ রক্ষা করার উপায়াদির বেলায়ও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণতঃ কক্ষ ত্যাগ করার সময় যদি কক্ষের তালা লাগিয়ে দেয় অথবা বিশ্রামের সময় উটের পা বেঁধে ছেড়ে দেয়, তবে এতে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, এসব উপায় আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি থেকে জানা গেছে। এগুলো অবলম্বন করায় কোন দোষ নেই। একবার জনৈক বেদুঈন তার উট ছেড়ে দিল এবং বলল ঃ আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তাওয়াক্কুল কর এবং উটের পদযুগলও বেঁধে দাও। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

خذوا حذركم

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের হাতিয়ার তুলে নাও।

যুদ্ধকালীন নামায সম্পর্কে বলেন ঃ

وياخذوا اسلحتهم

অর্থাৎ, তারা যেন তাদের হাতিয়ার সঙ্গে নেয়।

واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل

অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ কর এবং অশ্ব পালন কর।

হযরত মূসা (আঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

فاسر بعبادی لیلا

অর্থাৎ, এরপর রাতের বেলায় আমার বান্দাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়।

রাতের বেলায় যাওয়ার অর্থ শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করা। এটা ক্ষতি প্রতিহত করার অন্যতম উপায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও ক্ষতি প্রতিহত করার জন্যে গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। নামাযে হাতিয়ার সঙ্গে রাখা নিশ্চিত প্রতিরক্ষা নয়; যেমন সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেলা নিশ্চিত প্রতিরক্ষা। বরং হাতিয়ার সঙ্গে নেয়া একটি সন্দিগ্ধ উপায়। সন্দিগ্ধ উপায়ও নিশ্চিত উপায়ের মতই। সুতরাং এমন কাল্পনিক উপায়ই রয়ে গেছে, যা বর্জন করার দাবী তাওয়াক্কুল করে। বাঘ বুকের উপর থাবা মারার পরও কোন কোন ওলী সামান্যও নড়াচড়া করেননি এবং কেউ কেউ বাঘকে অনুগত বানিয়ে তার পিঠে সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করেছেন। ইত্যাকার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সেগুলো বাস্তবে সঠিক হলেও অনুসরণের জন্য শিক্ষা করা উচিত নয়। এগুলো কারামতের একটি উচ্চস্তর—তাওয়াক্কুলের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা এই স্তরে পৌছে না, তারা এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এই স্তরে পৌছার আলামত কি? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এই স্তরে পৌছে, সে নিজেই জেনে নেয় যে, সে এই স্তরে পৌছে গেছে। সে এর কোন আলামত জানতে চায় না। তবে এখানে এর কিছু পূর্বলক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বলক্ষণ হচ্ছে, মানুষের সাথে তার অনুচর হয়ে একটি কুকুর রয়েছে, যার নাম ক্রোধ। তার কাজ হচ্ছে স্বয়ং মালিককে ও অন্যদেরকে কামড়াতে থাকা। প্রথমে এ কুকুর আনুগত্যশীল হবে। যদি সে এমন অনুগত হয় যাতে ইশারা দিলেই দৌড়ায় আর ইশারা না দিলে স্থবির হয়ে থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে পশুরাজ সিংহের পক্ষেও মানুষের অনুগত ও অনুগামী হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু জঙ্গলের কুকুরের অনুগত হওয়ার তুলনায় ঘরের কুকুর অনুগত হলে তা অধিক উত্তম। আর দেহের কুকুরের অনুগত হওয়া ঘরের কুকুরের আনুগত্যের চেয়ে অনেক উত্তম। অন্তরের কুকুর অনুগত না হলে বাইরের কুকুর অনুগত হবে বলে আশা করা উচিত নয়। যখন কেউ শত্রুর ভয়ে অস্ত্র

সঙ্গে রাখবে, চোরের ভয়ে তালা লাগাবে এবং পালিয়ে যাবার ভয়ে উটের পা বেঁধে দেবে, তখন তাকে কোন্ দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলকারী বলা যাবে? এ প্রশ্নের জওয়াব, সে জ্ঞান ও হালের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলকারী কথিত হবে। অর্থাৎ, তার এই জ্ঞান থাকবে যে, চোর প্রতিহত হলে তা আমার তালার কারণে নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিহত করার দরুন প্রতিহত হয়েছে। কেননা, অধিকাংশ দরজায় তালা লাগিয়েও কোন উপকার হয় না। অনেক উট পা বাঁধার পরেও মারা যায় অথবা পালিয়ে যায়। অনেক সশস্ত্র ব্যক্তিও নিহত হয়। কাজেই এসব উপায়ের উপর ভরসা নেই। ভরসা কেবল উপায়ের স্রষ্টা আল্লাহর উপর। আর হালের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুল হচ্ছে ঘর ও নিজের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং মুখে এরূপ বলা — ইলাহী! যদি তুমি আমার ঘরের জিনিসপত্র চুরি করার জন্যে কাউকে ক্ষমতা দাও, তবে তা তোমারই পথে উৎসর্গকৃত এবং আমি তোমার ফয়সালায় সম্মত। কেননা, তুমি আমাকে যা দিয়ে রেখেছ, তা আমার রিযিক, না অন্য কারও জন্যে লিখে দিয়েছ, তা আমার জানা নেই। আমি সর্বাবস্থায় তোমার ফয়সালায় রাযী।

এই হাল ও উপরোক্ত জ্ঞান থাকা অবস্থায় উটের পা বাঁধা, অস্ত্রসজ্জিত হওয়া এবং দরজায় তালা লাগানোর কারণে কেউ তাওয়াক্কুলের গণ্ডি থেকে খারিজ হবে না।

(৪) চতুর্থ ভাগে উপস্থিত ক্ষতি দূরীকরণে চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে বর্ণিত হবে। যেমন, রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি। উপস্থিত ক্ষতি দূর করার উপায়ও তিন প্রকার— নিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও সংস্কারপ্রসূত। নিশ্চিত উপায়, যেমন পিপাসার ক্ষতি দূরার করা জন্যে পানি পান করা, ক্ষুধার ক্ষতি দূর করার জন্যে খাবার খাওয়া ইত্যাদি। সন্দিগ্ধ উপায়, যেমন রোগের ক্ষতি দূর করার জন্যে রক্তমোক্ষণ করা, বিরেচক ওষুধ প্রয়োগে অন্ত্রশুদ্ধি ও অন্যান্য ডাক্তারী চিকিৎসা। সংস্কারপ্রসূত, যেমন লোহা পুড়ে দাগ দেয়া, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি।

নিশ্চিত উপায়াদি বর্জন করা তাওয়াক্কুল নয়; বরং মৃত্যুর ঝুঁকি থাকলে তা বর্জন করা হারাম। সংস্কারপ্রসূত উপায়াদি বর্জন করা অবশ্য তাওয়াক্কুলের শর্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াক্কুলকারীদেরকে এগুলো বর্জনকারী বলেছেন। এসব উপায়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে দাগ দেয়া, এর

কাছাকাছি তন্ত্রমন্ত্র এবং সর্বশেষ হচ্ছে "শেগুন" তথা ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন, সন্দিগ্ধ উপায়াদি– যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা ও ওষুধপত্র সেবন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) এটা করেছেন এবং অন্যকে করতে বলেছেন। তিনি এর উপকারিতা পবিত্র মুখে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ তিনি বলেছেন ঃ

ما من داء الا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله الا الموت

অর্থাৎ, এমন কোন রোগ নেই, যার ওষুধ নেই। একে চিনে যে চিনে এবং চিনে না যে চিনে না। কিন্তু মৃত্যু রোগের কোন ওষুধ নেই।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

تداووا عباد الله فان الذى انزل الداء انزل الدواء

অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা কর। কেননা, যিনি রোগ নাযিল করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন।

জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল ঃ ওষুধ ও মন্ত্র কি আল্লাহর আদেশ প্রতিহত করতে পারে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ এগুলোও আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম আদেশ। অন্য এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন— তোমরা সতের, উনিশ ও একুশ বছর বয়সে শিঙ্গা লাগিয়ে শরীর থেকে বদরক্ত বের করে দাও— যাতে রক্ত উত্তেজিত হয়ে তোমাদের মৃত্যুর কারণ না হয়। এতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে — (এক) রক্তের উত্তেজনা মৃত্যুর কারণ এবং (দুই) রক্ত বের করে দেয়া মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। কেননা, শরীর থেকে বদরক্ত রেব করা, পোশাকের ভিতর থেকে বিচ্ছু ঝেড়ে ফেলা এবং গৃহ থেকে সাপ তাড়িয়ে দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এগুলো বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়; বরং এগুলো ঘরে আগুন লেগে গেলে তা নিভানোর জন্যে পানি ঢালার মত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক সাহাবাকে ওষুধ প্রয়োগ ও পরহেয করার (বাছ মেনে চলার) আদেশ দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর চক্ষু থেকে পানি ঝরত। এ জন্যে তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি খোরমা খেয়ো না এবং এমন বস্তু খাও, যা তোমার মেযাজের সাথে মিল রাখে। অর্থাৎ, আটায় পাকানো

শাক। হযরত সোহায়ব (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা সত্ত্বেও যখন খোরমা খাচ্ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি খোরমা খাও অথচ তোমার চোখে ব্যথা? সোহায়ব বললেন ঃ আমি অন্য চোয়াল দিয়ে খাচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি হাসলেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিজের চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রত্যেক রাত্রে চোখে সুরমা লাগাতেন, প্রতিমাসে শিঙ্গা দিয়ে বদরক্ত বের করতেন এবং প্রতিবছর জোলাব নিতেন। ওহী অবতরণের সময় তাঁর মাথায় ব্যথা হত। এ জন্যে তিনি মাথায় মেহেদির প্রলেপ দিতেন। যখমে মেহেদি লাগানোর কথাও কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। মোট কথা, নিজে চিকিৎসা করা ও অপরকে চিকিৎসা করতে বলা সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে "তিব্বুন্নবী (সাঃ)" নামে একটি পুস্তকও রচিত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেমের কাহিনীতে লিখিত আছে, একবার হযরত মূসা (আঃ) রোগাক্রান্ত হলে বনী ইসরাঈল তাঁর কাছে এসে রোগ নির্ণয় করল এবং আরয করল ঃ আপনি যদি এ চিকিৎসা করেন, তবে সুস্থ হয়ে যাবেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমার চিকিৎসার দরকার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা চিকিৎসা ছাড়াই আমাকে আরোগ্য দান করবেন। এরপর রোগ আরও বেড়ে গেল। লোকেরা এসে আরয করল ঃ এ রোগের ওষুধ তাই, যা আমরা বলেছি। এটা আমাদের পরীক্ষিত। মূসা (আঃ) এবারও অস্বীকার করলেন। ফলে রোগ বেড়েই চলল। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ওহী পাঠালেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, লোকদের বর্ণিত ওষুধ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে সুস্থ করব না। এরপর বনী ইসরাঈল এসে তাকে সে ওষুধ খাইয়ে দিলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। কিন্তু মনে কিছু খটকা রয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা আবার ওহী পাঠালেন ঃ তুমি আমার উপর তাওয়াক্কুল করে আমার প্রজ্ঞার ব্যবস্থাপনাকে এলোমেলো করে দিতে চাও। বল তো ওষুধের মধ্যে উপকারিতা কে রেখেছে? ওষুধ আমার আদেশে আরোগ্য দান করে। জনৈক পয়গাম্বর ধাতুদুর্বলতায় আক্রান্ত হলে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে গোশ্ত ও দুগ্ধ খাওয়ার আদেশ দেয়া হয়। কারণ, এগুলো বলকারক। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নবীর কাছে অভিযোগ করল যে, তাদের সন্তান-সন্ততি সুশ্রী হয় না। সেমতে নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করা হল— তোমার সম্প্রদায়কে বলে

দাও, তারা যেন তাদের গর্ভবতী মহিলাদেরকে "বিহী" নামক অম্ল ফল খাওয়ায়। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা কারণ ও ঘটনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে। ওষুধও আল্লাহ্র আদেশের অধীন একটি কারণ বা উপায়। অতএব, রুটি যেমন ক্ষুধার প্রতিকার এবং পানি যেমন পিপাসার প্রতিকার, তেমনি 'সিকঞ্জবীন' (অম্লরসের সঙ্গে চিনি সহযোগে প্রস্তুত উপকরণ বিশেষ) পিত্তের ওষুধ। এতে কেবল একটি বিষয়ের পার্থক্য। ক্ষুধার প্রতিকার রুটি দ্বারা এবং পিপাসার প্রতিকার পানি দ্বারা করা এতই সুস্পষ্ট যে, মানুষ মাত্রই তা জানে; কিন্তু পিত্তের চিকিৎসা সিকঞ্জবীন দ্বারা হয়, তা অল্প লোকেই জানে।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, ওষুধ ও আরোগ্য কার হাতে? আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার হাতে। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ তা হলে চিকিৎসক কি করে? আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার কাছ থেকে আরোগ্য অথবা মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তারা রিযিক খায় এবং আমার বান্দাদেরকে আনন্দ দান করে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী মনীষী ও বুযুর্গগণের মধ্যে যারা অসুখে-বিসুখে চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আবার এমনও কিছু সংখ্যক মনীষী রয়েছেন, যাঁরা চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেছেন। উদাহরণতঃ অন্তিম মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খেদমতে কেউ কেউ আরয করল ঃ আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক আমাকে দেখেছে এবং বলেছে, আমি যা চাই, তাই করি। হযরত আবু যর (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা ছিল। লোকেরা বলল ঃ আপনি চিকিৎসা করুন। তিনি বললেন ঃ আমার এ জন্যে কোন চিন্তা নেই। লোকেরা বলল ঃ আপনি সুস্থতা লাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ চোখের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি তাঁর কাছে দোয়া করব। রবী ইবনে খায়সাম (রাঃ) অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলে তিনি বললেন ঃ আমিও ইচ্ছা করেছিলাম; কিন্তু পর মুহূর্তেই আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতির কথা মনে পড়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেক চিকিৎসক ছিল। কিন্তু এখন চিকিৎসকও নেই, রোগও নেই। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন ঃ যারা তাওয়াক্কুলে বিশ্বাস করে এ পথে চলে, তাদের জন্যে ওষুধ সেবনে চিকিৎসা না করাই

আমি ভাল মনে করি। স্বয়ং তাঁর কোন অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসকের জিজ্ঞাসারও তিনি কোন জওয়াব দিতেন না। হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হল ঃ বান্দার তাওয়াক্কুল কখন সঠিক হয়? তিনি বললেন ঃ যখন সে দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, নিজের অবস্থাতেই মশগুল থাকে।

এ বুযুর্গগণের কর্মপদ্ধতি ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় কিরূপে হবে, এক্ষণে তাই আলোচ্য বিষয়। এই বুযুর্গগণের চিকিৎসা না করানোর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রোগী যদি কাশফের স্তরে উন্নীত হয় এবং কাশফের মাধ্যমে জেনে নেয় যে, তার মৃত্যু নিকটবর্তী, চিকিৎসায় কোন উপকার হবে না, তবে চিকিৎসায় সম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অস্বীকৃতি এ কারণেই ছিল। তিনি কাশফবিশিষ্ট ছিলেন। অন্যথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিকিৎসা করতে দেখে এবং অপরকে চিকিৎসার জন্যে বলতে শুনে তিনি কিরূপে অস্বীকার করতে পারতেন?

দ্বিতীয় কারণ, রোগী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এবং নিজের পরিণতির ভয় ও অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ওয়াকিফহাল হওয়ার ব্যাপারে এত বেশী মশগুল যে, চিকিৎসার অবসরই নেই। এই দুঃখ ও আশংকায় সে রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করতেই সক্ষম নয়, চিকিৎসা করবে কিসের? হযরত আবু যরের উক্তি এ বিষয়েরই পরিচায়ক। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি চোখের ব্যাপারে কোন চিন্তাই করি না। তাঁর ভেতরে গোনাহের ভয় যেন দৈহিক রোগ-যন্ত্রণার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এরূপ রোগীর অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় এত বেশী ভারাক্রান্ত যে, ক্ষুধার কষ্ট পর্যন্ত অনুভব করতে পারে না। তাকে খেতে বলা হলে সে বলে, আমার মোটেই ক্ষুধা নেই। এ থেকে বুঝা যায় না যে, সে ক্ষুধার অবস্থায় খাদ্য গ্রহণকে উপকারী বলে স্বীকার করে না।

তৃতীয় কারণ, রোগ অতিশয় পুরাতন এবং ওষুধ যা বলা হয়, তা সংস্কারপ্রসূত। যেমন, দাগ দেয়া, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় রোগী চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়। রবী ইবনে খায়সামের উক্তিতে এ কারণের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, তাদের মধ্যে চিকিৎসক অনেক ছিল; কিন্তু কোন রোগীই বাঁচেনি, চিকিৎসকও রক্ষা পায়নি। উদ্দেশ্য, ওষুধের উপর ভরসা

নিশ্চিত নয়। যেসব বুযুর্গ চিকিৎসা বর্জন করেছেন, তাদের অধিকাংশের সনদ ছিল, ওষুধ তাদের মতে সংস্কারপ্রসূত ও অনির্ভরযোগ্য। চিকিৎসা বিশারদগণও সুস্পষ্টভাবে জানে, বাস্তবে কোন কোন ওষুধ মোটেই উপকারী নয় এবং কোন কোন ওষুধ উপকারী। কিন্তু যে চিকিৎসক নয়, সে প্রায়শই সব ওষুধকে একই দৃষ্টিতে দেখে। ফলে সে চিকিৎসাকে মন্ত্র পাঠের মতই সংস্কারপ্রসূত মনে করে।

চতুর্থ কারণ, চিকিৎসা না করে রোগী তার রোগ ধরে রাখতে চায়, যাতে উত্তম সবরের মাধ্যমে সে রোগের সওয়াব অর্জন করতে পারে অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিপদাপদে নফস সবর করার শক্তি রাখে কি না, তা পরীক্ষা করতে পারে। কারণ, রোগের সওয়াব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, পয়গম্বরগণের উপর অন্যান্য লোকের তুলনায় বেশী কঠিন বিপদাপদ আসে। এর পর তা স্তর অনুযায়ী হ্রাস পেতে থাকে। বান্দার উপর মুসীবত তার ঈমানের মাপ অনুযায়ী আসে। যে শক্ত ও পাকাপোক্ত ঈমানের অধিকারী, তার মুসীবতও কঠোরতর হয়। যার ঈমান যত দুর্বল, তার মুসীবতও সেই পরিমাণে হাল্‌কা হয়। এক হাদীসে আছে— আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদ দ্বারা বান্দার পরীক্ষা নেন, যেমন তোমরা আগুনে পুড়িয়ে স্বর্ণের পরীক্ষা নাও। ফলে কোন কোন বান্দা খাঁটি ও উজ্জ্বল সোনা হয়ে বের হয়, কেউ কেউ তার চেয়ে কম এবং কেউ কেউ কাল পোড়া হয়ে বের হয়।

আহলে বায়ত থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে বন্ধু করে নেন, তখন তাকে বিপদে জড়িত করেন। যদি সে বিপদে সবর করে, তবে তাকে 'মুজতবা' (মনোনীত) করে নেন, আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে 'মুস্তফা' (পবিত্র) করে নেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনকে যখনই দেখবে, আন্তরিকভাবে সুস্থ এবং দৈহিকভাবে রোগী পাবে। আর মোনাফেককে দেহের দিক দিয়ে অধিকতর সুস্থ এবং অন্তরের দিক দিয়ে অধিকতর রোগী পাবে।

লোকেরা যখন রোগ-শোক ও বালামুসীবতের এতদূর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য শুনল, তখন রোগ ও অসুখ-বিসুখের প্রতি তাদের মনে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে কিছুসংখ্যক বুযুর্গের এটা রীতি হয়ে গেল যে, তারা নিজের রোগের কথা গোপন রাখতেন। চিকিৎসকদের কাছে প্রকাশ

করতেন না। তারা রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতেন, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতেন। তারা আরও বিশ্বাস করে নিতেন যে, যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সবর সহকারে বসেই নামায পড়া যায়, তবে এটা সুস্থাবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমার বান্দার সে সৎকর্মই লেখে নাও, যা সে সুস্থাবস্থায় করত। কারণ, সে এখন আমার বন্দী। যদি আমি তাকে রেহাই দেই, তবে মাংসের বদলে উৎকৃষ্ট মাংস এবং রক্তের বদলে উত্তম রক্ত দান করব। আর যদি মৃত্যু দেই, তবে নিজের রহমতের দিকে মৃত্যু দেব।

হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ সুস্থ সবল অবস্থায় এবাদত করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করার চেয়ে চিকিৎসা না করা এবং এবাদতে দুর্বল ও অক্ষম থাকা উত্তম। তিনি এক বড় রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু কখনও এর চিকিৎসার ইচ্ছা করেননি।

পঞ্চম কারণ, রোগী পূর্বে কিছু গোনাহ করেছে। এখন গোনাহের ভয়ে অসুস্থ থাকাকে গোনাহের কাফ্ফারা মনে করে। তাই চিকিৎসা করতে সম্মত হয় না। কারণ, চিকিৎসা করলে রোগ দ্রুত সেরে যাবে এবং গোনাহের যথেষ্ট কাফ্ফারা হবে না। হাদীস শরীফে আছে— মানুষের শরীরে পুরাতন জ্বর সর্বক্ষণ এ জন্যে থাকে, যাতে সে পরিণামে শিলার মত সাফ ও পরিষ্কার হয়ে যায়— কোন গোনাহ অবশিষ্ট না থাকে। এক হাদীসে আছে— এক দিনের জ্বর সারা বছরের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়।

রসূলে করীম (সাঃ) যখন জ্বরকে গোনাহের কাফ্ফারা বললেন, তখন সাহাবী যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে সারা বছর জ্বরাক্রান্ত থাকার জন্যে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়া কবুল হল এবং তিনি আমৃত্যু জ্বর থেকে মুক্ত হলেন না। কয়েকজন আনসারীও এরূপ দোয়া করেছিলেন। ফলে তাঁদেরও কোন সময় জ্বর ছাড়ত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বললেন ঃ

من اذهب الله كريمتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যার চক্ষুদ্বয় নিয়ে যান, তার জন্যে তিনি জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াবে রাযী হন না।

এ কথা শুনে কিছুসংখ্যক আনসারী অন্ধ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে খুব বিপদগ্রস্ত দেখে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী, এর প্রতি রহম করুন। এরশাদ হল ঃ আর কিরূপে রহম করব? এর মাধ্যমেই তো রহম করব। অর্থাৎ, বিপদ দিয়ে তার গোনাহ্ দূর করব এবং মর্তবা বৃদ্ধি করব।

ষষ্ঠ কারণ, রোগী অধিক স্বাস্থ্যবান থাকতে ভয় করে, যাতে সে অহংকার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসা বর্জন করে। কেননা, স্বাস্থ্যবান হলেই মানুষ সবল হয়। আর সবল হলে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার এসে যায়। আত্মম্ভরিতার ফল স্বরূপ মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন— দরিদ্রতা আমার জেলখানা। এতে তাকেই বন্দী করি, যাকে আমি ভালবাসি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অবাধ্যতা ও গোনাহের আশংকা করে, তার কখনও চিকিৎসা না করানো উচিত। কেননা, গোনাহ্ না করার মধ্যেই তার কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। জনৈক সাধক তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমার কাছে কেমন ছিলে? সে উত্তর করল, কুশলেই ছিলাম। সাধক বললেন ঃ যদি তুমি কোন গোনাহ্ না করে থাক, তবে বাস্তবিকই কুশলে ছিলে। আর যদি কোন গোনাহ করে থাক, তবে গোনাহ্কারী ছাই কুশলে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) ইরাকে ঈদের দিনের সাজসজ্জা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কি করছে? লোকেরা আরয করল; এটা তাদের ঈদ। তিনি বললেন ঃ যেদিন আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করব না, সেদিনই হবে আমাদের ঈদ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وعصيتم من بعد ماأراكم ماتحبون -

অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ, সুস্থতা দেখানোর পর তোমরা নাফরমানী করলে।

আরও বলা হয়েছে ঃ

ان الانسان ليطغى ان راه استغنى -

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ নিজেকে অভাবমুক্ত দেখার কারণে সীমালঙ্ঘন করে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিল। এর কারণ, সে সুদীর্ঘ চারশ' বছর পর্যন্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি। কখনও মাথা ব্যথা হয়নি, দেহে তাপ দেখা দেয়নি এবং কোন শিরা দ্রুত চলেনি।

যদি একদিনও তার মাথায় ব্যথা দেখা দিত, তবে খোদায়ী দাবী করা দূরের কথা, অনর্থক কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকত। তাই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اكثروا ذكر هادم اللذات

অর্থাৎ, তোমরা আনন্দ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বারবার স্মরণ কর।

বলা হয়, জ্বর হল মৃত্যুদূত। বাস্তবিকই মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ, তারা কি দেখে না, তাদেরকে প্রতিবছর একবার অথবা দু'বার পরীক্ষা করা হয়? তারপরেও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না! অর্থাৎ, তাদেরকে অসুখে-বিসুখে জড়িত করে পরীক্ষা করা হয়।

এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ যখন দেখতেন, কোন বছর তাদের উপর দিয়ে জান অথবা মালের বিপদ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন তারা খুব ঘাবড়ে যেতেন। জনৈকা বুযুর্গ বলেন ঃ ঈমানদারের উপর প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন না কোন বিপদ এসে যায়। বর্ণিত আছে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) জনৈক মহিলাকে বিয়ে করার পর তাঁর কোন দিন অসুখ-বিসুখ হল না। এ কারণে তিনি মহিলাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ অমুক রোগ এমন এবং মাথা ব্যথা এমন। এক ব্যক্তি বললেন ঃ মাথা ব্যথা কি, তা আমি জানিই না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। তিনি আরও বললেন ঃ কেউ যদি দোযখী

ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখেন। হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল— কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথেও কেউ থাকবে কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার হাশর শহীদদের সাথে হবে। বলা বাহুল্য, অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর কথা খুব স্মরণ হয়।

সারকথা, রোগব্যাধির এতসব উপকারিতা দৃষ্টে কোন কোন বুযুর্গ রোগ দূর করার কৌশল ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তাঁরা চিকিৎসা ক্ষতিকর জেনে বর্জন করেননি। যে চিকিৎসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত, তা ক্ষতিকর কেমন করে হতে পারে?

কিছু সংখ্যক বুযুর্গের মতে তাওয়াক্কুলের জন্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রয়োগ না করা সর্বাবস্থায় উত্তম। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের জন্যে সুন্নত করার লক্ষ্যে ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন। নতুবা এটা দুর্বলদের কাজ। যারা শক্তিশালী, তারা ওষুধ বর্জন করে তাওয়াক্কুল করবে। আমরা বলি, ওষুধ প্রয়োগ না করা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত হলে ক্ষুধায় খাদ্য না খাওয়া এবং তৃষ্ণায় পানি পান না করাও তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত তবে। কেননা, ওষুধ যেমন রোগ নিরসনে সহায়ক, তেমনি পানিও তৃষ্ণা নিবারক। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা পানির মত ওষুধকেও এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। অথচ কেউ বলে না যে, তৃষ্ণায় পানি বর্জন করা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত। ওষুধ প্রয়োগ না করা যে তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়, এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলীফার সঙ্গে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন। দামেশকের অদূরে জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা খবর পান, সিরিয়ায় এখন মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। প্রত্যহ বহু লোক এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ব্যাপক আকারে প্রাণহানি ঘটছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এক দল বললেন ঃ আমরা মহামারীর ভেতরে প্রবেশ করব না এবং জ্বলন্ত আগুনে লাফিয়ে পড়ব না। অন্য দল অভিমত প্রকাশ করলেন— আমরা সেখানে যাব। কেননা, কোরআন পাকে মৃত্যুর ভয়ে স্থান ত্যাগ করার নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ, "আপনি কি সে লোকদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল? অথচ তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার।"

অতঃপর উভয় দল খলীফার খেদমতে হাযির হয়ে তার অভিমত জানতে চাইল। খলীফা বললেন ঃ এখান থেকে প্রস্থান করা উচিত এবং মহামারীর ভেতরে প্রবেশ না করা উত্তম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের অভিমত খলীফার বিপরীতে ছিল, তাঁরা আরয করলেন ঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার তাকদীর থেকে পালাব কি? খলীফা বললেন ঃ আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে তাঁরই তাকদীরের দিকে যাব। এতে দোষ কি? এর পর তিনি একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বললেন ঃ মনে কর, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে একটি ছাগলের পাল আছে এবং বিচরণের জন্যে দুটি চারণভূমি আছে। একটি সবুজ ঘাসে পূর্ণ ও অপরটি শুষ্ক। পালের মালিক যদি সবুজ ঘাসবিশিষ্ট চারণভূমিতে ছাগল চরায়, তবু আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে হবে এবং যদি সে শুষ্ক চারণভূমিতে চরায়, তবু আল্লাহ্ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ী হবে। শ্রোতারা সকলেই খলীফার এই বক্তব্য যথার্থ বলে মেনে নিল। এরপর তিনি পরামর্শের জন্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ডেকে পাঠালেন। পরের দিন হযরত আবদুর রহমান এসে বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে যা শুনেছি, তাই আমার অভিমত। খলীফা বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ্, আপনি কি শুনেছেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। হযরত আবদুর রহমান বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— "যখন তোমরা কোন ভূখণ্ডে মহামারীর কথা শুন, তখন সেখানে প্রবেশের দুঃসাহস দেখিও না। আর যদি যেখানে তোমরা আছ, সেখানেই মহামারী দেখা দেয়, তবে ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করো না।" হযরত ওমর (রাঃ) এই হাদীসে নিজের মতের সমর্থন দেখতে পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জাবিয়া থেকে সরিয়ে আনলেন।

এখন দেখা উচিত, এ ধরনের বিষয় যদি তাওয়াক্কুলের শর্ত হয়, তবে সাহাবায়ে কেরাম কেমন করে তাওয়াক্কুল বর্জন করতে একমত হলেন? অথচ তাওয়াক্কুল দ্বীনের উচ্চতর মকামসমূহের অন্যতম।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে যে শহরে মহামারী থাকে, সেখান থেকে চলে যেতে কেন নিষেধ করা হল? অথচ চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী মহামারীর কারণ হচ্ছে বায়ু দূষিত হওয়া। দূষিত বায়ু থেকে বেঁচে থাকা একটি উত্তম চিকিৎসা। হাদীসে এর অনুমতি দেয়া হল না কেন? এর জওয়াব,

নিঃসন্দেহে দূষিত পরিবেশ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ হতে পারে না। এতে কারও দ্বিমত নেই। দূষিত বায়ু কেবল বাহ্যিক দেহে লাগলেই ক্ষতি হয়ে যায় না; বরং সর্বক্ষণ এতে শ্বাস গ্রহণ করলে ক্ষতির আশংকা থাকে। যদি বায়ুতে রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে এবং তাতে বেশী মাত্রায় শ্বাস গ্রহণ করা হয়, তবে শ্বাসের মাধ্যমে জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে পৌঁছে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্ত্রসমূহকে প্রভাবিত করে। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মহামারী এলাকায় বসবাস করার পর সেখান থেকে চলে যায়, তবে দূষিত বায়ুর প্রভাব থেকে মুক্ত না থাকাই তার জন্যে প্রবল। কিন্তু মুক্ত থাকারও সম্ভাবনা আছে। যেমন, প্রভাব দুর্বল হলে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতএব, মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়া হল তা থেকে মুক্ত থাকার একটি সংস্কারপ্রসূত উপায়। যেমন, মন্ত্রপাঠ একটি সংস্কার প্রসূত উপায়। অতঃপর মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণ যদি কেবল বায়ু দূষিত হওয়াই হত, তবে এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হত না এবং এর নিষেধাজ্ঞাও হত না। কিন্তু আসলে অন্য কারণে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে। তা হলো, যদি সুস্থ লোকদেরকে দুর্গত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তবে আক্রান্ত রোগীদের ছাড়া সেখানে সুস্থ লোক অবশিষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় কে রোগীদের খাওয়াবে, পানি পান করাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন করবে? এহেন পরিস্থিতিতে সুস্থদের সেখান থেকে চলে যাওয়া যেন রোগীদেরকে জীবন্ত সমাহিত করার শামিল, যাদের বেঁচে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্থরা যদি সেখানে অবস্থান করে, তবে তাদের মরে যাওয়া যেমন নিশ্চিত নয়, তেমনি সেখান থেকে চলে গেলেও বেঁচে যাওয়া নিশ্চিত নয়। তবে তাদের চলে যাওয়ার ক্ষতি রোগীদের বেলায় অবশ্য নিশ্চিত। মুসলমানরা সকলেই পরস্পরে দালানের ইটের মত— একটির শক্তি অপরটির দ্বারা হয় অথবা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত— এক অঙ্গে ব্যথা হলে অন্য অঙ্গও ব্যথিত হয়। সুতরাং চলে যেতে নিষেধ করার কারণ আমাদের মতে এটাই।

যে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত দুর্গত এলাকায় প্রবেশ করেনি, তার জন্যে ব্যাপারটি উল্টো। অর্থাৎ, তার অভ্যন্তরে দূষিত বায়ু এখন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেনি। তার দুর্গত এলাকায় প্রবেশ না করলেও সেখানকার রোগীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে না। অবশ্য যদি ধরে নেয়া হয় যে, দুর্গত এলাকায় আক্রান্ত রোগীদের ছাড়া কেউ নেই এবং সেখানে সেবা-যত্ন ও শুশ্রূষার প্রয়োজন রয়েছে, তবে কিছু লোকের সেখানে যাওয়া শরীয়তে পছন্দনীয় বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কেননা, তাদের

কোন ক্ষতি হওয়া একটি সংস্কারপ্রসূত বিষয় এবং তাদের যাওয়ার কারণে রোগাক্রান্ত মুসলমানদের ক্ষতি নিরসন হওয়া নিশ্চিত ব্যাপার। এ কারণেই হাদীসে মহামারী থেকে পলায়নকারীদেরকে জেহাদের সারি থেকে পলায়নকারীদের সমতুল্য বলা হয়েছে। কেননা, এ পলায়নের মধ্যে অন্য মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। অনেক আবেদ ও সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি এসব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

উপরের আদ্যোপান্ত বক্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হল যে, ওষুধ প্রয়োগ করা কোন কোন অবস্থায় উত্তম এবং কোন কোন অবস্থায় প্রয়োগ না করা উত্তম। আরও জানা গেল, ওষুধ প্রয়োগ করা ও না করা কোনটিই তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়। শর্ত হলো কেবল সংস্কারপ্রসূত বিষয়াদি। যেমন, ঝাড়, ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ ইত্যাদি বর্জন করা। এগুলো তাওয়াক্কুলকারীদের জন্যে শোভা পায় না।

জানা উচিত, অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র্য ও বিপদাপদ গোপন রাখা পুণ্যের অন্যতম ভাণ্ডার এবং উচ্চ মর্তবার লক্ষণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালায় সম্মত এবং তাঁর দেয়া বিপদে সবর করা বান্দা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বিষয়। এগুলো গোপন করা বিপদাপদ থেকে বেশীর ভাগ আত্মরক্ষার উপায়। এতদসত্ত্বেও নিয়ত সঠিক থাকলে এগুলো প্রকাশ করায়ও কোন দোষ নেই। যে সকল উদ্দেশ্যের কারণে রোগ-ব্যাধি প্রকাশ করা যায়, সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা। অর্থাৎ, চিকিৎসকের কাছে অভিযোগের ভঙ্গিতে নয়; বরং বাস্তব অবস্থা বর্ণনার ভঙ্গিতে হুবহু প্রকাশ করতে হবে। হযরত বিশর ইবনে আবদুর রহমান চিকিৎসকের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করতেন।

দ্বিতীয়, রোগী অনুসরণীয় ব্যক্তি হলে সবর ও শোকর শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ছাড়া অন্যদের কাছে নিজের রোগের কথা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, এমনভাবে বর্ণনা করবে, যাতে বুঝা যায়, তার মতে রোগ একটি নেয়ামত। নেয়ামত সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা করা হয়, সেভাবে আলোচনা করবে, যাতে মানুষ সে জন্যে শোকর করে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যখন রোগী হামদ ও শোকরের পর নিজের ব্যথা বর্ণনা করে, তখন সে বর্ণনা অভিযোগের মধ্যে গণ্য হয় না।

তৃতীয়, নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দীনতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে রোগ বর্ণনা করা। এটা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ভাল মনে হয়, যার বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য সর্বজনবিদিত। উদাহরণতঃ হযরত আলী

(রাঃ)-কে অসুস্থ অবস্থায় লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কেমন? তিনি বললেন ঃ খারাপ। প্রশ্নকারীরা এ উত্তরকে ভাল মনে করল না। এতে অভিযোগের গন্ধ পেল। তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করব? এভাবে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের অক্ষমতা ও দীনতা প্রকাশ করাই উত্তম মনে করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। অসুস্থ হয়ে তিনি দোয়া করতেন, ইলাহী! আমাকে মুসীবতে সবর দান করুন। এ দোয়া শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মুসীবতের প্রার্থনা তো তুমি নিজেই করেছ। আল্লাহ তা'আলার কাছে সুস্থতার দোয়া কর।

কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রোগের কথা প্রকাশ করে দেয়, সে সবর করে না। কোরআন মজীদে উল্লিখিত "সবরে জামীলে'র অর্থ এমন সবর, যাতে অভিযোগ নেই। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি কিসে বিনষ্ট করল? তিনি জওয়াব দিলেন— কালচক্র এবং দুঃখের আধিক্য। তৎক্ষণাৎ ওহী আগমন করল ঃ তুমি আমার বান্দাদের সামনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তৈরী হয়ে গেলে? হযরত ইয়াকুব আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমি তওবা করলাম। আর কখনও এমন হবে না।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ রোগীর 'আহ' বলাকে খারাপ মনে করতেন। কেননা, এটা অভিযোগের পরিচায়ক। বর্ণিত আছে, হযরত আইউব (আঃ) যন্ত্রণায় "আহ" বলেছিলেন এবং তাঁর দুঃখ-কষ্টে এটাই ছিল শয়তানের ভূমিকা। হাদীসে আছে, বান্দা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উভয় ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন— দেখ, সে তার অবস্থা জিজ্ঞেসকারীদের সাথে কি বলে। যদি সে তাদের সাথে আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় তার জন্যে কল্যাণের দোয়া করে। আর যদি অভিযোগ করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় বলে— তুমি এমনি থাকবে। জনৈক বুযুর্গ অভিযোগ হয়ে যাওয়া এবং কথা বেশী হওয়ার আশংকায় অবস্থা জিজ্ঞাসাকে খারাপ মনে করতেন। অসুস্থ হলে তিনি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। কেউ তাঁর কাছে যেত না। সুস্থ হওয়ার পর নিজেই মানুষের কাছে যেতেন। এমনি অবস্থা ছিল ফোযায়ল ইবনে আয়ায, ওহাব ইবনে ওয়ার্দ ও বিশর ইবনে হারেসের। হযরত ফোযায়ল বলতেন, আমি চাই যাতে অসুস্থ হই; কিন্তু অবস্থা জিজ্ঞেসকারী কেউ না থাকুক। আমি তাদের কারণেই রোগী হতে অপছন্দ করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহব্বত

আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত হচ্ছে সকল মকামের চূড়ান্ত সীমা এবং সর্বোচ্চ মর্তবা। কারণ. মহব্বতের পর 'শওক' (আগ্রহ), 'উন্‌স' (অনুরাগ), 'রিযা' (সম্মতি) ইত্যাদি যত মকামই আসুক না কেন, সবই মহব্বতের অনুগামী ও ফল। মহব্বতের পূর্বে তওবা, সবর, যুহ্‌দ ও অন্যান্য যত মকাম রয়েছে, সবই মহব্বতের ভূমিকা। অন্যান্য মকামের অস্তিত্ব বিরল হলেও সব অন্তরে সেগুলোর সম্ভাবনা থাকে এবং সেগুলোর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস থেকে কোন অন্তর শূন্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে বিশ্বাস স্থাপন করাই কঠিন। এমনকি, কোন কোন আলেম এর সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন— অব্যাহতভাবে তাঁর আনুগত্য করে যাওয়াই খোদায়ী মহব্বত। তাঁর সাথে সত্যিকার মহব্বত অসম্ভব। কেননা, মহব্বত সমজাতি ও সমশ্রেণীর সাথে হয়ে থাকে। তাঁরা মহব্বত অস্বীকার করার পর মহব্বতের অপরিহার্য বিষয়াবলী যেমন উন্‌স, শওক, রিযা ইত্যাদিও অস্বীকার করে বসেছেন। তাই আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহব্বতের আলোচনা

আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত ঃ মুসলিম উম্মাহর সবাই এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সাথে বান্দার মহব্বত থাকা ফরয। অতএব, আমাদের প্রশ্ন, যদি মহব্বতের অস্তিত্বই না থাকে, তবে তা ফরয কেমন করে হবে? মহব্বতের ব্যাখ্যা যারা আনুগত্যের দ্বারা করেন, তা-ও কিরূপে সম্ভব? কেননা, আনুগত্য তো মহব্বতের অনুগামী ও ফল। প্রথমে মহব্বত অস্তিত্ব লাভ করবে, এরপর প্রেমাস্পদের আনুগত্য হবে।

মহব্বতের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার এই এরশাদ—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

অর্থাৎ,আল্লাহ্ তাদেরকে মহববত করেন এবং তারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে গভীরতর মহব্বত করে।

এ দুটি আয়াত থেকে জানা যায়, মহব্বতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাতে পার্থক্য হয়ে থাকে। রসূলে আকরাম (সাঃ) অনেক হাদীসে আল্লাহর মহব্বতকে ঈমানের শর্ত বলেছেন। ঈমান কি? আবু রুযায়ন ওকায়লীর এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহ ও রসূল অধিকতর প্রিয় হওয়া। এক হাদীসে আছে—

لايؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما –

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত না তার কাছে আল্লাহ ও রসূল দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে।

আরেক হাদীসে আছে—

لايؤمن العبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين –

অর্থাৎ, বান্দা ঈমানদার হবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পরিজন, ধন-সম্পদ ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। এক রেওয়ায়েতে ومن نفسه

অর্থাৎ, "তার নিজের চেয়ে অধিক" বলা হয়েছে।

তাই হওয়া দরকার। কেননা, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, পুত্র-পৌত্র, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, সঞ্চিত ধন-সম্পদ, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পছন্দনীয় বাসভবন তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও রসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জেহাদের চেয়ে, তবে তোমরা আল্লাহর (শাস্তির) আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বলা বাহুল্য, শাসনের সুরেই একথা বলা হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) ও এ মহব্বতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

احبوا الله لما يغدوكم به من نعمة واحبوني لحب الله اياى

অর্থাৎ, আল্লাহকে মহব্বত কর এজন্যে যে, তিনি প্রতি সকালে তোমাদেরকে নিজের নেয়ামতে ভূষিত করেন, আর আমাকে মহব্বত কর এ কারণে যে, আল্লাহ আমাকে মহব্বত করেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে— এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে দরিদ্রতার জন্যে প্রস্তুত থাক। লোকটি পুনরায় আরয করল ঃ আমি আল্লাহকে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে বিপদাপদের জন্যে তৈরী হয়ে যাও।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) মুসআব ইবনে ওমায়রকে কোমরে একটি ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ এ লোকটিকে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তার

অন্তরকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আমি তাকে তার পিতা-মাতার কাছে দেখেছিলাম। তারা তাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও সুপেয় পানি দিত। এখন আল্লাহ ও রসূলের মহব্বত তাকে এই স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যেমন দেখতে পাচ্ছ। বর্ণিত আছে, মালাকুল মওত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জান কবয করতে এলে তিনি বললেন ঃ আপনি কি এমন কোন দোস্তকে দেখেছেন, যে তার দোস্তের প্রাণ সংহার করে? জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আল তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন— তুমি কি এমন কোন মহব্বতকারীকে দেখেছ, যে তার হাবীবের সাথে সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে? এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে বললেন ঃ এখন কবয করুন। এ বিষয়টি সে বান্দার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে। সে যখন বুঝে, মৃত্যু সাক্ষাতের সিঁড়ি, তখন তার অন্তর মৃত্যুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ ছাড়া মনোযোগ দেয়ার জন্যে কোন প্রেমাস্পদ তার থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন আপনার মহব্বত ও সে ব্যক্তির মহব্বত, যে আপনাকে মহব্বত করে এবং সে বিষয়ের মহব্বত, যা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করবে। আপনার মহব্বতকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করুন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি এর জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি আরয করল ঃ আমি অনেক নামায ও অনেক রোযার ভাণ্ডার গড়ে তুলিনি ঠিক; কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

المرء مع من احب

অর্থাৎ, মানুষ যাকে মহব্বত করে, তার সঙ্গে থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বললেন ঃ আমি এর আগে মুসলমানদেরকে এতটুকু উৎফুল্ল হতে দেখিনি, যতটুকু এ কথা শুনে তারা উৎফুল্ল হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি মহব্বতের স্বাদ পায়, সে স্বাদ তাকে দুনিয়াদারী থেকে বিরত রাখে এবং সমস্ত মানুষ থেকে তাকে দূরে রাখে।

হযরত ঈসা (আঃ) তিনটি লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাদের দেহ ছিল ক্ষীণ এবং রং বিবর্ণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? তারা আরয করল ঃ দোযখের আগুনের ভয়ে। তিনি বললেন ঃ যারা ভয় রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই নিরাপদে রাখবেন। অতঃপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে আরও তিন ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। তাদের দেহ আরও শীর্ণ ও রং আরও বিবর্ণ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এই দুর্দশা কেন? তারা আরয করল ঃ জান্নাতের আগ্রহে আমাদের এ অবস্থা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা যে জান্নাত আশা কর, আল্লাহ্ অবশ্যই তা দান করবেন। অতঃপর তিনি আরও এগিয়ে তিন ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাদের অবস্থা পূর্বোক্ত দু'দলের চেয়েও শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাদের মুখমন্ডলে যেন স্বর্গীয় নূরের আভা ঝলমল করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কারণে তোমরা এমন হয়ে গেছ? তারা আরয করল ঃ আমরা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে মহব্বত করি। হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করলেন ঃ নৈকট্যশীল তোমরাই।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলাম। সে বরফের উপর শুয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি বরফের শীতলতা অনুভব কর না? সে বলল ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে সদা গরম থাকে, সে শৈত্য অনুভব করে না।

হযরত সিররী সকতী বলেন ঃ যাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত প্রবল নয়, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পয়গম্বরগণের নামে ডাকা হবে। উদাহরণতঃ বলা হবে— হে উম্মতে মূসা, হে উম্মতে ঈসা এবং উম্মতে মুহাম্মদ (সাঃ)। কিন্তু মহব্বতওয়ালাদেরকে এভাবে ডাকা হবে— হে আল্লাহর ওলী, আল্লাহর দিকে চল। এতে তাদের মন খুশীতে বাগবাগ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি যখন তার পরওয়ারদেগারকে চেনে, তখন তাকে মহব্বত করে। যখন মহব্বত করে,

তখন তাঁর দিকে মনোযোগী হয়। যখন সে এই মনোযোগের স্বাদ পায়, তখন দুনিয়ার দিকে খাহেশের দৃষ্টিতে তাকায় না এবং আখেরাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। দেহের দিক দিয়ে সে দুনিয়াতে থাকলেও তার আত্মা থাকে আখেরাতে।

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত সম্পর্কে হাদীস ও মনীষীগণের বাণী এত বেশী যে, সেগুলো গণনা করে শেষ করা যায় না। এটা একটা সুস্পষ্ট বিষয়। অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা রয়েছে মহব্বতের অর্থ ও স্বরূপ নিরূপণের ক্ষেত্রে। তাই আমরা সেদিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।

মহব্বতের স্বরূপ ও কারণাদি ঃ চেনা ও জানা ছাড়া মহব্বত হতে পারে না। মানুষ তাকেই মহব্বত করে, যাকে সে চেনে। জড় পদার্থ মহব্বত করে না। কারণ, তার মধ্যে চেনার শক্তি নেই। তাই মহব্বত একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যেসব বস্তু চেনে ও জানে, সেগুলো তিন প্রকার। এক, মানুষেরই স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও আনন্দদায়ক। দুই, মানব-স্বভাবের পরিপন্থী ও কষ্টদায়ক। তিন, আনন্দ ও কষ্ট কোন কিছুই দেয় না। এ তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যে বস্তু চিনলে ও জানলে মানুষ আনন্দ ও সুখ পায়, সে বস্তুই মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে। আর যে বস্তু চিনলেও জানলে কষ্ট হয়, সে বস্তু অপ্রিয় হয়ে থাকে। যে বস্তু চেনা-জানার পর কষ্টও হয় না, সুখও হয় না, সেটাকে প্রিয়-অপ্রিয় কোন কিছুই বলা যায় না।

কোন বস্তু প্রিয় হওয়ার অর্থ, মানব-স্বভাবে তার প্রতি ঝোঁক থাকা, আর অপ্রিয় হওয়ার অর্থ ঝোঁকের পরিবর্তে ঘৃণা থাকা। সুতরাং যে বস্তু থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, সে বস্তুর প্রতি স্বভাবের ঝোঁক থাকার নাম মহব্বত। এই ঝোঁক যদি পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয় এশ্‌ক। এ হচ্ছে মহব্বতের স্বরূপ, যা জানা অত্যন্ত জরুরী।

মহব্বত চেনা ও জানার অনুগামী। চেনা ও জানার হাতিয়ার হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বিধায় মহব্বতও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবে। কেননা, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা একটি বিশেষ বস্তুকে চেনা যায় এবং বিশেষ বস্তু থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ চোখের আনন্দ দেখার বস্তুসমূহে। কানের আনন্দ হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত ও মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বরে। নাকের আনন্দ উৎকৃষ্ট সুগন্ধিতে। আস্বাদন শক্তির আনন্দ সুস্বাদু খাদ্যে। স্পর্শ শক্তির আনন্দ মৃদুতা ও কোমলতায়। এসব বস্তু ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয় বিধায় এগুলো প্রিয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

احب الى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلوة -

অর্থাৎ, তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার কাছে তিনটি বস্তু প্রিয়— সুগন্ধি, নারী এবং আমার চোখের শীতলতা নামাযে।

এখানে তিনি সুগন্ধিকে প্রিয় বলেছেন। বলা বাহুল্য, এতে চোখ ও কানের কোন অংশ নেই; বরং এতে কেবল ঘ্রাণশক্তির অংশ রয়েছে। নারীকে প্রিয় বলা হয়েছে। এতে ঘ্রাণ শক্তির অংশ নেই; বরং দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শ শক্তির অংশ রয়েছে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আনন্দে মানুষের সাথে চতুষ্পদ জন্তুও শরীক। অতএব, মহব্বতকে শুধু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমিত করলে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চেনেন না ও জানেন না। এমতাবস্থায় মানুষের বৈশিষ্ট্য যে মহব্বত, তা নিষ্ফল সাব্যস্ত হবে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়— যা দ্বারা মানুষ জন্তু-জানোয়ার থেকে পৃথক এবং যাকে বুদ্ধি, নূর, অন্তর ইত্যাদি বলা যায়, তা মিথ্যা হয়ে যাবে। এটা অবান্তর। কেননা, অন্তর্দৃষ্টি চর্মচক্ষুর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। অন্তর চোখের তুলনায় অধিক চেনে ও জানে। অর্থসম্ভার— যা বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, তার সৌন্দর্য চোখে দেখা আকৃতিসমূহের তুলনায় অনেক বেশী। অতএব, অন্তর যে সকল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয় অনুভব করে এবং অনুভব করে আনন্দ পায়, সে আনন্দও অধিক পূর্ণাঙ্গ হবে। কেননা, সুস্থ স্বভাবের ঝোঁক সেদিকে অধিক জোরদার হবে। এই ঝোঁকের নামই হল মহব্বত। এমতাবস্থায় যে খোদায়ী মহব্বতকে অস্বীকার করবে, সে চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে অবস্থান করবে অথবা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির কাছে সর্বপ্রথম প্রিয় বস্তু হচ্ছে তার নিজের সত্তা। নিজ সত্তাকে মহব্বত করার উদ্দেশ্য হল, তার স্বভাবের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ও তার স্থায়িত্বের বাসনা এবং নাস্তি ও ধ্বংসের প্রতি অনীহা। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের মজ্জার অন্তর্গত। সত্তার মহব্বতের

কারণেই মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে মহব্বত করে। এগুলোর প্রতি মহব্বতের কারণ স্বয়ং এগুলোর সত্তা নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা নিশ্চিত হয় বলে। এ কারণেই মানুষ তার পুত্রকে মহব্বত করে, যদিও পুত্রের দ্বারা তার কোন উপকার হয় না এবং নানাবিধ কষ্ট ও পীড়া সইতে হয়। কেননা, তার মৃত্যুর পর পুত্রই হবে তার স্থলাভিষিক্ত। সে যেন বংশের স্থায়িত্বের মধ্যেও নিজের এক প্রকার স্থায়িত্ব দেখতে পায়। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত নিজ সত্তার মহব্বতের পূর্ণতার কারণেই হয়ে থাকে। কারণ, আত্মীয়-স্বজনের কারণে সে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে এবং তাদের কৃতিত্বকে নিজের গৌরব মনে করে। এই বক্তব্য থেকে জানা গেল, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সত্তা, সত্তার পূর্ণতা ও তার স্থায়িত্ব মহব্বতের বিষয়। এ হচ্ছে মহব্বতের প্রথম কারণ।

মহব্বতের দ্বিতীয় কারণ অনুগ্রহ। কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। অনুগ্রহকারীকে মহব্বত করা মানুষের মজ্জাগত। হাদীসে বর্ণিত আছে—

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا فَيُحِبُّهٗ قَلْبِيْ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কোন পাপাচারীর অনুগ্রহ আমার উপর রেখো না। রাখলে আমার অন্তর তাকে মহব্বত করবে।

এতে ইঙ্গিত হয়, অনুগ্রহকারীকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক। এটি এড়ানো যায় না। এ কারণেই মানুষ কখনও এমন ব্যক্তিকে মহব্বত করে, যার সাথে তার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই— নিছক অপরিচিত।

মহব্বতের তৃতীয় কারণ কোন বস্তুকে সেই বস্তুর সত্তার কারণে মহব্বত করা, তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং সে বস্তুর সত্তাই সাক্ষাৎ উপকার। এ মহব্বতকে হাকিকী তথা সত্যিকার মহব্বত বলা হয়। এরূপ মহব্বতের স্থায়িত্ব আশা করা যায়। উদাহরণতঃ রূপ-সৌন্দর্যের মহব্বত কেবল রূপ ও সৌন্দর্যের কারণেই হয়। এতে সৌন্দর্য চেনা ও অনুভব করাই সাক্ষাৎ আনন্দ। এখানে ধারণা করা উচিত নয় যে, সুশ্রী অবয়বের মহব্বত কাম-বাসনা চরিতার্থ করা ও বাসনা করা ছাড়া সম্ভব নয়। উচিত এজন্যে নয় যে, কাম-বাসনা চরিতার্থ করা একটি

ভিন্ন আনন্দ এবং স্বয়ং রূপও ভিন্ন আনন্দদায়ক। যেমন সবুজের সমারোহ ও বহমান পানিকে মহব্বত করা হয়, কিন্তু তা এ জন্যে নয় যে, এগুলোতে পানাহারের উপকার আছে। দেখা ছাড়া এগুলোতে অন্য কোন আনন্দ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবুজ শ্যামল বনানী ও বহমান পানিকে খুব মহব্বত করতেন। সকল সুস্থ মন বাগবাগিচা, ফুল, সুশ্রী জন্তু-জানোয়ার, মনোহারী ফুল ও ফলের বৃক্ষ এবং সুন্দর চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা আনন্দের কারণ মনে করে। এমনকি, মানুষ এগুলোর দ্বারা মনের দুঃখ দূর করে। এমন কোন রূপ-সৌন্দর্য নেই, যা অনুভব করাতে আনন্দ নেই। এখন যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্যশীল, তবে যার দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তার কাছে অবশ্যই তিনি মহব্বতের পাত্র হবেন। হাদীসে বলা হয়েছে—

ان الله جميل يحب الجمال

অর্থাৎ, আল্লাহ সৌন্দর্যশালী। তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

মহব্বতের চতুর্থ কারণ স্বয়ং-রূপ সৌন্দর্য। এখানে রূপ ও সৌন্দর্যের অর্থ বর্ণনা করা জরুরী। ভাবুক ও কল্পনা-বিলাসীদের মতে যার দৈহিক গড়ন সুসমঞ্জস, আকার-আকৃতি সঠিক এবং রং উজ্জ্বল গৌর, সে রূপবান ও সৌন্দর্যশালী। অধিকাংশ মানুষের মতেও যা দৃষ্টিকে তৃপ্তি দেয়, তাই সুন্দর। তাই তাদের ধারণা, যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, যার আকার-আকৃতি নেই, রং ও বর্ণ নেই এবং কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার রূপবান ও সৌন্দর্যশালী হওয়া সম্ভব নয়। যখন সৌন্দর্যশীল হবে না, তখন তাকে অনুভব করে আনন্দ হবে না। এটা তাদের বিরাট ভ্রান্তি। কেননা, দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া, গড়ন সুসমঞ্জস হওয়া এবং রং উজ্জ্বল হওয়ার মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়। উদাহরণতঃ আমরা বলি, এই হস্তলিপি সুন্দর, এই কণ্ঠস্বর সুন্দর। এখানে গড়ন, আকার-আকৃতি ও রং কিছুই নেই। অতএব, বুঝা গেল, মুখাকৃতি ও অবয়বের মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়।

প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার মধ্যে তার উপযুক্ত ও সম্ভাব্য সকল গুণের সমাবেশ ঘটা। যখন কোন বস্তুর মধ্যে সম্ভাব্য সকল গুণের সমাবেশ হয়ে যাবে, তখন সে বস্তু হবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি কতক গুণের সমাবেশ ঘটে, তবে সৌন্দর্যও সে তুলনায়ই হবে। উদাহরণতঃ

আমরা সে ঘোড়াকে সুন্দর বলব, যার মধ্যে সুশ্রী আকার-আকৃতি, রং-ঢং দ্রুতগতি ইত্যাদি সম্ভাব্য গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকে।

জানা দরকার, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়াদির মধ্যেই সীমিত নয়; বরং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়াদির মধ্যেও বিদ্যমান। উদাহরণতঃ আমরা বলি— এই চরিত্র কত সুন্দর। এই বিদ্যা কত ভালো। চরিত্র ও বিদ্যার মধ্যে কোনটিই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় না; বরং অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা এগুলো উপলব্ধি করা হয়। এসব গুণ মানুষের প্রিয় এবং যারা এসব গুণে গুণান্বিত, তারাও প্রিয়। উদাহরণতঃ মানুষের এটা মজ্জাগত স্বভাব যে, তারা পয়গম্বরগণকে এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করে। অথচ তাদের কাউকে চোখে দেখেনি। মাযহাবসমূহের ইমামগণের মহব্বতও তেমনি। বলা বাহুল্য, তাঁদের এই মহব্বত বাহ্যিক আকার-আকৃতির কারণে নয়। বাহ্যিক আকার-আকৃতি তো কবে মাটির সাথে মিশে গেছে; বরং তাঁদের মহব্বতের কারণ হচ্ছে ধর্মীয় গুণাবলী যেমন, তাকওয়া, এলেম, ধর্ম প্রচার, শরীয়ত সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি। এসব গুণের সৌন্দর্য অনুভব করা অন্তর্দৃষ্টির নূর ছাড়া সম্ভব নয়।

মহব্বতের পঞ্চম কারণ আত্মিক মিল, যা মহব্বতকারী ও মাহবুবের মধ্যে থাকে। প্রায়ই দু'ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় মহব্বত হতে দেখা যায়; কোন সৌন্দর্য ও উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং কেবল আত্মিক মিলের কারণে। হাদীস শরীফে আছে—

فما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف -

অর্থাৎ, আত্মাসমূহের যেগুলো পরস্পর পরিচিত হয়েছে, সেগুলো পরস্পর মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, আর যেগুলো পরিচিত হয়নি, সেগুলো পৃথক হয়ে গেছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মহব্বতের পাঁচটি কারণ পাওয়া গেল। (এক) নিজের অস্তিত্বের পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মহব্বত। (দুই) অনুগ্রহের কারণে মহব্বত। (তিন) কোন বস্তুর সত্তার কারণে মহব্বত করা। (চার) স্বয়ং রূপ-সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত করা। (পাঁচ) আত্মিক মিলের কারণে মহব্বত। যদি এ কারণগুলো একই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে নিঃসন্দেহে মহব্বত বহুগুণ বেশী হবে।

মহব্বতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহর সত্তা ঃ মহব্বতের উপরোক্ত পাঁচটি কারণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া অন্য কারও মধ্যে একত্রে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাস্তবে মহব্বতের যোগ্যও তাঁর সত্তা— অন্য কেউ নয়। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করে এবং এ মহব্বতকে আল্লাহর সাথে কোনরূপে সংযুক্ত না করে, তবে এটা হবে মূর্খতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত উত্তম। কেননা, এটা হুবহু আল্লাহর মহব্বত। আলেম ও মুত্তাকী লোকদের মহব্বতও তদ্রূপ। কেননা, প্রেমাস্পদের প্রেমাস্পদও প্রেমাস্পদ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ মাহবুব কিংবা মহব্বতের যোগ্য নয়। এর ব্যাখ্যার জন্যে আমরা উল্লিখিত পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে প্রমাণ করব, এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই একত্রে পাওয়া যায়— অন্য কারও মধ্যে একটি অথবা দু'টি পাওয়া যায় মাত্র।

এখন প্রথম কারণ সম্পর্কে চিন্তা করুন। অর্থাৎ, মানুষ নিজের সত্তাকে মহব্বত করে এবং তার স্থায়িত্ব কামনা করে— ধ্বংস, নাস্তি ও ত্রুটি চায় না। এটা প্রত্যেক জীবিত মানুষের মজ্জাগত বিষয়। কেউ এ থেকে মুক্ত নয়। এটাই আল্লাহর মহব্বত দাবী করে। কেননা, যে ব্যক্তি নিজ সত্তা ও পালনকর্তাকে চেনে, সে নিশ্চিতরূপেই জানে, তার অস্তিত্ব তার নিজের পক্ষ থেকে নয়; বরং তার সত্তার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই তার অস্তিত্বের স্রষ্টা এবং তিনিই পূর্ণতার গুণাবলী সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণতা দান করেছেন। অন্যথায় মানুষ নিজ সত্তার দিক দিয়ে নিছক নাস্তি। আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় অস্তিত্ব দান না করলে এবং অস্তিত্বের পর তাঁর অনুগ্রহ সঙ্গে না থাকলে মানুষ নিঃসন্দেহে নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। অতএব পালনকর্তা, মারেফত অর্জনকারী ব্যক্তি যখন নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, তখন সে সত্তাকেও অবশ্যই মহব্বত করবে, যার দ্বারা তার সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদি সে সত্তাকে মহব্বত না করে, তবে সে নিজের সত্তা ও পালনকর্তা উভয়টি সম্পর্কেই অজ্ঞ। কেননা, মহব্বত মারেফত তথা চেনা ও জানার ফল। মারেফত না হলে মহব্বতও হবে না। মারেফত দুর্বল হলে মহব্বতও দুর্বল হবে এবং মারেফত শক্তিশালী হলে মহব্বতও শক্তিশালী হবে। এ কারণেই হযরত হাসান বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রবকে চিনবে, সে তাঁকে মহব্বত করবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনবে, সে তাঁর প্রতি অনাসক্ত হবে। একথা কল্পনাও করা যায় না যে, মানুষ

নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, অথচ রবকে মহব্বত করবে না। কারণ, রবের মাধ্যমেই তার সত্তার প্রতিষ্ঠা। যে ব্যক্তি প্রখর সূর্যকিরণে অতিষ্ঠ হয়ে ছায়াকে মহব্বত করে, সে বৃক্ষকেও মহব্বত করবে, যার মাধ্যমে ছায়া প্রতিষ্ঠা পায়। ছায়ার সাথে বৃক্ষের যে সম্পর্ক, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুরও আল্লাহর সাথে সে সম্পর্ক।

দ্বিতীয় কারণ, এমন ব্যক্তিকে মহব্বত করা, যে টাকা-পয়সা ও কথার মাধ্যমে সাহায্য করে এবং শত্রুর শত্রুতা দূরীকরণে ও অনিষ্ট প্রতিহরণে সহায়তা করে। বলা-বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি মহব্বতের পাত্র না হয়ে পারে না। এ কারণটি দাবী করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করা যাবে না। কেননা, বাস্তবে আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহকারী। কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দেয় এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করার অধিকার প্রদান করে, তবে তুমি ধারণা করবে, এটা এই ব্যক্তির তরফ থেকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ। অথচ এটা ভ্রান্ত। কেননা, এ অনুগ্রহের পেছনে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এক, স্বয়ং অনুগ্রহকারীর অস্তিত্ব। দুই, তার ধন-সম্পদ থাকা। তিন, ধনের উপর তার অধিকার থাকা। চার, বিশেষভাবে তোমাকে দেয়ার তার ইচ্ছা। এখন প্রশ্ন, এই অনুগ্রহকারীকে কে সৃষ্টি করেছে? তার ধন-সম্পদ কে সৃষ্টি করেছে? তার ক্ষমতা ও ইচ্ছার সৃষ্টিকর্তা কে? তার মনে এ প্রেরণা কে সৃষ্টি করেছে যে, 'তোমাকে দান করার মধ্যে তার কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক উপকার আছে? এক কথায়, সব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তার অন্তরে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, তোমাকে দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। সুতরাং সে তোমাকে দান করতে বাধ্য এবং এর বিপরীত করতেই পারে না। সুতরাং সে সত্তাই প্রকৃত অনুগ্রহকারী যিনি তাকে তোমার জন্যে বাধ্য করেছেন।

হাঁ, ধন-ভাণ্ডার সে ব্যক্তির অধিকারে থাকাটা অবশ্য ইঙ্গিত দেয় যে, সম্ভবত অনুগ্রহকারী সে-ই। এ সম্পর্কে জানা দরকার, এ ব্যক্তি দান করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মাধ্যম হয় মাত্র। অর্থাৎ, তোমাকে দেয়ার জন্যেই আল্লাহ তাকে ধন-ভাণ্ডার দিয়েছেন। সুতরাং সে না দিয়ে কি করবে? সে তো পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ। পয়ঃপ্রণালী নিজের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে বাধ্য।

এ ছাড়া মানুষ যখন অনুগ্রহ করে, তখন নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করে।

অন্য কোন সৃষ্টির প্রতি তার অনুগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ, মানুষ যখন দান করে, তখন তার বিনিময় পূর্বেই আন্দাজ করে নেয়— আখেরাতে সওয়াবের আকারে অথবা দুনিয়াতে দানশীলতার সুখ্যাতি অর্জন করা কিংবা অপরের মন জয় করে তাকে অনুগত ও বশীভূত করা ইত্যাদি। মানুষ কখনও তার ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দেয় না। কারণ, এতে কোন লাভ নেই। এমনিভাবে সে তার অর্থ-কড়ি অন্যের হাতে বিনা লাভেই তুলে দেয় না। তোমাকে যখন সে ধন দেয়, তখন তার উদ্দেশ্য তুমি নও; বরং তুমি তার অর্থ গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্য হাসিলের ওসিলা হও মাত্র। অতএব, সে অনুগ্রহ তোমার প্রতি নয়— নিজের প্রতিই করে। তোমাকে দান করে সে বিনিময়ে যা পাবে, সেটা যদি তার কাছে প্রধান ও অগ্রগণ্য না হত, তবে সে কখনও তোমার হাতে ধন তুলে দিত না। অতএব, মহব্বত ও শোকরের যোগ্য সে নয়।

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিসত্তাকে অনুগ্রহ না পেয়েও মহব্বত করা। এটাও মানুষের স্বভাবে নিহিত। উদাহরণতঃ এক বাদশাহ সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, সে এবাদতকারী, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। অপরদিকে অন্য এক বাদশাহ সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গেল, সে অত্যাচারী, অহংকারী, পাপাচারী এবং প্রজার অধিকার খর্বকারী। তুমি উভয় বাদশাহ থেকে এতদূরে অবস্থান করছ যে, তাদের কোন অনুগ্রহ অথবা যুলুম তোমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তুমি প্রথম বাদশাহকে মহব্বত এবং দ্বিতীয় বাদশাহকে ঘৃণা করবে। তোমার এই মহব্বতও আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দাবী করে, এমনকি চায়, তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত না কর। কেননা, সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপাকারী তিনিই। তিনিই প্রথমে বাদশাহকে সৃষ্টি করে তাকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ, সৌন্দর্যশালীকে মহব্বত করা। এখানে মহব্বতকারী সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন উপকারের ভিত্তিতে মহব্বত করে না। এটাও মানুষের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। সৌন্দর্য দু'প্রকার। এক, বাহ্যিক, যা চর্মচক্ষে দেখা যায়। দুই, অভ্যন্তরীণ, যা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা যায়। সৌন্দর্য মাত্রই অনুভবকারীর কাছে প্রিয়। যদি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করা হয়, তবে মহব্বত আন্তরিক হবে। যেমন, পয়গম্বর, ওলী ও সচ্চরিত্রবানদের মহব্বত। এক্ষেত্রে মহব্বত হয়; কিন্তু এই মাহবুবদের মুখমণ্ডল দৃষ্টির

অন্তরালে থাকে। তবে অভ্যন্তরীণ মুখমণ্ডল অর্থাৎ., তাদের গুণাবলী দৃষ্টির সামনে থাকে। উদাহরণতঃ কেউ রসূল অথবা সিদ্দীকে আকবর অথবা ইমাম শাফেঈকে মহব্বত করলে এর কারণ হবে, তাঁদের গুণাবলী তথা জ্ঞান-গরিমা তাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ তাঁদের গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর সামনে অসম্পূর্ণ। অতএব, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর কারণে মহব্বত আরও বেশী হবে।

পঞ্চম কারণ অর্থাৎ, পারস্পরিক মিল হওয়া। মহব্বতের মধ্যে এরও দখল রয়েছে। কেননা, যে বস্তু যে বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল, সে সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। এ কারণেই ছোটরা ছোটদেরকে এবং বড়রা বড়দেরকে মহব্বত করে। মিল কখনও বাহ্যিক বিষয়ের হয়ে থাকে। যেমন, ছোটদের মিল ছোটদের সাথে। আবার কখনও গোপন বিষয়ে হয়ে থাকে, যা অন্যেরা জানে না। যেমন, ঘটনাক্রমে দু'ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, অথচ তার পূর্বে কখনও একে অপরকে দেখে না এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের কোন আদান-প্রদান থাকে না। এ গোপন মিলও মানুষ এবং আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে মহব্বত দাবী করে। কেননা, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে এমন অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে মিল রয়েছে, যার কিছু অংশ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং কিছু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়; বরং সেগুলো যবনিকার অন্তরালে গোপন থাকতে দেয়াই সমীচীন, যাতে সাধকরা সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর নিজেরাই জেনে নেয়।

যে মিল লিপিবদ্ধ করার যোগ্য, তা হচ্ছে যেসব গুণ অনুসরণ করার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, সেগুলোতে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

تخلقوا باخلاق الله

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও।

অর্থাৎ, জ্ঞান-গরিমা, সহনশীলতা, অনুগ্রহ, কৃপা, অপরের কল্যাণ সাধন, জীবে দয়া, অপরের হিতাকাজ্ক্ষা ইত্যাদি খোদায়ী গুণসমূহ অর্জন কর। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটি গুণ মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে। পক্ষান্তরে যে মিল পুস্তকে লেখা যায় না, তা এমন বিশেষ মিল, যা কেবল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়— ফেরেশতাদের মধ্যে নয়। এদিকেই ইঙ্গিত

করা হয়েছে এই আয়াতে—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

অর্থাৎ, তারা আপনাকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন— রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অংশ। এতে বলা হয়েছে যে, রূহ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমার বাইরে। নিম্নোক্ত আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

অর্থাৎ, অতঃপর আমি যখন তাকে সুগঠিত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দেব।

বলা বাহুল্য, এই গোপন মিলের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদমকে সেজদা করতে। এই মিলের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এ আয়াতে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ, হে আদম, আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করেছি।

বলা বাহুল্য, মানুষ কেবল এ মিলের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

ان الله خلق ادم على صورته

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃজন করেছেন।

এ থেকে কোন কোন স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে দেহ ও আকৃতি গড়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এই মিলের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ আমি অসুস্থ হয়েছি, তুমি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করনি। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, এটা কিরূপে সম্ভব? উত্তর হল ঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করনি।

তুমি যদি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে, তবে আমাকে তার কাছে পেতে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই মিল তখন প্রকাশ পায়, যখন মানুষ ফরয কর্মসমূহ পালন করার পর নফল এবাদতে মশগুল হয়। যেমন, অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به -

অর্থাৎ, বান্দা সর্বদা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে মহব্বত করি। যখন মহব্বত করি, তখন তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে এবং তাঁর জিহ্বা হয়ে যাই, যাতে সে কথা বলে।

মোটকথা, মিল ও মহব্বতের একটি বড় কারণ, যা অধিক শক্তিশালী, উৎকৃষ্ট ও অচিন্তনীয়। এর অস্তিত্ব খুবই বিরল।

মহব্বতের উপরোক্ত পাঁচটি কারণই আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে আক্ষরিক অর্থে একত্রিত রয়েছে এবং সবগুলো উচ্চস্তরে রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্ট মনীষীগণের মতে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন এক কারণে মাহবুব হয়, তবে অন্য ব্যক্তিরও সে কারণে মাহবুব হওয়া সম্ভব। এটা অংশীদারিত্ব, যা মহব্বতের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার প্রমাণ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁর চূড়ান্ত প্রতাপ ও সৌন্দর্যের গুণাবলীতে কোন শরীক বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আসল মহব্বতের হকদার সেই সত্তা, যাতে কখনও অপরের অংশীদারিত্ব নেই।

খোদায়ী মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার উপায় ঃ আখেরাতে সে ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যার মহব্বত অধিকতর শক্তিশালী হবে। কেননা, আখেরাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করা। বলা বাহুল্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন আশেক তার মাশুকের কাছে যাবে, তার দীদারে

চিরতরে ধন্য হবে, কোনরূপ বাধা থাকবে না এবং মালিন্য ও বিচ্ছিন্নতার কোন আশংকা থাকবে না, তখন কি অভাবনীয় খুশী ও অপার আনন্দই না তার অর্জিত হবে! কিন্তু এই আনন্দ মহব্বতের শক্তি অনুপাতে হবে। মহব্বত যত বেশী হবে, আনন্দও তত বেশী হবে।

দুনিয়াতে কোন ঈমানদার আল্লাহর মহব্বত থেকে খালি নয়। কিন্তু মহব্বতের আধিক্য যাকে এশ্ক বলা হয়, তা অনেকের মধ্যে নেই। এই এশ্ক অর্জনের উপায় দু'টি— দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মন থেকে গায়রুল্লাহর মহব্বত বের করে দেয়া। কেননা, মন হচ্ছে পান-পাত্রের মত। যদি পাত্রে পানি থাকে, তবে তাতে সিরকা রাখার অবকাশ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুটি মন দেননি যে, একটির দ্বারা আল্লাহকে মহব্বত করবে এবং অপরটি দ্বারা গায়রুল্লাহকে মহব্বত করবে। আল্লাহকে সর্বান্তকরণে চাওয়াই হচ্ছে পরিপূর্ণ মহব্বত। যে পর্যন্ত অপরের দিকে মনোযোগ রাখবে, সে পর্যন্ত মন অপরের সাথে একপ্রকার মশগুল থাকবে এবং যে পরিমাণ অপরের সাথে মশগুল থাকবে, সে পরিমাণ মনে আল্লাহর মহব্বত কম হবে। এই একাগ্রতার দিকেই এ আয়াতসমূহে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ-

অর্থাৎ, বলুন আল্লাহ, এরপর তাদেরকে তাদের অসার চিন্তায় খেলা করতে দিন।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, এরপর তাতে দৃঢ় থাকে।

কালেমায়ে তাইয়েবা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"— এর উদ্দেশ্যই তাই। অর্থাৎ কোন মাবুদ ও মাহবুব আল্লাহ ছাড়া নেই। বলা বাহুল্য, মাহবুবই মাবুদ হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ বলেন—

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

অর্থাৎ, দেখতো, যে মাবুদ করে নিয়েছে তার খেয়ালখুশীকে?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন —

ابغض اله عبد فى الأرض الهواء

অর্থাৎ, সর্বনিকৃষ্ট মাবুদ, যার পূজা করা হয় পৃথিবীতে, সে হচ্ছে খেয়ালখুশী।

অন্য এক হাদীসে আছে—

من قال لااله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنة -

অর্থাৎ, যে খাঁটি মনে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এখানে খাঁটি অর্থ অন্তরকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করা, যাতে অপরের অংশীদারিত্ব না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাই অন্তরের মাবুদ, মাহবুব ও মকসুদ হওয়া। যার এই অবস্থা, দুনিয়া তার জন্যে জেলখানা। কারণ, মাহবুবের সাথে সাক্ষাতে দুনিয়া একটি বাধা। মৃত্যু তার জন্যে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং মাহবুবের কাছে যাওয়া। যার মাহবুব এক সত্তা এবং সে জেলখানায় থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে, সে যদি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাহবুবের সাথে মিলিত হয় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত অনাবিল সুখে কাল কাটায়, তবে সে কতই না সৌভাগ্যশালী।

মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার আরেক উপায় হচ্ছে খোদায়ী মারেফত শক্তিশালী হওয়া ও অন্তরে তা বিস্তৃত হওয়া। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে অন্তর পাক হওয়ার পর তা অর্জিত হয়। যেমন, শস্যক্ষেত্রকে সকল আগাছা থেকে সাফ করার পর তাতে বীজ বপন করা হয়। অন্তরকে এভাবে পাক করার পর তাতে মহব্বত ও মারেফতের বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়। এ বৃক্ষের নাম কালেমায়ে তাইয়েবা, যার দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ কালেমায়ে তাইয়েবার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যা পবিত্র

বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে বিস্তৃত।

নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে ঃ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ -

অর্থাৎ, তারই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কালাম ও সৎকর্ম।

এখানে পবিত্র কালামের অর্থ মারেফাত, আর সৎকর্ম এই মারেফাতের বাহক ও খাদেমের মত।

অন্তরকে পবিত্র করে তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখাই যাবতীয় সৎকর্মের উদ্দেশ্য। এভাবে মারেফত অর্জিত হলে তার পেছনে মহব্বত অবশ্যই থাকবে। মহব্বত থাকলে আনন্দও থাকবে।

মহব্বত ও মারেফতে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ঃ সকল ঈমানদার ঈমানে অভিন্ন হলেও মহব্বতে বিভিন্ন। কেননা, দুনিয়াতে মহব্বত ও মারেফত বিভিন্ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ও গুণাবলীর মধ্য থেকে যা শুনে, তাই শিখে মুখস্থ করে নেয়। এর বেশী তারা কিছু জানে না। কেউ কেউ এসব নাম ও গুণের অর্থ এমন কল্পনা করে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। বলা বাহুল্য, এরা পথভ্রষ্ট। আবার কেউ কেউ বাস্তব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় না এবং এসবের কোন অসার অর্থ কল্পনা করে না; বরং সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে। সত্যি বলতে কি, এরাই "আসহাবে ইয়ামীন"! আর যারা প্রত্যেক নাম ও গুণের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ অবগতি লাভ করে, তারা নৈকট্যশীল। আল্লাহ তা'আলা এই তিন প্রকার মানুষের কথা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّالِّيْنَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ -

অর্থাৎ, যদি তারা হয় নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের জন্যে রয়েছে সুখ, রুযী ও নেয়ামতের বাগান। আর যদি তারা হয় আসহাবে ইয়ামীনদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি সালাম। আর যদি তারা হয় পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের আপ্যায়ন করা হবে উত্তপ্ত পানির দ্বারা এবং প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে।

এক্ষণে আমরা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহব্বতের বিভিন্নতা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাব। উদাহরণতঃ শাফেঈ মতাবলম্বীরা হযরত ইমাম শাফেঈকে মহব্বত করে। এ মহব্বতে ফেকাহবিদ, আলেম ও জনসাধারণ সকলেই অংশীদার। কারণ, তাঁর জ্ঞান-গরিমা, ধর্মপরায়ণতা, সচ্চরিত্রতা ও প্রশংসনীয় স্বভাব সম্পর্কে সবাই অবগত। কিন্তু সকলের অবগতি সমান নয়। জনসাধারণ তাঁর গুণ-গরিমা সংক্ষেপে এবং ফেকাহবিদগণ বিস্তারিতভাবে জানে। এ কারণে ফেকাহবিদদের মহব্বতও জনসাধারণের তুলনায় অনেক বেশী হবে। এমনিভাবে গোটা এ বিশ্ব আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও কারিগরীর জ্বলন্ত নমুনা। সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি কেবল বিশ্বাস করে এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়াকিফহাল। এমনকি, তারা সামান্য একটি মাছির ভেতরে এমন সব আশ্চর্য নিদর্শন দেখে, যা শুনে জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায়। একারণেই তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও পূর্ণতার গুণাবলী অধিক পরিমাণে জাগরূক থাকে। ফলে, তাদের মহব্বতও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মহব্বতের যে পাঁচটি কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর পার্থক্যের কারণে মহব্বতে পার্থক্য হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কেউ আল্লাহ তা'আলাকে এ কারণে মহব্বত করে যে, তিনি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদাতা, তবে তার এই মহব্বত হবে দুর্বল। কেননা, অনুগ্রহের পরিবর্তনে এ মহব্বত পরিবর্তন অনিবার্য। ফলে, বিপদাপদে পতিত হওয়ার সময় এ মহব্বত তেমন থাকে না, যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কারণে মহব্বত রাখে যে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা মহব্বতেরই যোগ্য, সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সকলই তাঁর অর্জিত রয়েছে, তবে তার মহব্বত অনুগ্রহের পরিবর্তনের কারণে কখনও পরিবর্তিত হবে না; বরং সদাসর্বদা একই রূপ থাকবে।

মোটকথা, এসব কারণে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে মানুষের অবস্থা

বিভিন্ন হয় এবং এই বিভিন্নতার ভিত্তিতে পারলৌকিক সৌভাগ্যে পার্থক্য হয়।

আল্লাহর মারেফতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি ঃ পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, সেগুলোর মধ্যে অধিকতর দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তাই যাবতীয় মারেফতের মধ্যে আল্লাহর মারেফতই সর্বপ্রথম বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো প্রতীয়মান হয়। এর কারণ অবশ্যই জানা দরকার। আমরা আল্লাহ পাককে অস্তিত্ব জগতের সর্বাধিক দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর বলেছি। এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে আমরা একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করছি।

যদি আমরা কোন মানুষকে লিখতে, সেলাই করতে অথবা অন্য কোন কাজ করতে দেখি, তবে তার জীবিত হওয়া আমাদের কাছে সর্বাধিক স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ, তার জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা আমাদের মতে তার অন্যান্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর তুলনায় অধিক স্পষ্ট হবে। কেননা, তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যেমন, ক্রোধ, স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি তো আমরা জানিই না। আর বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে কতক আমরা জানি না আর কতক আমাদের জানা হয়ে যায়। যেমন, জীবন, জ্ঞান, কর্মক্ষমতা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অতঃপর আমরা যদি বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী আমাদের জানা হয়ে যায়। পাথর, ঢিলা, তরুলতা, বৃক্ষ, জীবজন্তু, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, সৌরজগত, জল, স্থল ইত্যাদি সকল বস্তু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, কুদরত, জ্ঞান ইত্যাদি গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলো সব এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, একজন স্রষ্টা, পরিচালক ও সবকিছুকে গতিশীলকারী অবশ্যই বিদ্যমান। এ ধরনের সৃষ্টবস্তুর কোন শেষ নেই। তাই আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রমাণসমূহের শেষ নেই। যদি লেখকের জীবন, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা কেবল একটি প্রমাণ অর্থাৎ, তার হাতের নড়াচড়া দেখে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয়ে যায়, তবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও জীব-কিরূপে স্পষ্ট হবে না। তাঁর অস্তিত্ব বুঝাবে না— এমন কোন বস্তুর থাকা সম্ভব নয়। আমাদের ভেতরেও এমন কোন বস্তু নেই এবং বাইরেও নেই। কেননা, বিশ্বের প্রতিটি কণা তার অবস্থার ভাষায় ডেকে বলছে— আমি আপনা-আপনি বিদ্যমান ও গতিশীল নই। আমার আবিষ্কর্তা ও গতিশীলকারী অন্য কেউ। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, অস্থির গ্রন্থি, রক্ত-মাংস ইত্যাদি সবকিছুই একজন স্রষ্টার সাক্ষ্য দেয় বিধায় তিনি এতই

স্পষ্ট হয়ে গেছেন যে, তাঁকে উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা, দু'কারণে কোন বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম। এক, সেই বস্তুর সত্তাগতভাবে অপ্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম হওয়া। দুই, বস্তুর সীমাতিরিক্ত দৃশ্যমান ও প্রকট হওয়া। যেমন, বাদুড় রাতের অন্ধকারে দেখে এবং দিনের আলোতে দেখে না। এর কারণ এটা নয় যে, দিন রাতের তুলনায় অস্পষ্ট; বরং দিন এত বেশী স্পষ্ট যে, বাদুড়ের দুর্বল দৃষ্টি তাতে ধাঁধিয়ে যায়। সূর্যকিরণের তীব্রতা তার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। যখন এর সাথে কিছু অন্ধকার মিশ্রিত হয় এবং প্রকাশ দুর্বল হয়, তখন বাদুড় দেখতে শুরু করে। অনুরূপভাবে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল, আর আল্লাহ্ তা'আলার বিকাশে রয়েছে অসাধারণ চমক ও চূড়ান্ত দীপ্তি। এমনকি তাঁর বিকাশ দ্বারা প্রতিটি কণা দেদীপ্যমান। ফলে, এই অসাধারণ বিকাশই তাঁর গোপন ও অস্পষ্ট থাকার কারণ হয়ে গেছে।

তীব্র প্রকাশের কারণে গোপন থাকার তত্ত্ব শুনে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, বস্তুর বিকাশ ঘটে তার বিপরীত বস্তুর দ্বারা। যেমন, অন্ধকার আছে বলেই আমরা আলো উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তাঁর কোন বিপরীত নেই। এ কারণেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তিনি চূড়ান্ত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থেকে যান। কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং শক্তিপ্রবল, সে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন কিছু দেখে না। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই বিদ্যমান নেই। অন্যের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম তাঁর কুদরতের ফল এবং তাঁরই অনুগামী।

শওক তথা আগ্রহের স্বরূপ ঃ যারা মহব্বতের বাস্তবতা অস্বীকার করে, তারা আগ্রহের স্বরূপকে অবশ্যই স্বীকার করে না। কেননা, আগ্রহ মাহবুবের প্রতিই হয়ে থাকে। আমরা এখনি প্রমাণ করব, যে আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহর প্রতি তার আগ্রহ অবশ্যই থাকে এবং সে আগ্রহে বাধ্য।

মহব্বত প্রমাণ করার জন্যে আমরা ইতিপূর্বে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি, বলা বাহুল্য, আগ্রহ প্রমাণ করার জন্যে সেগুলোই যথেষ্ট। অর্থাৎ, মাহবুব যখন দৃষ্টির অন্তরালে থাকে, তখন তার প্রতি আগ্রহ হওয়া অনিবার্য। এর ব্যাখ্যা এই যে, যে বস্তু একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্য

দিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই আগ্রহ হওয়া সম্ভব। যে বস্তু কখনও উপলব্ধিতেই আসেনি, তার প্রতি আগ্রহ হওয়া অসম্ভব। এমনিভাবে যে বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপলব্ধ হয়ে যায়, তার প্রতিও আগ্রহ থাকে না। চূড়ান্ত উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কখনও দেখেনি এবং কখনও তার প্রশংসা শুনেনি। এমতাবস্থায় এই অদেখা ও অজানা ব্যক্তির প্রতি তার আগ্রহান্বিত হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। আর যে ব্যক্তি তার মাহবুবকে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করে, সে-ও মাহবুবের প্রতি আগ্রহান্বিত হবে না। বরং যে মাহবুব একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্যদিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই আগ্রহ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির মাহবুব তার কাছেই নেই; কিন্তু তার কল্পনা তার অন্তরে বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই কল্পনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে সে মাহবুবকে দেখতে আগ্রহান্বিত হবে। কেননা, আগ্রহের অর্থ হচ্ছে অন্তরস্থিত কল্পনাকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস পাওয়া। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবকে অন্ধকারে দেখে, ফলে তার মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দৃষ্টিতে পড়ে না, সে-ও এই অপূর্ণ দীদারকে পূর্ণ করতে আগ্রহী হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবের মুখমণ্ডল দেখে, কিন্তু তার কেশ ও অন্যান্য সৌন্দর্য দেখে না, সে-ও এগুলো দেখার জন্যে আগ্রহী হয়।

আগ্রহের উপরোক্ত ধরনগুলো আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বরং প্রত্যেক মহব্বতকারী সাধকের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার যে সব বিষয় আল্লাহওয়ালাদের সামনে প্রকটিত হয়েছে, সেগুলো যেন হালকা যবনিকার অন্তরাল থেকে দেখার অনুরূপ এবং তাতে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্পষ্টতা নেই। পূর্ণ স্পষ্টতা প্রত্যক্ষকরণ ও জ্যোতির দীপ্তিকে বলা হয়, যা দুনিয়াতে অসম্ভব। কিন্তু এটাই আল্লাহওয়ালাদের চূড়ান্ত প্রিয় লক্ষ্য। তাই আগ্রহ সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ, মহব্বতকারীর সামনে আল্লাহ তা'আলার সামান্য প্রকাশ হওয়ার পর সে পূর্ণ প্রকাশের জন্যে নিঃসন্দেহে আগ্রহী হবে।

অসংখ্য হাদীস ও মনীষীগণের উক্তিতেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে এ দোয়া বর্ণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

وَلَذَّةِ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার আদেশের পর সম্মতি, মৃত্যুর পর সুখী জীবন, তোমার প্রিয় মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং তোমার সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হযরত কা'ব আহ্বারকে বললেন ঃ আমাকে তাওরাতের কোন একটি আয়াত শুনাও। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন— সজ্জনগণ আমার সাক্ষাতের প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়, আর আমি তাদের সাক্ষাতের প্রতি অধিক আগ্রহী। তিনি আরও বললেন ঃ তাওরাতে এই আয়াতের কাছাকাছি আরও উল্লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে। আর যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে না। হযরত আবুদ্দারদা বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে বললেন ঃ হে দাউদ, পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে শুনিয়ে দাও, যে আমাকে মহব্বত করবে, আমি তার হাবীব। যে আমার কাছে বসবে, আমি তার সহচর। যে আমার যিকর দ্বারা প্রীতি অর্জন করবে, আমি তার প্রিয়জন। যে আমার সাথে থাকবে, আমি তার সাথী। যে আমাকে অবলম্বন করবে, আমি তাকে অবলম্বন করব। যে আমার কথা মানবে, আমি তার কথা মানব। যে আমাকে মহব্বত করে, তার মহব্বত আমার খুব জানা হয়ে যায়। ফলে, আমি তাকে নিজের জন্যে কবুল করে নিই। তাকে এমন মহব্বত করি, আমার সৃষ্টির কেউ তার উপর অগ্রণী থাকে না। যে আমাকে সত্যি সত্যি অন্বেষণ করে, সে আমাকে পায়। আর যে অন্যকে অন্বেষণ করে, সে আমাকে পায় না। হে পৃথিবীর অধিবাসীরা, তোমরা এখন দুনিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছ। একে পরিত্যাগ কর এবং আমার সম্মান, সংসর্গ ও সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হও। আমার সাথে বন্ধুত্ব কর, আমি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করব। কেননা, আমি আমার বন্ধুদের খমীর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, মূসা কলীমুল্লাহ এবং মুহাম্মদ সফীউল্লাহ্র খমীর থেকে তৈরী করেছি। আমি আমার প্রতি আগ্রহীদের অন্তর নিজের নূর দ্বারা নির্মাণ করেছি এবং আমার প্রতাপ দ্বারা তাদেরকে লালিত করেছি।

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক সিদ্দীককে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট বান্দা আমার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, আমিও তাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখি। তারা আমার প্রতি আগ্রহী, আমিও তাদের প্রতি আগ্রহী। তারা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। তারা আমার দিকে তাকায়, আমিও তাদের দিকে তাকাই। যদি তুমিও তাদের পদাংক অনুসরণ কর, তবে আমি তোমাকে মহব্বত করব। আর যদি তাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হব। সিদ্দীক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার এই সকল বান্দার পরিচয় কি? এরশাদ হল— তারা দিনের বেলায় ছায়ার প্রতি এমন উৎসুক থাকে, যেমন— রাখাল তার ছাগলের প্রতি উৎসুক থাকে। তারা সূর্যাস্তের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে; যেমন পশুপাখি সন্ধ্যায় তাদের বাসায় ফেরার জন্যে আগ্রহী হয়। অতঃপর যখন রাত এসে যায়, অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায়, শয্যা বিছানো হয়, রহস্য উন্মোচিত এবং দোস্ত দোস্তের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা আমার উদ্দেশে পা বাড়ায়, কপাল বিছায়, আমার কালামের মাধ্যমে আমার কাছে মোনাজাত করে এবং আমার নেয়ামতের উপর আমাকে খোশামোদ করে। তাদের কেউ চিৎকার করে, কেই কান্নাকাটি করে এবং কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাদের কেউ আগ্রহী হয়ে দাঁড়ানো, কেউ বসা, কেউ রুকুকারী, কেউ সেজদাকারী। তারা আমার কারণে যা যা সহ্য করে এবং আমার কাছে অভিযোগ করে, তা সমস্তই গ্রহণ করে নিই। সর্বপ্রথম আমি তাদেরকে তিনটি বস্তু দান করব। এক, আমার নূর তাদের অন্তরে ঢেলে দেব। ফলে তারা আমার অবস্থা বর্ণনা করবে; যেমন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দেই। দুই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, যদি সবই তাদের মোকাবেলা করে, তবে আমি তাদের খাতিরে এগুলোকে কম মনে করব। তিন, আমি আমার পবিত্র মুখমণ্ডল তাদের দিকে ফিরিয়ে দেব। তুমি তো জান, আমি যার দিকে মুখ করি, তাকে কত কিছু দেই!

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনাবলীতে আরও উল্লিখিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বললেন ঃ হে দাউদ, জান্নাতকে কত স্মরণ করবে অথচ আমার কাছে আসার প্রতি আগ্রহের আবেদন করবে না? হযরত দাউদ আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার প্রতি আগ্রহী কারা? এরশাদ

হল, তারা আমার আগ্রহী, যাদেরকে আমি সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে পবিত্র করে দিয়েছি এবং ভয় সম্পর্কে অবহিত করেছি। তাদের অন্তরে আমার দিকে ছিদ্র করে দিয়েছি। সেই ছিদ্রপথে তারা আমাকে দেখে। আমি তাদের অন্তরকে হাতে নিয়ে আকাশের উপর রাখি। এরপর শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদেরকে ডাকি। তারা সমবেত হয়ে আমাকে সেজদা করে। তখন আমি তাদেরকে বলি ঃ আমি তোমাদেরকে সেজদার জন্য ডাকিনি; বরং আমি তোমাদেরকে আমার প্রতি আগ্রহীদের নিষ্কলুষ অন্তর দেখাতে চাই এবং তাদের নিয়ে গর্ব করতে চাই। তাদের অন্তর আকাশে ফেরেশতাদেরকে এমন নূর দান করে, যেমন সূর্য পৃথিবীবাসীকে কিরণ দান করে। হে দাউদ, আমি আগ্রহীদের অন্তর আপন "রেযা" দ্বারা তৈরী করেছি। নিজের চেহারার নূর দ্বারা তাদের লালন করেছি। তাদের দেহকে পৃথিবীতে আমার লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছি। তারা অন্তরের পথ দিয়ে আমাকে দেখে এবং তাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

হযরত দাউদ আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার আশেকদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দাও। আদেশ হল ঃ লেবাননের পাহাড়ে চলে যাও। সেখানে চৌদ্দজন লোকের সাক্ষাত পাবে। তাদের মধ্যে রয়েছে যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সকল প্রকার লোক। তাদের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলো যে, আমাদের কাছে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন ব্যক্ত করো না কেন? তোমাদের পালনকর্তা সালাম জানিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন— তোমরা তো আমার বন্ধু, মনোনীত ও ওলী। আমি তোমাদের আনন্দে আনন্দিত হই এবং তোমাদের মহব্বতের দিকে অগ্রগামী হই। হযরত দাউদ নির্দেশ অনুযায়ী লেবানন পাহাড়ে গিয়ে তাদেরকে একটি ঝরণার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ঘোষণায় রত দেখলেন। তারা হযরত দাউদকে দেখেই প্রস্থানোদ্যত হলেন। হযরত দাউদ বললেন ঃ ভাইসব, আমি আল্লাহর রসূল। তাঁর একটি পয়গাম নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তারা তাঁর দিকে মুখ করে কান পেতে শুনতে লাগল। হযরত দাউদ বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এই পয়গাম দিচ্ছেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছে ব্যক্ত করবে, তাঁকে ডাকবে, যাতে তিনি তোমাদের কণ্ঠস্বর শুনেন। তোমরা তাঁর বন্ধু ও ওলী। তোমাদের খুশীতে তিনি খুশী হন। স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁর সন্তানদের দেখাশুনা করে, তেমনি তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের দেখাশুনা

করেন। একথা শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দোয়া করল। বৃদ্ধ দোয়ায় বলল ঃ ইলাহী, আমরা তোমার বান্দা এবং বান্দার সন্তান-সন্ততি। অতীত জীবনে আমরা যে পরিমাণ তোমাকে স্মরণ করিনি, আমাদেরকে সে পরিমাণ ক্ষমা কর। দ্বিতীয় জন বলল ঃ ইলাহী, তুমি পবিত্র। আমরা তোমার দাসানুদাস। তোমার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার রয়েছে তাতে সুদৃষ্টি দান কর। তৃতীয় জন বলল ঃ তুমি পবিত্র। আমরা কি তোমার কাছে দোয়া করার দুঃসাহস করব? তুমি জান, আমাদের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। তবে সর্বদা তোমার পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান কর। এতটুকু অনুগ্রহ আমাদের প্রতি কর। চতুর্থ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তোমার সন্তুষ্টি অন্বেষণে আমরা ত্রুটি করেছি। তুমি নিজের কৃপায় এ কাজে আমাদের সাহায্য কর। পঞ্চম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা করার গৌরব দান করেছ। অতএব, যে ব্যক্তি তোমার মাহাত্ম্যে মশগুল, সে কি তোমার সাথে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? তুমি আমাদেরকে আপন নূরের নিকটবর্তী কর— এটাই ছিল আমাদের মকছুদ। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তুমি মহান। তুমি তোমার ওলীদের নিকটে থাক। তাই তোমার কাছে দোয়া করার সাহস আমরা পাই না। সপ্তম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, তুমি আমাদের অন্তরকে যিকিরের পথ প্রদর্শন করেছ এবং তোমাতে মশগুল হওয়ার ধ্যান দান করেছ। এই নেয়ামতের শোকরে আমাদের পক্ষ থেকে যে ত্রুটি হয়েছে, তা ক্ষমা কর। অষ্টম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, আমাদের প্রয়োজন তো তুমি জানই। সেটা হচ্ছে কেবল তোমার দিকে দেখা। নবম ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, দাস তার প্রভুর সামনে দুঃসাহস দেখাতে পারে না। যেহেতু আপন কৃপায় আমাদেরকে দোয়ার আদেশ করেছ, তাই আরয করছি— আমাদেরকে সেই নূর দান কর, যা দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্ধকার স্তরসমূহে পথ পাওয়া যায়। দশম ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে তোমাকেই চাই। আমাদের প্রতি মনোযোগী হও এবং সর্বদা আমাদের কাছে থাক। একাদশ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তুমি আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছ, আমরা তা পূর্ণ করার আবেদন করি। দ্বাদশ ব্যক্তি বলল ঃ এলাহী, তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে আমাদের কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই। কেবল কৃপাদৃষ্টি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। ত্রয়োদশ ব্যক্তি বলল ঃ

এলাহী, আমার আবেদন এই যে, দুনিয়াকে দেখার ব্যাপারে আমার চক্ষুকে অন্ধ কর এবং আখেরাতে মশগুল হওয়ার ব্যাপারে আমার অন্তরকে অন্ধ কর। চতুর্দশ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, আমি জানি তুমি ওলীদেরকে ভালবাস। অতএব, আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ কর যে, আমাদের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে কেবল তোমাতে মশগুল করে দাও।

আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ তাদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের সকল কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা যা যা কামনা করেছ, আমি সবই কবুল করলাম। তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও এবং ভূগর্ভে কুঠরী তৈরী করে নাও। আমি তোমাদের ও আমার মধ্যবর্তী যবনিকা সরিয়ে দিতে চাই যাতে তোমরা আমার নূর ও প্রতাপ দর্শন কর। হযরত দাউদ (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, এরা এই পর্যায়ে কেমন করে উন্নীত হল? এরশাদ হল— তারা আমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদেরকে ত্যাগ করে আমার সাথে একাকী থাকে।

বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত ঃ কোরআন মজীদের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে মহব্বত রাখেন। এখন এই মহব্বতের অর্থ কি, তা জানা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এর আগে আমরা সে সব আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করছি, যেগুলোর দ্বারা এই মহব্বত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ

অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারা তাঁকে মহব্বত করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন, যারা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর পথে যুদ্ধ করে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মহব্বত করেন তওবাকারীদেরকে ও পরিচ্ছন্নদেরকে।

আল্লাহ বান্দাকে মহব্বত করেনল—এ কারণেই যারা আল্লাহর মহব্বতের মিথ্যা দাবী করেছিল, তাদের জওয়াবে এরশাদ করেন—

অর্থাৎ, তাহলে গোনাহের কারণে তিনি তোমাদেরকে আযাব দেবেন কেন?

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اذا احب الله تعالى عبد الا يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لاذنب له -

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন গোনাহ তার কোন ক্ষতি করে না। গোনাহ থেকে তওবাকারী গোনাহবিহীন ব্যক্তির মত।

এ হাদীসের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাহকে মহব্বত করেন, মৃত্যুর পূর্বেই তার তওবা কবুল করে নেন। এরপর অতীত গোনাহ অনেক হলেও তা তার কোন ক্ষতি করে না। যেমন, মুসলমান হওয়ার পর অতীত কুফর ক্ষতি করে না।

আল্লাহ তা'আলা মহব্বতের কারণে গোনাহ মাফ করার কথাও ঘোষণা করেছেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

অর্থাৎ, বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তিনি তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন।

রসূল আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولا يعطى الايمان الامن يحب -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মহব্বত করেন এবং যাকে মহব্বত করেন না, উভয়কেই দুনিয়া দেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি মহব্বত করেন।

তিনি আরও বলেন—

من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اكثر ذكر الله احبه الله -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ্ তাকে অবনমিত করে দেন। আর যে আল্লাহকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করে, আল্লাহ্ তাকে মহব্বত করেন।

যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে এতই মহব্বত করেন যে, তাঁকে এক পর্যায়ে বলেন— যা তোমার মন চায়, তাই কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত আক্ষরিক অর্থেই মহব্বত, রূপক অর্থে নয়। কেননা, অভিধানে মহব্বতের অর্থ অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের কামনা। এ কামনা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেলে তার নাম হয় এশ্ক। আমরা আরও বর্ণনা করেছি যে, অনুগ্রহ ও সৌন্দর্য উভয়টিই মনের অনুকূল। উভয়টি কখনও চর্মচক্ষু এবং কখনও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভূত হয়। অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যের উভয় প্রকার অনুভবে মহব্বত অপরিহার্য। চর্মচক্ষুতে অনুভূত হওয়াই জরুরী নয়। কিন্তু বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত এভাবে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহর জন্যে আরও যত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন শোনা, জানা ইত্যাদি মানুষ ও আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে একই অর্থে বলা যায় না। এমনকি অস্তিত্ব শব্দটি, যা অভিন্নতার দিক দিয়ে অত্যধিক ব্যাপক, সেটিও আল্লাহ্ ও মানুষের জন্যে

একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যতকিছু আছে, সব কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অনুসারী ও অনুসৃতের অস্তিত্ব এক রকম কিভাবে হতে পারে? শব্দ রচয়িতারা মহব্বত, কুদরত, ইচ্ছা, প্রভৃতি শব্দকে প্রথমে মানুষের জন্যে রচনা করেছিল। কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধিতে মানুষই প্রথমে ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে এসব শব্দের ব্যবহার রূপক অর্থে হয়েছে।

মহব্বত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের কামনা। এটা সে মন হতে পারে, যা অনুকূল বস্তু না পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ থাকে এবং পাওয়া গেলে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অসম্ভব। কারণ, পূর্ণতা, সৌন্দর্য, প্রতাপ ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিদ্যমান এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ও অর্জিত থাকবে। আর বাস্তবে তাঁর সত্তা ও কর্ম ব্যতীত কোন কিছুই বিদ্যমান নেই। এ কারণেই শায়খ আবু সাঈদের সামনে যখন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ (আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারা আল্লাহকে মহব্বত করে।) আয়াতখানি পাঠ করা হল, তখন তিনি বললেন ঃ তিনি নিজেকেই মহব্বত করেন। অর্থাৎ, সবকিছু তিনিই। তিনি ব্যতীত কোন কিছু বিদ্যমান নেই।

সুতরাং বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার অন্তর থেকে যবনিকা উন্মোচিত করে দেয়া। ফলে, বান্দা তাঁকে অন্তর দিয়ে দেখতে অথবা তিনি বান্দাকে নৈকট্যলাভে সক্ষম করে দেন। এসব কাজ অর্থাৎ যবনিকা উন্মোচিত করা অথবা নৈকট্যলাভে সক্ষম করা সমস্তই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপায় হবে। বান্দার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের অর্থ তাই।

এখন প্রশ্ন হল, বান্দার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত একটি অস্পষ্ট ব্যাপার। আমরা কিরূপে জানব, এই বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার মাহবুব? জওয়াব, এর কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়, সে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতপ্রাপ্ত। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا احبه الحب البالغ اقتناه

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন

তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। যখন তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মহব্বত করেন, তখন তাকে খাঁটি করে নেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে "খাঁটি করে নেন" কথার মর্মার্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ অর্থাৎ তার কাছে ধন ও জন বলতে কিছুই রাখেন না। এ থেকে জানা গেল, বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের পরিচয় হল আল্লাহ্ তাকে গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেবেন এবং বান্দা ও গায়রুল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেবেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে কোন এক ব্যক্তি আরয করল ঃ আপনি সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চর ক্রয় করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় নয়, তিনি আমাকে নিজের সত্তা থেকে আলাদা করে খচ্চরের ব্যস্ততা দান করবেন। হাদীসে আছে—

اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه وان رضى اصطفاء

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। যদি সে সবর করে, তবে তাকে নির্বাচিত করে নেন, আর যদি সে রাযী থাকে, তবে মনোনীত করে নেন।

অন্য এক হাদীসে আছে—

اذا احب الله عبد اجعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يامره وينهاه -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তার জন্যে তার নিজের মধ্য থেকে একজন উপদেশদাতা এবং অন্তরের তরফ থেকে একজন সতর্ককারী নিযুক্ত করে দেন। সে তাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।

মোটকথা, এসব লক্ষণের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত প্রমাণিত হয়। এছাড়া, আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বতও এই মহব্বতের একটি দলীল।

এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার মহব্বতেরও কিছু লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত দাবী করা খুবই সহজ। কিন্তু এর বাস্তবতা খুবই বিরল। শয়তানের প্ররোচনায়ও মন অনেক সময় খোদায়ী মহব্বত দাবী করে। মহব্বতের আলামত দ্বারা মনের পরীক্ষা না নেওয়া পর্যন্ত এ দাবীতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। মহব্বত একটি বৃক্ষ, যার শিকড় পৃথিবীতে এবং শাখাপল্লব উর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত। এর ফল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় এবং এর দ্বারা মহব্বতের অস্তিত্ব জানা যায়। যেমন, ধোঁয়া দেখলে আগুনের অস্তিত্ব জানা যায়। এ ধরনের আলামত বা লক্ষণ অনেক। এক, আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতকে প্রিয় জ্ঞান করবে। কেননা, মহব্বতের পর মাহবুবের সাক্ষাত কামনা করাই স্বাভাবিক। এটা জানা কথা যে, দুনিয়া থেকে প্রস্থান ব্যতীত এই বাসনা পূর্ণ হবে না। তাই মৃত্যুকে মহব্বত করা ও তাকে অপ্রিয় মনে না করাও জরুরী। কেননা, মাশুকের দেশে যাওয়ার জন্যে এবং তার দীদার দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার জন্যে সফর করা আশেকের কাছে অপ্রিয় মনে হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন—

من احب لقاء الله احب الله لقاءه -

অর্থাৎ, যে আল্লাহর তা'আলা সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাত পছন্দ করেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের পর বান্দার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় যে স্বভাবটি প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে অধিক পরিমাণে সেজদা।

আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য মহব্বত বলে এরশাদ করেছেন। সেমতে মুসলমানরা যখন খোদায়ী মহব্বতের দাবী করল, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদেরকেই মহব্বত করেন, যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে।

আরও বলা হয়েছে—

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

অর্থাৎ, যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর মারে ও মরে।

এখানে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার বাসনাকে মহব্বতের আলামত বলা হয়েছে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে যে ওসিয়ত করেন, তাতে বলা হয়েছে— সত্য কথা অসহনীয়। এতদসত্ত্বেও তা প্রিয়। মিথ্যা হালকা হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও তা মন্দ। যদি তুমি আমার উপদেশ মনে রাখ, তবে মৃত্যুর চেয়ে অধিক কোন অনুপস্থিত বস্তু তোমার কাছে প্রিয় হবে না, যার আগমন সুনিশ্চিত। আর যদি এ উপদেশকে এড়িয়ে যাও, তবে কোন অনুপস্থিত বস্তু তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ হবে না; অথচ তুমি একে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।

সাঈদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁর পুত্র ইসহাকের কাছে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আমার কাছে এসে বললেন ঃ এস, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি। অতঃপর এক পার্শ্বে চলে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি— আগামীকাল যুদ্ধে যেন আমার মোকাবিলা কোন ভয়ংকর ক্রুদ্ধ বীরপুরুষের সাথে হয়। আমি তার সাথে এবং সে আমার সাথে লড়বে। অতঃপর সে আমাকে ভূতলশায়ী করে আমার নাক-কান কেটে দেবে এবং আমার পেট চিরবে। কিয়ামতে যখন আমি তোমার সামনে যাব, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ, তোমার নাক-কান কে কাটল? আমি আরয করব— ইলাহী, তোমার পথে এবং তোমার রসূলের পথে আমার এই দশা হয়েছে। হযরত সাঈদ বললেন ঃ আমি যুদ্ধের শেষ দিন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নাক ও কান সুতায় বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখেছি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন ঃ আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের অবশিষ্ট কসমও পূর্ণ করবেন।

হযরত সুফিয়ান ছওরী ও বিশরে হাফী (রহঃ) বলেন ঃ সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিই মৃত্যুকে খারাপ মনে করে। কারণ, হাবীব কোন অবস্থায় মাহবুবের সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না।

বুয়ায়তী জনৈক দরবেশকে জিজ্ঞেস করলে ঃ তুমি কি মৃত্যুকে মহব্বত কর? দরবেশ নিরুত্তর রইলেন, তিনি বললেন ঃ তুমি সত্যিকার দরবেশ হলে মৃত্যুকে প্রিয় মনে করতে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

দরবেশ বলল ঃ এক হাদীসে তো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। বুয়ায়তী বললেন, এই নিষেধাজ্ঞা তখন, যখন বান্দার উপর কোন মুসীবত নাযিল হয়। অর্থাৎ, মুসীবতের কারণে যেন কেউ মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকা তাঁর হুকুম থেকে পলায়ন করার চেয়ে উত্তম।

এখন প্রশ্ন হয়, মৃত্যুকে মহব্বত না করে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করতে পারে কি না? জওয়াব এই যে, মৃত্যুকে মহব্বত না করার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছেদের দুঃখ। এতে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে ত্রুটি থাকে। কিন্তু দুনিয়া ও স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের মহব্বতের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিও কিছু দুর্বল মহব্বত থাকা কঠিন নয়। মহব্বতে মহব্বতে তফাৎ থাকা তো একটা স্বীকৃত সত্য। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হযরত হুযায়ফা ইবনে ওতবা নিজের ভাগিনী ফাতেমাকে তারই মুক্ত ক্রীতদাস সালেমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এতে কোরায়শ বংশের লোকেরা ঘোর আপত্তি তুলতে লাগল ঃ তুমি একজন কোরায়শী মহিলার বিবাহ একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কেমন করে দিলে? হুযায়ফা জওয়াব দিলেন ঃ সালেম ফাতেমার চেয়ে উত্তম— একথা জেনেই আমি বিয়ে দিয়েছি। এই জওয়াব কোরায়শদের কাছে বিয়ের চাইতেও অধিক দুঃসহ মনে হল। তারা বলল ঃ এটা কিরূপে সম্ভব? ফাতেমা তো তোমার ভাগিনী এবং সালেম তোমার মুক্ত ক্রীতদাস! হুযায়ফা বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কাউকে দেখতে চায়, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে, সে যেন সালেমকে দেখে। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিছু লোক আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে না; বরং তারা দুনিয়ার সাথেও মহব্বত রাখে। অতএব, তারা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে যাবে, তখন দীদারের আনন্দ মহব্বত পরিমাণেই পাবে। পক্ষান্তরে তারা দুনিয়ার সাথে যে পরিমাণে মহব্বত রাখবে, দুনিয়া ত্যাগ করার সময় সে পরিমাণে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করবে।

মৃত্যুকে খারাপ মনে করার আরেক কারণ হল, বান্দা মহব্বতের প্রাথমিক স্তরে থাকার কারণে তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসাকে খারাপ মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মোলাকাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর আগমনকে খারাপ মনে করে। এতে মহব্বত কম হওয়ার অবস্থা বুঝায় না। বরং তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন আশেক তার মাশুকের আগমনবার্তা শুনে চায় যে, মাশুক কিছুদিন পরে আসুক, যাতে তার জন্যে ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে নেওয়া যায় এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়া যায়। ফলে মাশুক আসার পর স্বচ্ছন্দে তার সাথে সাক্ষাত করা যাবে এবং কোন অসুবিধা থাকবে না। সুতরাং এই জাতীয় কারণে মৃত্যুকে খারাপ মনে করা পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থী নয়। এর পরিচয় হচ্ছে আসলে পুরাপুরি যত্নবান হওয়া এবং চিন্তাকে আখেরাতের প্রস্তুতিতে ডুবিয়ে রাখা।

মহব্বতের আরও একটি আলামত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের প্রিয়বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেয়া, এর জন্যে কঠিনতর আমল বাস্তবায়িত করা এবং শৈথিল্য ও অলসতা পরিহার করে সার্বক্ষণিক এবাদতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য প্রত্যাশী হওয়া। এরূপ আত্মত্যাগীদের প্রশংসায় কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

অর্থাৎ, তারা তাদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। তারা যা প্রাপ্ত হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কোন কৌতূহল নেই। নিজেরা ক্ষুধাপীড়িত হলেও তারা তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

আর যে ব্যক্তি সব সময় নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, তার মাহবুব খেয়ালখুশীই হবে। আশেক তো তার মাশুকের ইচ্ছার অনুসরণ করে। তার ইচ্ছার সামনে নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দেয়। বরং খোদায়ী এশক যখন প্রবল হয়, তখন মাশুক ছাড়া সবকিছুর মূলোৎপাটন করে ছাড়ে। যেমন, বর্ণিত আছে, যুলায়খা যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে বিহাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল, তখন তাকে ছেড়ে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হল এবং তাঁরই হয়ে রইল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে দিনের বেলায় কাছে পেতে চাইলে যুলায়খা রাতের কথা বলে এড়িয়ে যেত এবং রাতে দিনের ওয়াদা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। বলত ঃ হে ইউসুফ, আমি আপনাকে তখন মহব্বত করতাম, যখন আল্লাহ তা'আলাকে জানতাম না। এখন তাঁকে চিনেছি। এখন তাঁর মহব্বত আমার অন্তরে অন্য কারো মহব্বতের জন্যে জায়গা রাখেনি। আমি এই মহব্বতের কোন বিনিময়ও চাই না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ, তুমি যুলায়খার সাথে সহবাস কর। তার গর্ভ থেকে তোমার দুটি পুত্র সন্তান হবে। আমি তাদের উভয়কে নবী করব। যুলায়খা আরয করল ঃ যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই আদেশ দিয়ে থাকেন এবং আমাকে এই নিয়ামতের মাধ্যম করে থাকেন, তবে আমি তাঁর ইচ্ছা শিরোধার্য করে নেব এবং সহবাসে সম্মত হব। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করে, সে তার আদেশ অমান্য করে না।

এখন জানা উচিত, নাফরমানী তথা আদেশ অমান্য করা মূল মহব্বতের পরিপন্থী নয়; বরং পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থী। উদাহরণতঃ মানুষ নিজেকে মহব্বত করে। সে যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন রোগমুক্তিকে মহব্বত করে। এতদসত্ত্বেও সে এমন বস্তু খেয়ে ফেলে, যা তার জন্যে ক্ষতিকর; অথচ সে জানে তা খেলে তার রোগ বেড়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, সে নিজেকে মহব্বত করে না। বরং বলা হয়, তার জ্ঞান কম এবং খাহেশ প্রবল। তাই মহব্বতের দাবীর উপর কায়েম থাকতে অক্ষম। নাফরমানী যে মূল মহব্বতের পরিপন্থী নয়, এর প্রমাণ এ ঘটনা। নোমান নামক জনৈক মুসলমান পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘন ঘন ধৃত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আনীত হত। একবার তাকে ধরে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উপর শরীয়তের শাস্তি "হদ" জারি করলেন। অতঃপর জনৈক সাহাবী তাকে লানত করলে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তাকে লানত করো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করে। এখানে তিনি গোনাহের কারণে নোমানকে মহব্বত থেকে খারিজ করে দেননি। হ্যাঁ, গোনাহ মানুষকে পূর্ণ মহব্বত থেকে খারিজ করে দেয়। জনৈক সাধক বলেন ঃ যখন মানুষের ঈমান অন্তরের বাহ্যিক অংশে থাকে,

তখন সে আল্লাহ তা'আলার সাথে মাঝারি ধরনের মহব্বত রাখে। আর যখন ঈমান অন্তরের অন্তস্তলে চলে যায়, তখন পূর্ণ মহব্বত রাখে এবং গোনাহ্ পরিত্যাগ করে।

মহব্বতের দাবী করা বিপদমুক্ত নয়। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ তোমাকে আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখ কি না, এ প্রশ্ন করা হলে তুমি চুপ থাকবে, জওয়াব দিবে না। কেননা, যদি বল "না", তবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি হাঁ বল, তবে তোমার গুণাবলী মজনুনের মত নয়। অতএব, আল্লাহর গযবকে ভয় কর এবং মিথ্যা দাবী করো না। জনৈক আলেম বলেন ঃ জান্নাতে মহব্বতকারীদের সুখ ও আনন্দের চেয়ে বড় কোন সুখ ও আনন্দ নেই। আর দোযখেও সে ব্যক্তির আযাবের চেয়ে বড় কোন আযাব নেই, যে মহব্বতের দাবী করে, অথচ মহব্বতের কোন বিষয় তার মধ্যে নেই।

মহব্বতের আরেক আলামত হচ্ছে, যিকিরের প্রতি অত্যধিক উৎসাহী হওয়া এবং যিকির থেকে অন্তরাশূন্য না থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর সাথে মহব্বত রাখে, সে তার যিকির তথা স্মরণ অনেক বেশী করে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহকেও অত্যধিক স্মরণ করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বতের লক্ষণ হবে তাঁর যিকির কে মহব্বত করা, তাঁর কালাম অর্থাৎ কোরআন মজীদকে মহব্বত করা এবং তাঁর রসূলকে মহব্বত করা। এমনিভাবে যে বস্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাকেও মহববত করা। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে মহব্বত করলে মাহবুবের গলির কুকুরকেও মহব্বত করতে থাকে। মহব্বত শক্তিশালী হয়ে গেলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। একে মহব্বতে অংশীদারিত্ব মনে করা ভুল। কেননা, মাহবুব আল্লাহর রসূলকে এজন্যে মহব্বত করবে যে, তিনি তাঁর রসূল। এটা হুবহু মাহবুবকেই মহব্বত করা— অপরকে নয়। যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যায়, সে সমগ্র সৃষ্টিকে মহব্বত করতে থাকে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টি যে মাহবুবেরই সৃষ্টি। সুতরাং কালামে পাক, রসূলে করীম (সাঃ) এবং ওলামায়ে কেরামকে মহব্বত না করে উপায় আছে কি? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, হে নবী বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তবে

আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

احبوا الله لما يغزوكم به من نعمة واحبونى لله -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে এজন্যে মহব্বত কর যে, তিনি তোমাদের নেয়ামত দিয়ে লালন-পালন করেন। আর আমাকে মহব্বত কর আল্লাহর জন্যে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতকারীকে মহব্বত করে, সে আল্লাহকে মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর তাযীমকারীর তাযীম করে, সে আল্লাহরই তাযীম করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোরআন ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন না করে। কেননা, যে কোরআনকে মহব্বত করে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে মহব্বত করে। যদি কোরআনের সাথে মহব্বত না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহব্বত হবে না।

হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ খোদায়ী মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে কোরআন মজীদের মহব্বত। আল্লাহ্ তা'আলা ও কোরআনের সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে মহব্বত। তাঁর সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে তাঁর সুন্নাহর সাথে মহব্বত। সুন্নাহর সাথে মহব্বতের লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের মহব্বত। আখেরাত যে প্রিয় তার পরিচয় হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা। আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার আলামত হচ্ছে দুনিয়া থেকে আখেরাতের পাথেয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করা।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে একান্ত বাস, মোনাজাত ও কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি অনুরক্ত হওয়া এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া। হাবীবের সাথে একান্তে বাস ও মোনাজাতের আনন্দকে সুখ মন করা এই মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর। অতএব, যে ব্যক্তির কাছে নিদ্রা ও পারস্পরিক গল্পগুজব মোনাজাতের তুলনায় উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক, তার মহব্বত কেমন করে সঠিক হবে? হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম যখন পাহাড় থেকে অবতরণ করেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কোত্থেকে আসলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনাবলীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ আমার সৃষ্টির কারও প্রতি অনুরক্ত হয়ো না। কারণ, আমি

দু'প্রকার লোককে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেই । এক, যে আমার ছওয়াবকে বিলম্বিত জেনে আলাদা হয়ে যায় এবং দুই, যে আমাকে বিস্মৃত হয়ে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এর পরিচয় এই যে, আমি তাকে তার নিজের হাতে সোপর্দ করি এবং দুনিয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছেড়ে দেই।

মানুষ যদি গায়রুল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে যে পরিমাণ অনুরাগ হবে, আল্লাহ্ থেকে সে পরিমাণ দূরত্ব হয়ে যাবে এবং মহব্বত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

বরখ ছিল একজন কাফ্রী গোলাম এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র। হযরত মূসা (আঃ) তার ওসিলায় বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন। তার বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ বরখ ভাল লোক। কিন্তু তার মধ্যে একটি দোষ আছে। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, তার দোষ কি? এরশাদ হল ঃ ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু তার খুব পছন্দ। সে এর প্রতি অনুরক্ত। যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, সে কোন বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হয় না।

বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ কোন এক জঙ্গলে দীর্ঘ দিন আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করে। অতঃপর সে দেখে, একটি পাখী এক গাছের উপর বাসা তৈরী করে তাতে বসে কিচিরমিচির করছে। আবেদ মনে মনে বলল ঃ এই গাছের নীচে এবাদতের জায়গা করে নিলে পাখীর ডাক শুনে মন বেশ প্রফুল্ল থাকবে। অতঃপর সে গাছের নীচে বসে এবাদত শুরু করলে আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ অমুক আবেদকে জানিয়ে দাও, সে আমার সৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তার মর্তবা হ্রাস করে দিলাম, যা আর কোন আমল দ্বারা পূর্ণ হবে না।

মোটকথা, আশেক তাকেই বলে, যে মাশুক ছাড়া প্রশান্তি পায় না। কোরআন পাকে আছে—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। শুন, অন্তরসমূহ আল্লাহকে সরণ করেই প্রশান্তি পেতে পারে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ এখানে প্রশান্তির অর্থ খুশী ও আন্তরিক অনুরাগ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্ভেজাল খোদায়ী মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করে, এ স্বাদ তাকে দুনিয়ার পেছনে ছুটাছুটি থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মহব্বত দাবী করে, অথচ রাতের বেলায় গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে তাকে, সে মিথ্যুক। যে নিজের মাহবুবের সাক্ষাত পছন্দ করে না, সে কেমন মহব্বতকারী! আমি রাতের বেলায় যারা আমাকে চায়, তাদের জন্যে বিদ্যমান থাকি। সে সাচ্চা হলে আমাকে তখন চাইত।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয় না, সে আল্লাহর আশেক নয়— আল্লাহর কালামকে মানুষের কালামের উপর, আল্লাহর সাক্ষাতকে মানুষের সাক্ষাতের উপর এবং আল্লাহর এবাদতকে জনসেবার উপর।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছু হাত-ছাড়া হয়ে যায়, তার জন্য পরিতাপ না করা। কিন্তু কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গেলে সেজন্য নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করা এবং গাফেল হওয়ার সাথে সাথে তওবা ও এস্তেগফার করা কর্তব্য। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিছু সংখ্যক বান্দা তাঁকে মহব্বত করার পর তাঁকে নিয়েই প্রশান্ত। বেহাত বস্তুর জন্যে তারা কোন দুঃখ করে না।

মহব্বতের এক আলামত আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং এবাদতে কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বিশ বছর পর্যন্ত রাতের বেলায় বিপদ সহ্য করেছি। এরপর এর মাধ্যমে বিশ বছর আনন্দ করেছি। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ মহব্বতের আলামত সর্বদা প্রফুল্ল থাকা এবং এমন চেষ্টা করা, যাতে দেহ ক্লান্ত হয় এবং অন্তর ক্লান্ত না হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ আসলে মহব্বতের কোন ক্লান্তি নেই। জনৈক আলেম বলেন ঃ মহব্বতকারী অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলেও এবাদতে কখনও তৃপ্ত হয় না। বাস্তব জগতেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আশেক তার মাশুকের মহব্বতে চেষ্টা করতে ত্রুটি করে না এবং তার খেদমত করাকে আন্তরিকভাবে ভাল মনে করে। দেহের জন্য

কষ্টকর হলেও সে এতেই আনন্দ পায়। দেহ অক্ষম হয়ে গেলে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে, যাতে আবার খেদমতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত প্রবল হয়ে গেলেও তেমনি এবাদত ও খেদমতের চেয়ে উত্তম কোন কিছু থাকে না। যে বস্তুর মহব্বত মানুষের মধ্যে প্রবল হয়, তা তার নীচের বস্তুকে নির্মূল করে দেয়। উদাহরণতঃ কারও মহব্বত ধন-সম্পদের মহব্বতের তুলনায় বেশী হলে তার জন্যে ধন-সম্পদ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। জনৈক খোদাপ্রেমিক তার জানমাল সমস্তই উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করা হল ঃ মহব্বতে তোমার এ অবস্থা কিরূপে হল? সে উত্তর দিল ঃ আমি একদিন এক আশেকের নির্জনে তার মাশুকের সাথে একথা বলতে শুনেছিলাম— আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে সর্বান্তকরণে ভালবাসি। কিন্তু তুমি কেন জানি মুখ ফিরিয়ে রাখ। মাশুক বলল ঃ যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে বল আমার জন্যে কি ব্যয় করবে? আশেক বলল ঃ প্রথমে আমি যেসব বস্তুর মালিক, সেগুলো সব তোমাকে দিয়ে দেব। এরপর তোমার জন্যে আমার প্রাণ উৎসর্গ করব। তুমি সম্মত হয়ে যাও। এই কথাবার্তা শুনে আমি ভাবলাম, যদি মানুষ মানুষের জন্যে এরূপ করতে পারে, তবে মাবুদের সাথে বান্দার কিরূপ করা উচিত। আমার মহব্বতের উন্নতির এটাই কারণ।

আল্লাহ্ তা'আলার সকল বান্দার প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু হওয়াও মহব্বতের একটি লক্ষণ। আল্লাহ্ পাক বলেন—

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের উপর কঠোর এবং পরস্পর দয়ালু।

এ ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনায় প্রভাবিত না হওয়া উচিত এবং আল্লাহর জন্যে ক্রুদ্ধ হওয়ার পথে কোন বাধা না থাকা কর্তব্য। এক হাদীসে কুদসীতে ওলীদের এ গুণই উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে— তারাই আমার ওলী, যারা আমার মহব্বতে পাগলপারা, যেমন শিশু কোন বস্তুর জন্যে পাগলপারা হয়ে থাকে। তারা আমার যিকিরের দিকে এমন ধাবিত হয়, যেমন পশু-পাখি তাদের বাসার দিকে ধাবিত হয়। তারা আমার নিষিদ্ধ কাজকর্ম দেখে ক্রোধে বাঘের মত গর্জন করে; মানুষ কম

না বেশী, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এই দৃষ্টান্তটি অনুধাবন করা দরকার। শিশুর মন কোন বস্তুতে লেগে গেলে সে তা থেকে কখনও আলাদা হয় না। কেউ সেই বস্তু নিয়ে গেলে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সে চীৎকার করতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার সময়ও বস্তুটি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ঘুমায়। জাগ্রত হলে আবার হাতে তুলে নেয়। বস্তুটি হারিয়ে গেলে কাঁদে এবং পেয়ে গেলে হাসতে থাকে। বাঘও ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ক্রোধের তীব্রতায় সে নিজেকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অতএব, এগুলো হচ্ছে মহব্বতের আলামত। যার ভেতরে এসব বিষয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তার মহব্বত পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি। আর যার মহব্বতে গায়রুল্লাহর মহব্বতের মিশ্রণ থাকবে, সে আখেরাতে মহব্বত পরিমাণই শাস্তি পাবে।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের অর্থ ঃ পূর্বেই লিখিত হয়েছে, অনুরাগ, ভীতি ও আগ্রহ মহব্বতের অন্যতম ফল। কিন্তু এসব ফল অবস্থা ভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যখন মহব্বতকারী আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা বুঝে নেয় এবং অবস্থাটি প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন অন্তর তাঁর অন্বেষণে উত্তেজিত থাকে। অন্তরের এই উত্তেজনাকে "শওক" তথা আগ্রহ বলা হয়। যখন মহব্বতকারীর উপর খোদায়ী সৌন্দর্য ও নৈকট্যের আনন্দ প্রবল হয়, তখন অন্তরের এই আনন্দ ও খুশীর ভাবকে "উন্স" তথা অনুরাগ বলা হয়। মহব্বতকারীর দৃষ্টি কখনও মাহবুবের শক্তি, অমুখাপেক্ষিতা, বেপরওয়াভাব ইত্যাদি গুণাবলীর প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং এগুলো জানার কারণে মনে ব্যথা থাকে। অন্তরে এ ধরনের দুঃখের ভাব প্রবল হয়ে গেলে তাকে বলা হয় 'খওফ' তথা ভীতি।

যার মধ্যে অনুরাগ প্রবল, সে নির্জনতাপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম পাহাড় থেকে অবতরণ করলে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনি কোত্থেকে আসছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে।

যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হয়, গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া তার জন্যে অপরিহার্য। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেন, তখন কিছুদিন পর্যন্ত মানুষের কথাবার্তা শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এর কারণ, মাহবুবের কথা ও তাঁর প্রতি অনুরাগ এত মিষ্ট যে, অন্য বস্তুর মিষ্টতা অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী করেন— হে

দাউদ, আমারই আগ্রহী এবং আমারই প্রতি অনুরাগী হও। অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হও।

আবদুল ওয়াহেদ ইবন যায়দ বলেন— আমি জনৈক দরবেশের কাছে গিয়ে বললাম ঃ তুমি খুব নির্জনতা পছন্দ কর? সে বলল ঃ মিঞা সাহেব, আপনি যদি নির্জনতার স্বাদ আস্বাদন করেন, তবে নিজেকেও ঘৃণা করতে শুরু করবেন। নির্জনতাই তো এবাদতের মূল শিকড়। আমি শুধালাম ঃ তুমি নির্জনতার সর্বনিম্ন উপকার কি পেয়েছ? সে বলল ঃ মানুষের তোষামোদ থেকে মুক্তি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা। আমি বললাম ঃ মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরাগের মিষ্টতা কখন পায়? সে বলল ঃ যখন মহব্বত পরিষ্কার এবং আদান-প্রদান খাঁটি হয়। আমি শুধালাম ঃ মহব্বত কখন পরিষ্কার হয়? সে বলল ঃ যখন এবাদতে কোন চিন্তা অবশিষ্ট না থাকে।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের বিশেষ আলামত হচ্ছে জনকোলাহলে অস্বস্তিবোধ করা এবং খোদায়ী এবাদতের মিষ্টতা আস্বাদনে তীব্র লোভী হওয়া। এমতাবস্থায় অনুরাগী ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করলেও এমনভাবে করবে যেন সে জনসমাবেশের মধ্যেও একা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ অনুরাগী ব্যক্তিরা কেবল দৈহিকভাবে দুনিয়াকে সঙ্গ দেয়। তাঁদের আত্মা উচ্চতম প্রাসাদে নিবদ্ধ। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার নায়েব এবং তাঁর ধর্মের প্রতি আহ্বায়ক।

অনুরাগের প্রাবল্য ঃ অনুরাগ যখন স্থায়ী, প্রবল ও মযবুত হয়ে যায়, তখন তা মোনাজাতে এক প্রকার সন্তুষ্টি ও খোলাখুলি ভাব সৃষ্টি করে, যা মাঝে মাঝে বাহ্যত মন্দ হয়ে থাকে। কারণ, এতে থাকে দুঃসাহস ও নির্ভীকতা। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরাগের স্তরে অবস্থান করে, তার এই খোলাখুলি ভাব সহ্য করে নেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে অবস্থান না করে কথায় ও কাজে অনুরাগীদের ন্যায় সাহসিকতা দেখায়, সে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। বরখে আসওয়াদের মোনাজাত এর দৃষ্টান্ত। তার সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ করা হয় যে, বনী ইসরাঈলের নিমিত্ত বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে তাকে অনুরোধ কর। বরখে আসওয়াদের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

বনী ইসরাঈলের দেশে সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ বিরাজ করলে হযরত মূসা (আঃ) সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির দোয়া

করতে বের হন এবং দোয়া করেন। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন— যারা গোনাহে আচ্ছন্ন, আন্তরিকভাবে পাপিষ্ঠ, বিশ্বাস ছাড়াই দোয়া করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে না, তাদের দোয়া আমি কেমন করে কবুল করব? তুমি আমার এক বান্দার কাছে যাও। যার নাম বরখ। তাকে বল বাইরে এসে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে, যাতে আমি কবুল করি। হযরত মূসা (আঃ) বরখের খোঁজ নিলে কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। একদিন তিনি জনৈক হাবশী গোলামকে পথিমধ্যে দেখতে পেলেন। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে সেজদার ধূলি লেগেছিল এবং গলায় একটি চাদর জড়ানো ছিল। তিনি খোদা প্রদত্ত নূরের মাধ্যমে তাকে চিনলেন এবং নাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে বলল ঃ আমার নাম বরখ। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমি তো দীর্ঘদিন ধরে তোমাকেই খুঁজছি। আমার সঙ্গে চল এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া কর। বরখ তার সঙ্গে বের হল এবং এভাবে দোয়া করল ঃ এলাহী, এটা তোমার কাজও নয়, হুকুমও নয়। তোমার কি হল যে, অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে রেখেছ? তোমার নিকটস্থ নদী-নালা শুকিয়ে গেছে কি? না বায়ু তোমার আনুগত্য স্বীকার করছে না? না গোনাহগারদের প্রতি তোমার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে? গোনাহগারদের সৃষ্টি করার পূর্বে তুমি ক্ষমাকারী ছিলে না কি? তুমিই তো রহমত সৃষ্টি করেছ এবং অনুগ্রহের আদেশ করছ। এখন কি আমাদেরকে দেখাচ্ছ যে, তোমার কাছ পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না? মোটকথা, সে দোয়ার মধ্যে এমনি ধরনের উচিত-অনুচিত কথাবার্তা বলতে লাগল। অবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং বনী ইসরাঈল সিক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলার আদেশে ঘাস গজিয়ে উঠল এবং দ্বিপ্রহর অবধি উরু পর্যন্ত উঁচু হয়ে গেল। এরপর বরখ স্বস্থানে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে সে বলল ঃ আমি আমার রবের সঙ্গে কেমন বিবাদ করেছি! তিনি আমার সাথে ইনসাফ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন— বরখ আমাকে দিনে তিনবার হাসায়।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— একবার বসরায় অগ্নিকাণ্ডে অনেক কুঁড়েঘর ভস্মীভূত হয়ে গেল; কিন্তু সেগুলোর মাঝে একটি কুঁড়েঘর সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেল। তখন বসরার গভর্নর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী

(রাঃ)। তিনি এই অভূতপূর্ব ঘটনার সংবাদ পেয়ে সে কুঁড়েঘরের মালিককে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল সে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তোমার কুঁড়েঘর জ্বলেনি কেন? সে বলল ঃ আমি আমার ঘরটি ভস্মীভূত না করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে কসম দিয়েছিলাম। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হবে, যাদের মাথার কেশ থাকবে বিক্ষিপ্ত এবং পোশাক হবে মলিন। কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন বিষয়ে কসম দিলে আল্লাহ্ তা বাস্তবায়িত করে দেখাবেন।

হযরত হাসান থেকে আরও বর্ণিত আছে, বসরায় একবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলে আবু ওবায়দা খাওয়াস সেখানে আগমন করলেন এবং আগুনের উপর চলতে লাগলেন। বসরার শাসনকর্তা আরয করলেন ঃ দেখুন, আপনি জ্বলে না যান। তিনি বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আগুনে না জ্বালানোর জন্যে আমি আল্লাহ্ পাককে কসম দিয়ে রেখেছি। শাসনকর্তা বললেন ঃ তাহলে আগুনকেও নিভে যাওয়ার জন্যে কসম দিন। তিনি আগুনকে কসম দিলেন এবং তা নিভে গেল।

একদিন আবু হাফস (রঃ) পথ চলছিলেন, এমন সময় এক ধোপা সামনে এল। সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উপর কি বিপদ এল? সে বলল ঃ আমার একমাত্র সম্বল গাধাটি হারিয়ে গেছে। এখন আমি কি করি? একথা শুনে আবু হাফস থেমে গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরয করলেন ঃ তোমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি এক পা-ও সামনে এগুব না যে পর্যন্ত তুমি এই ব্যক্তির গাধা তার কাছে পৌছিয়ে না দেবে। একথা বলার সাথে সাথে গাধা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তিনি সামনে এগুলেন।

এগুলো হচ্ছে অনুরাগীদের কর্মকাণ্ড। অন্যদের এরূপ করার অধিকার নেই। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) বলেন ঃ অনুরাগীরা তাঁদের কথাবার্তায় ও নির্জন মোনাজাতে এমন সব কথা বলেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে কুফর হয়ে থাকে। তারা এগুলো শুনলে অনুরাগীদেরকে সোজা কাফের বলতে শুরু করবে। অথচ এসব বিষয়ে অনুরাগীরা নিজেদের উন্নতি অনুভব করেন। তাদের জন্যেই এসব কথাবার্তা শোভনীয়— অন্যদের জন্যে নয়।

এমনটাও অসম্ভব নয় যে, একই কথার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট— যদি উভয়ের অবস্থান তথা মকাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে কোরআন পাকে এ বিষয়ে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাকের সমস্ত কিস্সা-কাহিনী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের অমূল্য ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কিছু নয়। আর যারা স্বল্পবুদ্ধি তাদের কাছে এগুলো নিছক কিসসা-কাহিনী। উদাহরণতঃ প্রথম কিস্সা হচ্ছে হযরত আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসের। গোনাহ্ ও বিরুদ্ধাচরণে তারা উভয়েই অংশীদার ছিলেন। কিন্তু যে গোনাহের পর ইবলীস রহমত থেকে বিতাড়িত হল এবং অভিশাপের বেড়ি গলায় পরল, সে গোনাহের পরই হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ হল—

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى-

অর্থাৎ, আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল। ফলে, সে পথভ্রষ্ট হল। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথপ্রদর্শন করলেন।

আল্লাহ তা'আলা রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে এক বান্দার প্রতি মনোনিবেশ করাও অন্য বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন। অথচ তারা উভয়েই ছিল আল্লাহর বান্দা; কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এরশাদ হয়েছে—

وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى-

অর্থাৎ, যে আপনার কাছে সোৎসাহে ও ভয়ার্তচিত্তে আসল, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।

আর অন্য বান্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى -

অর্থাৎ, যে বিত্তশালী, আপনি তার প্রতি মনোযোগী।

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এক শ্রেণীর লোকের সাথে বসতে বলা হয়েছে এবং অন্য একশ্রেণীর লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে আছে—

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ -

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনি বলুন, তোমাদের প্রতি সালাম।

আরও এরশাদ হয়েছে—

فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ -

অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের পালনকর্তাকে ডাকে।

অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে—

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াত সম্পর্কে প্রলাপোক্তি করে, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রলাপোক্তি করে। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।

এমনিভাবে কোন কোন বান্দার পক্ষ থেকে মহব্বতের ছলনা ও গর্ব সহ্য করা হয় এবং কোন কোন বান্দার তরফ থেকে সহ্য করা হয় না। উদাহরণতঃ হযরত মূসা (আঃ) অনুরাগের আনন্দের ছলে আরয করেছিলেন ঃ

اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ

অর্থাৎ, এগুলো সব তো তোমার পরীক্ষা, যা দ্বারা যাকে ইচ্ছা গোমরাহ কর এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখাও।

যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি জওয়াবে ওযর স্বরূপ বললেন ঃ

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ

অর্থাৎ, আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধের দাবী আছে। তাই আমার আশংকা হয়, তারা আমাকে হত্যা করবে।

এ ধরনের জওয়াব মূসা (আঃ) ছাড়া অন্যের মুখ দিয়ে বের হলে তা বে-আদবী বলে গণ্য হবে। তবে অনুরাগের স্তরে অবস্থানকারীর প্রতি নম্রতা করা হয়। অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) অনুরাগের স্তরে ছিলেন না। তাই তাঁর তরফ থেকে এর চেয়ে কম অভিমানকেও বরদাশত করা হয়নি এবং তাঁকে শাস্তিস্বরূপ মাছের পেটে বন্দী করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্যে এই ঘোষণা হয়ে যায়—

لَوْلَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ -

অর্থাৎ, যদি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নেয়ামত তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত হয়ে জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্তই হয়েছিল।

হযরত হাসান বলেন ঃ এখানে "জনশূন্য প্রান্তর" হল কিয়ামত। আমাদের রসূলে করীম (সাঃ)-কে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ -

অর্থাৎ, অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় এবং মৎস্যওয়ালা ইউনুসের মত অধৈর্য হবেন না। সে বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় ডাক দিয়েছিল।

রিযার স্বরূপ ও ফযীলত ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, রিযা তথা সন্তুষ্টি মহব্বতের অন্যতম ফল এবং নৈকট্যশীলদের একটি উচ্চতম মকাম। এর স্বরূপ অনেকেরই অজানা। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে যথার্থ জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করেছেন, তারাই এর সামঞ্জস্য ও অস্পষ্টতার সমাধান ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। অতএব রিযার স্বরূপ, ফযীলত ও রিযাবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

রিযার ফযীলত সম্পর্কে আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

অর্থাৎ, অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হতে পারে।

চূড়ান্ত অনুগ্রহ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি। এটা তখনই হয়, যখন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ-

অর্থাৎ, বসবাসের উদ্যানসমূহে পরিচ্ছন্ন ভবন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিজের সন্তুষ্টিকে বসবাসের জান্নাত থেকে বৃহৎ বলেছেন। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিই জান্নাতবাসীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে মুমিনদের জন্যে জ্যোতি বিকিরণ করবেন এবং বলবেন ঃ আমার কাছে প্রার্থনা কর। মুমিনরা আরয করবে— আমরা তোমার রিযা চাই। দীদারের পর এই রিযা প্রার্থনা করা থেকে রিযার অসাধারণ ফযীলত জানা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বান্দার সন্তুষ্টির অর্থ পরে উল্লিখিত হবে। এখানে বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এর অর্থ বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থের কাছাকাছি, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচিত করা জায়েয নয়। কারণ, এ

বিষয়টি উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ। যে ব্যক্তি এটা অর্জন করতে সক্ষম, তাকে অন্যের বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। সে নিজে নিজেই এর স্বরূপ জেনে নেয়।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার দীদারের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। দীদার লাভের পর জান্নাতীরা যে রিযা প্রার্থনা করেছে, তার কারণ রিযা হল, স্থায়ী দীদারের উপায়। তাই তারা রিযা প্রার্থনা করে যেন এটাই প্রার্থনা করেছে যে, আমাদের দীদার স্থায়ী হোক।

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

অর্থাৎ, আমার কাছে আরও বেশি আছে।

আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির তাফসীর প্রসঙ্গে জনৈক তাফসীরকার লিখেন— জান্নাতীদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনটি উপঢৌকন আসবে। এক, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এমন একটি হাদিয়া, যার তুলনা জান্নাতীদের কাছে থাকবে না। এই হাদিয়ার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে —

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ -

অর্থাৎ, তাদের জন্যে যে কি চোখের শান্তি নিহিত রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না।

দ্বিতীয় উপঢৌকন হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম। এটা হবে প্রথম হাদিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

অর্থাৎ, দয়ালু পালন কর্তার পক্ষ থেকে সালাম বলা হবে। তৃতীয়, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটা হাদিয়া ও সালাম উভয়টি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ পাক বলেন—

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ।

এ থেকে খোদায়ী সন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। রিযার ফযীলত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদল সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি? তারা আরয করলেন ঃ আমরা ঈমানদার। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের ঈমানের লক্ষণ কি? তারা আরয করলেন ঃ আমরা বালা মুসীবতে সবর করি, স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করি এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। অন্য এক হাদীসে আছে—

طوبى لمن هدى الى الاسلام وكان رزقه كفافا ورضى به

অর্থাৎ, মোবারকবাদ সে ব্যক্তিকে, যাকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করা হয়, যার রুযী প্রয়োজন পরিমাণে এবং সে তাতে রাযী।

আরও এরশাদ হয়েছে—

من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل -

অর্থাৎ, যে অল্প রিযিকে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ অল্প আমলে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

আরও বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের একদল লোকের প্রতি কৃপা করবেন। তারা তাদের কবর থেকে উড়ে জান্নাতের দিকে যাবে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেখানে আনন্দ-উল্লাস করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে— তোমরা কি পুলসিরাত পার হয়ে এসেছ? তারা জওয়াব দেবে— আমরা তো পুলসিরাত দেখিওনি। আবার প্রশ্ন করা হবে— তোমরা কি দোযখ দেখেছ? তারা বলবে, আমরা তো কিছুই দেখিনি। ফেরেশতারা বলবে— তাহলে তোমরা কোন্ পয়গাম্বরের উম্মত? তারা বলবে— আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত। তারা শুধাবে, আমরা কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য বল দুনিয়াতে তোমাদের আমল কি ছিল? তারা জওয়াব দিবে— দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে দুটি

চরিত্র বিদ্যমান ছিল, যে কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায় আমরা এ মর্তবায় পৌঁছেছি। প্রথম, আমরা যখন একাকী থাকতাম, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করতে লজ্জাবোধ করতাম। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্যে যা নির্দিষ্ট করতেন, তাতেই আমরা রাযী থাকতাম। ফেরেশতারা বলবে, তাহলে তো তোমাদের এ অবস্থা হওয়াই উচিত। অন্য এক হাদীসে আছে—

يامعشر الفقراء اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروابثواب فقركم وا لا فلا -

অর্থাৎ, হে দরিদ্র শ্রেণী, তোমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্টি নিবেদন কর। তা হলে দারিদ্র্যের সওয়াব লাভে সফল হবে। অন্যথায় নয়।

একবার বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমাদের জন্যে এমন কোন কাজের কথা জিজ্ঞেস করুন, যা করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী, তারা যা বলে তা আপনি শুনেছেন। আদেশ হল ঃ হে মূসা, তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, যাতে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এরশাদ করেন—

من احب ان يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر ما لله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث انزله العبد من نفسه -

অর্থাৎ, সে পছন্দ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার যা আছে, তা জেনে নেবে, সে যেন দেখে, তার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে কি আছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে নিজের কাছে সে স্তরে রাখেন, যে স্তরে বান্দা নিজের কাছে আল্লাহ্ তা'আলাকে রাখে।

হযরত মূসা (আঃ) তার মোনাজাতে আরয করলেন ঃ ইলাহী! তোমার

সৃষ্টির মধ্যে কে তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? এরশাদ হল— যার কাছ থেকে আমি তার প্রিয়বস্তু নিয়ে নিলে সে আমার সাথে অনরঙ্গ সম্বন্ধ রাখে। মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ সে ব্যক্তি কে, যার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হও? এরশাদ হল— যে কোন কাজে আমার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে, এরপর যখন আমি আদেশ দিয়ে দেই, তখন সে নাখোশ হয়। অন্য এক রেওয়ায়েত আরও কঠোর। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যে ব্যক্তি আমার দেয়া মুসীবতে সবর করে না, আমার নেয়ামতের শোকর করে না এবং আমার ফয়সালায় রাযী থাকে না, তার উচিত আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নেয়া। এরই অনুরূপ একটি হাদীসে কুদসী রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি তাকদীর নির্ধারণ করেছি এবং কাজকর্ম সংহৃত করেছি। এখন যে রাযী হবে, তার প্রতি আমি রাযী আমার সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত, আর যে নাখোশ হবে, তার জন্যে আমার অসন্তুষ্টি আমার কাছে আসা পর্যন্ত। অন্য এক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ রয়েছে— আমি ভাল-মন্দ উভয়টি সৃষ্টি করেছি। এখন সে ব্যক্তি ভাল, যাকে আমি কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করি। আর সে ব্যক্তি মন্দ, যাকে আমি অমঙ্গলের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং অমঙ্গলের পথে চালনা করি। সে ব্যক্তির জন্যে ধ্বংসই ধ্বংস, যে বিতর্ক ও প্রশ্ন করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন— হে দাউদ, তুমি বাসনা কর, আমিও বাসনা করি; কিন্তু হবে তাই, যা আমি বাসনা করি। যদি তুমি আমার বাসনায় রাযী থাক, তবে তোমার বাসনার জন্যে আমি যথেষ্ট হব। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার বাসনা অমান্য কর, তবে তোমার বাসনায় আমি তোমাকে পরিশ্রমে ফেলে দেব; এরপর হবে তাই, যা আমি চাইব।

মনীষীদের উক্তিসমূহেও রিযার অনেক ফযীলত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম যাদেরকে জান্নাতে ডাকা হবে, তারা হবে এমন লোক, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় রাযী থাকে।

মায়মূন ইবনে মহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী হয় না, তার নির্বুদ্ধিতার কোন প্রতিকার নেই। আবদুল আযীয ইবনে আবু রোয়াদ (রঃ) বলেন ঃ সিরকা দিয়ে যবের রুটি খাওয়া ও পশমী

পোশাক পরার মধ্যে জাঁকজমক নেই; বরং জাঁকজমক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকার মধ্যে।

এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের পায়ে যখম দেখে বলল ঃ এই যখমের কারণে আপনার প্রতি আমার করুণা হয়। তিনি বললেন ঃ এই যখম হওয়ার পর থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর করছি যে, এটা আমার চোখে হয়নি।

বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে বর্ণিত আছে— জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার এবাদত করে। তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, অমুক মহিলা— যে ছাগল চরায়, সে জান্নাতে তোমার সঙ্গিনী হবে। আবেদ পর দিন সেই মহিলার খোঁজে বের হল এবং লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সন্ধান পেল। সে মহিলার আমল দেখার উদ্দেশ্যে তিন দিন তার বাড়িতে অবস্থান করল। এ সময় আবেদ নিজে সারারাত দাঁড়িয়ে এবাদত করত; কিন্তু মহিলা আরামে ঘুমিয়ে থাকত। দিনের বেলায় আবেদ রোযা রাখত, আর মহিলা পানাহার করত। একদিন আবেদ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার এ ছাড়া আরও কোন আমল আছে কি? মহিলা বলল ঃ আর কিছু নেই। আপনি যা দেখেছেন, তাই। আমি নিজের মধ্যে অন্য কোন আমল জানি না। আবেদ বলল ঃ ভাল করে স্মরণ করে বল আরও কোন আমল আছে কিনা? হাঁ আমার মধ্যে আর একটি ছোট-খাটো অভ্যাস আছে। তা এই যে, আমি সংকটে পড়ে কোন সময় বাসনা করি না যে, আমার অবস্থা আরও ভাল হোক। রুগ্ন হয়ে আশা করি না যে, সুস্বাস্থ্য ফিরে আসুক। যদি রৌদ্রে থাকি, তবে ছায়ার প্রত্যাশী হই না। এ কথা শুনে আবেদ নিজের মাথায় হাত রেখে বলল ঃ এটা ছোটখাটো অভ্যাস নয়; বরং এতই বড়, যা অর্জন করতে আবেদ অক্ষম।

জা'ফর ইবনে সোলায়মান হযরত রাবেয়া বসরীকে প্রশ্ন করলেন ঃ বান্দা আল্লাহর প্রতি রাযী— একথা কখন বলা যায়? তিনি বললেন ঃ যখন বিপদেও ততখানি খুশী হয়, যতখানি নেয়ামত পেয়ে হয়।

হযরত ফুযায়ল বলতেন— আল্লাহ তা'আলার দেয়া না দেয়া উভয়ই যখন বান্দার কাছে সমান হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর প্রতি রাযী হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া রিযার পরিপন্থী নয় ঃ যে দোয়া করে, দোয়ার কারণে সে রিযার মকাম থেকে খারিজ হয় না। এমনিভাবে

গোনাহকে খারাপ মনে করা, অপরাধীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া, গোনাহের কারণসমূহকে ঘৃণা করা এবং সেগুলো দূর করার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্য পালন করাও রিযার পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে কিছু লোকের বিভ্রান্তি হয়েছে। তারা বলে, গোনাহ, নির্লজ্জ কাজ ও কুফর আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা তাকদীর বৈ নয়। অতএব, এগুলোতেও রিযা ও সন্তুষ্টি দরকার। এসব লোক শরীয়তের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। দোয়াকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এবাদতই সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের অধিক পরিমাণে দোয়া করা এ বিষয়ের প্রমাণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিযার উচ্চতম মকামে ছিলেন। দোয়া রিযার পরিপন্থী হলে তিনি অধিক পরিমাণে দোয়া কেন করতেন? আল্লাহ পাক কোন কোন বান্দার প্রশংসায় বলেন ঃ

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا -

অর্থাৎ, আগ্রহ ও ভয় সহকারে তারা আমার কাছে দোয়া করে। গোনাহকে অপছন্দ করা, তাকে খারাপ মনে করা এবং তাতে রাযী না হওয়াকেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি গোনাহে সন্তুষ্ট থাকার নিন্দা করেছেন। বলা হয়েছে—

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রশান্ত ।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ, তারা পেছনে অবস্থানকারিণী মহিলাদের সাথে থাকতে রাযী হয়েছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।

এক মশহুর হাদীসে আছে—

من شهد منكرا فرضى به كانه قد فعله -

অর্থাৎ, যে কোন অসৎকাজে উপস্থিত থাকে, অতঃপর তাতে রাযী থাকে, সে যেন নিজেই সে অসৎ কাজ করে।

অন্য এক হাদীসে আছে—

الدال على الشر كفاعله

অর্থাৎ, যে মন্দ কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, সে সে ব্যক্তির মত, যে নিজে সেটা করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ মন্দ কাজ থেকে অনুপস্থিত ও দূরে থাকে। এরপরও তার ততটুকুই গোনাহ হয়, যতটুকু যে মন্দ কাজ করে, তার হয়। শ্রোতারা আরয করল ঃ এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ এটা এভাবে যে, সে যখন সে মন্দ কাজের সংবাদ পায়, তখন তাতে রাযী থাকে। এক হাদীসে আছে— যদি এক ব্যক্তি প্রাচ্যে নিহত হয় এবং অপর ব্যক্তি পাশ্চাত্যে বসে সেই হত্যাকাণ্ডে রাযী থাকে, তবে সেও এই হত্যাকাণ্ডে অংশীদার হবে।

কাফের ও পাপাচারীদের সাথে শত্রুতা রাখা ও তাদের অস্বীকার করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, মুমিনরা মুমিনদের ছাড়া কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না।

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاۤءَ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا -

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি কিছু কিছু পাপাচারীকে কিছু কিছু পাপাচারীর সাথে মিলিয়ে দেই।

হাদীস শরীফে আছে— আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনের কাছ থেকে প্রত্যেক মুনাফিকের সাথে শত্রুতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রত্যেক মুনাফিকের কাছ থেকে মুমিনের সাথে শত্রুতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন—

من احب قوما ووالاهم حشر معهم يوم القيامة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথেই উত্থিত করা হবে।

এখানে প্রশ্ন হয়, কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকতে হবে। পাপ ও গোনাহ আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া হয় না। অতএব, পাপকে খারাপ মনে করা আল্লাহর ফয়সালাকে খারাপ মনে করা নয় কি? এই পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা কি? একই বস্তুর মধ্যে রিযা ও ঘৃণা কেমন করে একত্রিত হতে পারে? জওয়াব এই যে, যাদের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তারা অসৎকাজে চুপ থাকাকে রিযা মনে করেছে এবং এর নাম রেখেছে সচ্চরিত্রতা। অথচ এটা নিছক মূর্খতা। আসলে রিযা ও ঘৃণা যখন একই বস্তুতে একই দিক দিয়ে এবং একইভাবে হয়, তখন অবশ্য একটি অপরটির বিপরীত হয়। কিন্তু যদি এক বস্তুতে এক দিক দিয়ে রিযা এবং অন্য দিক দিয়ে ঘৃণা হয়, তবে নিশ্চিতই একটি অপরটির বিপরীত হবে না এবং তা সম্ভব। উদাহরণতঃ তোমার কোন শত্রু মারা গেল। সে ছিল তোমার অন্য এক শত্রুরও শত্রু এবং সে তোমার সেই শত্রুকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকত। বলা বাহুল্য, এমন শত্রুর মৃত্যু তোমার কাছে এ দিক দিয়ে খারাপ লাগবে যে, সে তোমার শত্রু নিধনে সচেষ্ট থাকত। আর এ দিক দিয়ে ভাল মনে হবে যে, তোমার এক শত্রু খতম হয়ে গেছে। এখানে একই শত্রুর মৃত্যু একদিক দিয়ে খারাপ হয় এবং অন্যদিক দিয়ে ভাল হল। এখানে মোটেই পরস্পর বিরোধিতা নেই।

এমনিভাবে গোনাহেরও দুটি দিক আছে। একদিক এই যে, গোনাহ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় ও ইচ্ছায় হয়। এদিক দিয়ে এতে রিযা থাকা দরকার যে, যার বস্তু, তিনি তাতে যা ইচ্ছা তাই করবেন। অপরদিক এই যে, গোনাহ বান্দার "কসব" তথা উপার্জন দ্বারা অর্জিত হয় এবং তার বিশেষণ হয়। এটা আল্লাহর কাছে "মগযুব" তথা গযবে পতিত হওয়ার কারণ। এই দৃষ্টিকোণে গোনাহ মন্দ ও নিন্দনীয়; সুতরাং ঘৃণার যোগ্য।

এ থেকে জানা গেল যে, গোনাহ থেকে বাঁচা এবং গোনাহ ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকার পরিপন্থী নয়।

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দোয়াকে বান্দার জন্যে এবাদত হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে দোয়ার কারণে অন্তরে অসহায়ত্ব, নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়। তবে অভিযোগের ভঙ্গিতে বিপদ প্রকাশ করা এবং অন্তরে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্দ জানা রিযার পরিপন্থী।

গোনাহের কেন্দ্র থেকে পলায়ন ঃ স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহামারীগ্রস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা যায়, যে এলাকায় গোনাহ্ প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখান থেকেও পলায়ন না করা উচিত। কেননা, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন হবে। এরূপ মনে করা ঠিক নয়। বরং মহামারী প্রকাশ হয়ে পড়লে পলায়ন নিষিদ্ধ করার কারণ এই যে, এর অনুমতি দেয়া হলে সুস্থ লোকজন সকলেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাবে এবং কেবল রোগাক্রান্তরা থেকে যাবে। ফলে, কোন সেবা-শুশ্রূষাকারী না থাকার কারণে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের কারণে হত, তবে যে ব্যক্তি মহীমারীগ্রস্ত এলাকার কাছে পৌছে যায়, তাকে সেখান থেকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হতো না। কেননা, এটাও আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের শামিল।

নিষেধাজ্ঞার উপরোক্ত কারণ জানার পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে এলাকায় গোনাহ্ প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখান থেকে পলায়ন করা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে গোনাহে উত্তেজিত করে এমন জায়গার নিন্দা বর্ণনা করা মানুষকে দূরে রাখার জন্যে নিন্দনীয় নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রায়ই এরূপ স্থান বিশেষের নিন্দা করেছেন। এমনী একদল বুযুর্গ বাগদাদ শহরের নিন্দায় মুখর ছিলেন। তারা যথাসম্ভব এই শহর থেকে পলায়নের চেষ্টা করতেন। হযরত ইবনে মোবারক (রঃ) বলতেন ঃ আমি পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশ ঘুরেছি; কিন্তু বাগদাদের মত মন্দ শহর কোথাও দেখিনি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে শহরটি কেমন? তিনি বললেন ঃ এই শহরে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁর প্রতি নাফরমানীকে তুচ্ছ বিষয় গণ্য করা হয়। তিনি যখন খোরাসানে পৌছেন, তখন লোকেরা তাঁকে বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমি এতে কেবল তিন প্রকার লোক

দেখেছি— ক্রুদ্ধ সিপাহী, বেদনাক্লিষ্ট বণিক ও বিস্ময়াবিষ্ট আলেম। তাঁর এই উক্তি কোন গীবত ছিল না। কেননা, তিনি এতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উচ্চারণ করেননি এবং কোন বাগদাদীকে লক্ষ্যে পরিণত করেননি; বরং এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সতর্ক করা। মক্কা যাওয়ার পথে তিনি বাগদাদে ষোল দিনের বেশী অবস্থান করতেন না। এ সময়ের মধ্যে তাঁর কাফেলা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে যেত। তিনি এই ষোল দিনের বিনিময়ে ষোল দীনার সদকা করে দিতেন। কোন কোন বুযুর্গ ইরাককে মন্দ বলতেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) এ দলভুক্ত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর এক গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুই কোথায় থাকিস? সে বলল ঃ ইরাকে। তিনি বললেন ঃ সেখানে তোর কাজ কি? আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ইরাকে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পেছনে কোন বালা লাগিয়ে দেন। হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) একদিন ইরাকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ এর দশ ভাগের নয় ভাগে পাপাচার রয়েছে, যার কোন প্রতিকার নেই। জনৈক বুযুর্গ আরও বললেন ঃ কল্যাণকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর নয় ভাগ সিরিয়ায় এবং এক ভাগ ইরাকে স্থান পেয়েছে। আর অনিষ্টের দশ ভাগের নয় ভাগ ইরাকে এবং একভাগ সিরিয়ায় স্থান পেয়েছে।

জনৈক মুহাদ্দিস বলেন ঃ আমি একদিন হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়াযের খেদমতে ছিলাম। এমন সময় জনৈক সুফী সম্মুখে এল। তিনি তাকে নিজের সাথে বসিয়ে বললেন ঃ তোমার বাড়ি কোথায়? সুফী বলল ঃ বাগদাদে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কাছে মানুষ দরবেশের ন্যায় পোশাক পরিধান করে আসে; কিন্তু যখন কোথায় থাক জিজ্ঞেস করা হয়, তখন বলে ঃ যালেমদের বাসায় থাকি। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ যদি এই সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক আমার সাথে না থাকত, তবে আমি এ শহরে থাকতাম না। লোকেরা প্রশ্ন করল, তাহলে কোথায় থাকতেন? তিনি বললেন ঃ পাহাড়ের উপত্যকায়। এক বুযুর্গকে বাগদাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সেখানকার দরবেশ পাক্কা দরবেশ আর সেখানকার দুষ্ট পাক্কা দুষ্ট।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, যে শহরে গোনাহের আধিক্য ও পুণ্যের স্বল্পতা বিরাজমান, যেখানে কেউ আটকা পড়লে তার উচিত হিজরত করা। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا-

অর্থাৎ, হিজরত করার জন্যে আল্লাহর ভূ-পৃষ্ঠ কি সুবিস্তৃত ছিল না?

যদি পরিবার-পরিজনের বাধার কারণে কেউ হিজরত করতে সক্ষম না হয়, তবে বিষণ্ন মনেই থাকা উচিত এবং সর্বদা দোয়া করা উচিত—

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

অর্থাৎ, ইলাহী! যালেম অধিবাসীদের এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নাও।

এর কারণ এই যে, যেখানে পাপাচারীদের আধিক্য হয়ে যায়, সেখানে ব্যাপক বিপদ আসে, যা ভাল-মন্দ সকলকেই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দারাও রেহাই পায় না।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً-

অর্থাৎ, তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম তাদেরকেই বিপর্যস্ত করবে না।

মোটকথা, পাপকাজে রিযা সর্বাবস্থায় নয়; বরং শুধু এ দিক দিয়ে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। নতুবা স্বয়ং পাপকাজে রাযী থাকার কোন কারণ নেই।

তিন ব্যক্তি তিন স্থানে অবস্থান করে। তাদের একজন দীদারের আগ্রহে মৃত্যুকে পছন্দ করে। দ্বিতীয়জন মাওলার খেদমতের জন্যে জীবিত থাকাকে ভাল মনে করে। তৃতীয়জন বলে ঃ আমি কেবল তাই পছন্দ করি, যা আল্লাহ্ আমার জন্যে পছন্দ করেন— তা মৃত্যু হোক অথবা জীবন। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম, এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। জনৈক ওলী-আল্লাহকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ রিযা বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তম। কেননা, তাদের মধ্যে তার ঝামেলাই সবচেয়ে কম।

একদিন ওয়াহাব ইবনে ওয়ার্দ, সুফিয়ান ছওরী ও ইউসুফ ইবনে বিসাত এক জায়গায় সমবেত হলেন। হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ অদ্যকার পূর্বে আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে খুব খারাপ মনে হত; কিন্তু আজ আমি মরে যেতে চাই। ইউসুফ ইবনে বিসাত কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কারণ, আমি ফেতনাকে ভয় করি। ইউসুফ ইবনে বিসাত বললেন ঃ আমার কাছে দীর্ঘায়ু হওয়া খারাপ মনে হয় না। আমি আশা করি, সম্ভবত এমন কোন দিন পাওয়া যাবে, যাতে তওবা নসীব হয়ে যাবে এবং কোন নেক আমল করতে পারব। অতঃপর তাঁরা হযরত ওয়াহাবকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিছুই পছন্দ করি না। যা কিছু আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রিয়, তাই আমার প্রিয়— তিনি জীবিত রাখুন অথবা ওফাত দান করুন। হযরত সুফিয়ান ছওরী উঠে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, এই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক।

আশেকগণের কাহিনী ঃ জনৈক আরেফ (আল্লাহভক্ত লোক) বলতেন ঃ যখন তুমি আমাকে দেখে ফেলেছ, তখন তা চল্লিশ জনকে দেখার সমান হয়ে গেছে। কেননা, আমি চল্লিশ জন আবদালকে দেখেছি এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা না একটা চরিত্র আহরণ করেছি। এই বুযুর্গকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আমরা শুনেছি, আপনি খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি হেসে বললেন ঃ যে খিযিরকে দেখে, তার কোন কৃতিত্ব নেই; বরং কৃতিত্ব সেই ব্যক্তির, যাকে খিযির দেখতে চায় কিন্তু সে আত্মগোপন করে।

হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ)-এর খেদমতে একবার আরয করা হল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে যে প্রত্যক্ষ করেন তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ এটা জানা তোমাদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোকেরা আরয করল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আপনি নিজের নফসের বিরুদ্ধে যে কঠোরতর মোযাজাদা করেছেন, তা আমাদেরকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করাও বৈধ নয়। তারা আরয করল ঃ তা হলে সাধনার শুরুতে আপনি যা যা করতেন, তাই বলুন। তিনি বললেন ঃ প্রথমে আমি আমার নফ্সকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহবান করলাম। সে অবাধ্যতা করল। আমি তাকে কসম দিলাম যে, এক বছর পানি পান করব না এবং নিদ্রার স্বাদ আস্বাদন করব না। অতঃপর নফ্স তা পূর্ণ করেছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বর্ণনা করেন— আমি আবু ইয়াযীদকে এশার নামাযের পর সোবহে সাদেক পর্যন্ত এভাবে বসে থাকতে দেখেছি, হাঁটু

মাটিতে রাখা, আবার উপরে পায়ের পাতা ও গোড়ালি মাটি থেকে উত্তোলিত। চিবুক বুকের সাথে সংযুক্ত এবং উভয় চক্ষু অনিমেষ উন্মীলিত। যখন সকাল নিকটবর্তী হল, তখন তিনি একটি সেজদা করে আবার বসলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! কিছু লোক তোমার কাছে প্রার্থনা করেছে এবং তুমি তাদেরকে পানিতে ও বায়ুতে চলার ক্ষমতা দান করেছ। তারা এতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমি তোমার কাছে এসব বিষয় থেকে আশ্রয় চাই। আরও কিছু লোক তোমার কাছে আবেদন করেছে। তুমি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা দান করেছ। তারা এতেই রাযী হয়েছে। আমি এ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার কাছে সওয়াল করলে তুমি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দিয়েছ। তারা এ নিয়েই খুশী হয়েছে। কিন্তু আমি তোমার কাছে এ থেকেও আশ্রয় চাই। এভাবে তিনি ওলীগণের বিশটিরও বেশী কারামতের কথা দোয়ার ভেতরে উল্লেখ করলেন। এরপর চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতেই দেখলেন, ইয়াহইয়া দণ্ডায়মান। আমি আরয করলাম ঃ খাদেম হাযির। তিনি বললেন ঃ তুমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে? আমি আরয করলাম ঃ অনেকক্ষণ ধরে। অতঃপর তিনি চুপ করে রইলেন। আমি আরয করলাম ঃ আমাকে আপনার কিছু হাল বলুন। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্যে যা উপযুক্ত তাই বলছি শুন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিম্নের আকাশে দাখিল করলেন এবং নিম্নজগত ভ্রমণ করালেন। জান্নাত থেকে আরশ পর্যন্ত যা কিছু আকাশসমূহে ছিল, সবই আমাকে দেখিয়েছেন। এরপর আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন ঃ তুমি যা যা দেখছ, এগুলোর মধ্যে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিয়ে দেব। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ, আমি এমন কোন বস্তু দেখিনি, যা ভাল মনে করে তোমার কাছে চাইতে পারি। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি আমার সাচ্চা বান্দা। তুমি ঠিক আমারই জন্যে আমার এবাদত কর। এছাড়া আরও অনেক কথা বললেন। ইয়াহইয়া ইবনে মোয়ায বলেন ঃ একথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মারেফত প্রার্থনা করলেন না কেন? আপনাকে তো এই শাহানশাহের পক্ষ থেকে বলাই হয়েছিল, যা চাইবে, তা-ই পাবে। হযরত আবু ইয়াযীদ একটি চিৎকার দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ চুপ কর। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়ে গেল, আমাকে ছাড়া কেউ যেন তাঁকে না চিনে! তাঁর মারেফত অন্যরা পাবে, এটা আমার কাছে ভাল মনে হয়নি।

বর্ণিত আছে, আবু তোরাব বখশী (রহঃ) জনৈক মুরীদকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাকে কাছে জায়গা দিতেন এবং তার খেদমত করতেন। মুরীদ এবাদতে মশগুল থাকত। একদিন আবু তোরাব তাকে বললেন ঃ আবু ইয়াযীদ বোস্তামীর সংসর্গ অবলম্বন কর। মুরীদ বলল ঃ আমার তার প্রয়োজন নেই। আবু তোরাব অধিক পীড়াপীড়ি করলে মুরীদ জোশের মুখে বলে ফেলল ঃ আমি আবু ইয়াযীদকে দিয়ে কি করব? আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি। তিনি আমাকে আবু ইয়াযীদকে দেখার মুখাপেক্ষী রাখেননি। আবু তোরাব বলেন ঃ এ কথা শুনে আমারও মন বিগড়ে গেল। আমি বেসামাল হয়ে বলে উঠলাম ঃ আল্লাহকে দেখে অহংকারী হয়ে যাও? যদি আবু ইয়াযীদকে একবার দেখ, তবে আল্লাহ তা'আলাকে সত্তর বার দেখার চেয়ে অধিক উপকারী হবে। মুরীদ অত্যন্ত হয়রান হয়ে বলল ঃ তা কেমন করে হতে পারে? আবু তোরাব বললেন— তুমি আল্লাহ তা'আলাকে নিজের কাছে দেখলে তিনি তোমার সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করেন, আর আবু ইয়াযীদকে আল্লাহ তা'আলার কাছে দেখলে আল্লাহ তা'আলা আবু ইয়াযীদের সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করবেন। মুরীদ একথার তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর বলল ঃ আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। আবু তোরাব বলেন ঃ আমরা গিয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম এই অপেক্ষায় যে, আবু ইয়াযীদ জঙ্গল থেকে বের হবেন। কেননা, তিনি তখন হিংস্র প্রাণীদের জঙ্গলে বসবাস করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু ইয়াযীদ একটি পালকযুক্ত পরিধেয় কোমরে বেঁধে বের হলেন। আমি মুরীদকে বললাম ঃ ইনি আবু ইয়াযীদ। তাঁকে দেখা মাত্রই সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আমরা তাকে নাড়া দিয়ে মৃত পেলাম। আমরা সকলে মিলে তাকে দাফন করলাম। আমি আবু ইয়াযীদের খেদমতে আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনার দিকে দেখার কারণে লোকটি মরে গেল। তিনি বললেন ঃ তা নয়; বরং তোমার মুরীদ ছিল সাচ্চা। তার অন্তরে একটি রহস্য লুকিয়ে ছিল। আমাকে দেখা মাত্রই তার মনের সব রহস্য খুলে গেল। দুর্বল মুরীদের মকামে ছিল বলে সে তা সহ্য করতে পারল না। মারা গেল।

যখন হাবশী সৈন্যরা বসরায় প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে, তখন হযরত সহলের মুরীদরা তাঁর কাছে সমবেত হয়ে আরয করে, আপনি এদেরকে হটিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। হযরত সহল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বললেন ঃ এ শহরে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বান্দা আছেন, যারা যালেমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলে সকাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কোন যালেমের অস্তিত্ব থাকবে না। একই রাত্রিতে সব খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তারা বদদোয়া করেন না। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করল ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ, যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা ভাল মনে করেন না, সেটা তাদের কাছেও ভাল লাগে না।

হযরত বিশর (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এই মর্তবায় কেমন করে পৌঁছলেন? তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতাম যাতে তিনি আমার অবস্থা গোপন রাখেন এবং কারও কাছে প্রকাশ না করেন। বর্ণিত আছে, তিনি হযরত খিযির (আঃ)-কে দেখেছেন এবং তাঁকে বলেছেন— আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। খিযির (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের আনুগত্য তোমার জন্যে সহজ করুন। তিনি বললেন ঃ আরও কিছু দোয়া করুন। খিযির (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই আনুগত্যকে মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখুন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ হযরত খিযিরকে দেখার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এজন্যে আমি একবার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করলাম। আল্লাহ্ পাক আমার দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর সাক্ষাত আমার নসীব হল। আমি তখন অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে কেবল একথাই বললাম ঃ হে আবুল আব্বাস! আপনি আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন, যা পাঠ করলে আমি মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে যাই। তাদের অন্তরে আমার কোন মান না থাকে এবং আমার ধর্মপরায়ণতা কেউ জানতে না পারে। তিনি বললেন ঃ এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اسْبِلْ عَلٰى كَثِيْفِ سِتْرِكَ وَحَطِّ عَلٰى سُرَادِقَاتِ حُجُبِكَ

وَاجْعَلْنِىْ فِىْ مَكْنُوْنِ غَيْبِكَ وَاحْجُبْنِىْ مِنْ قُلُوْبِ خَلْقِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমার উপর তোমার পুরু পর্দা ফেলে দাও। আমার উপর তোমার যবনিকা নামিয়ে দাও। আমাকে রাখ গোপন দোষের মধ্যে এবং আমাকে মানুষের অন্তর থেকে লুকিয়ে রাখ।

এরপর হযরত খিযির (আঃ) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে পুনরায়

কখনও দেখিনি এবং মনে দেখার আগ্রহও সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাঁর শিখানো দোয়া সর্বদা পাঠ করতে থাকলাম।

তাঁরই বর্ণনা অনুযায়ী এই দোয়ার প্রভাব এমনভাবে প্রতিফলিত হল যে, মানুষের মধ্যে তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা ও মূল্যহীনতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। যিম্মী তথা অমুসলিম আশ্রিতরাও তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং ধরে নিয়ে বিনা মজুরীতে নিজেদের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিত। তিনি এসব আচরণ নীরবে সহ্য করতেন। মোটকথা, তাঁর অন্তরে সুখ ও সংশোধন লাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত থাকার মধ্যে নিহিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার ওলীদের এই ছিল অবস্থা। তাদেরকে অজ্ঞাতদের মধ্যেই খোঁজ করা উচিত। কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ তাদেরকে এমন লোকদের মধ্যে তালাশ করে, যারা পরিধান করে নানা রকম কাপড়ে তালি দেওয়া পোশাক, কিন্তু জ্ঞান-গরিমা, পরহেযগারী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীগণকে গোপন রাখাই পছন্দ করেন। হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছে— আমার আওলিয়া আমার কা'বার নীচে থাকে। আমাকে ছাড়া কেউ তাদেরকে চিনে না।

সারকথা, যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা করে, তাদের অন্তর ওলীত্বের সুগন্ধি থেকে অধিকতর দূরে থাকে। আর অধিকতর নিকটবর্তী তাদের অন্তর, যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও বুঝে না যে, অপমান ও লাঞ্ছনা কি? যেমন, গোলাম অপমান বুঝে না যখন তার প্রভু তার উপরের আসনে বসে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাদের অন্তর এমন না থাকে এবং আমরা এমন আত্মা থেকে যদি বঞ্চিত হই, তবে যারা এর যোগ্য, এসব কারামতের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস না রাখা আমাদের উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ওলী হওয়া যদি কারো পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে অন্তত ওলীদের প্রতি মহব্বত ও ঈমান রাখা তো তার জন্যে সম্ভব। হয়তো বা এর দৌলতেই কিয়ামতের দিন ওলীদের সাথে তার হাশর হয়ে যাবে। প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে— المرء مع من احب —মানুষ তার সাথেই থাকবে, যাকে সে মহব্বত করে। অনুনয় ও বিনয় অধিকতর উপকারী। তার প্রমাণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি। তিনি বনী ইসরাঈলকে প্রশ্ন করেন ঃ শস্যকণা কোথায় গজায়? তারা আরয করল ঃ মাটিতে। তিনি বললেন ঃ আমি সত্য বলছি, হেকমত ও প্রজ্ঞাও সে অন্তরেই গজিয়ে উঠে, যা মাটির মত হয়।

আল্লাহ তা'আলার ওলীত্ব অন্বেষণকারী বুযুর্গগণ নিজের নফসকে লাঞ্ছনার চরম পর্যায়ে পৌছিয়েই এই মর্তবা লাভ করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর ওস্তাদ ইবনে করবনীকে এক ব্যক্তি ভোজের দাওয়াত দিল। তিনি তার ঘরের দরজায় পৌছলে তাঁকে তাড়িয়ে দিল। কিছুদূর চলে গেলে লোকটি তাঁকে আবার ডাকল। তিনি এলে আবার তাঁকে তাড়িয়ে দেয়া হল। এভাবে তিনবার ডাকল এবং তাড়িয়ে দিল। চতুর্থবার ডাকার পর যখন তিনি এলেন, তখন তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ মাফ করবেন, আমি আপনার বিনয় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আপনাকে বারবার তাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি আমার নফ্সকে বিশ বছর ধরে লাঞ্ছনায় অভ্যস্ত করেছি। ফলে, সে এখন কুকুরের মত হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দিলে চলে যায়। আবার একটি হাড্ডি ফেলে দিলে চলে আসে।

যদি তুমি আমাকে পঞ্চাশ বারও তাড়িয়ে দিতে এবং ডাকতে, তবে আমি চলে আসতাম। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ইবনে করবনীই বলেন ঃ আমি এক মহল্লায় বাস করতাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সাধুতায় খ্যাত হয়ে গেলাম। এতে আমার মন অশান্ত হয়ে উঠল। এক দিন আমি এক হাম্মামে (গোসলখানায়) গেলে সেখান থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তির মূল্যবান কাপড় নিয়ে এলাম। অতঃপর সে দামী কাপড় পরে তার উপর আমার তালিযুক্ত নানা রঙের ছেঁড়া কাপড় পরে নিলাম। রাস্তায় বের হতেই লোকেরা আমাকে পাকড়াও করল এবং আমার ছেঁড়াবস্ত্র খুলে সেই দামী পোশাক নিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, তারা আমাকে প্রচুর কিলঘুষিও মারল। এরপর থেকে আমি হাম্মাম চোর বলে খ্যাত হয়ে গেলাম এবং আমার অশান্ত মনে শান্তি ফিরে এল।

এখন চিন্তা করা উচিত, বুযুর্গগণ কেমন সাধনার স্তর অতিক্রম করতেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনোযোগ মানুষের দিক থেকে এমনকি, নিজের সত্তার দিক থেকেও ফিরিয়ে নেন। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সের দিকে লক্ষ্য রাখে, সে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে আড়ালে থাকে এবং নফ্সের দিকে এই দৃষ্টিই তার জন্যে পর্দা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক পর্দা হচ্ছে নিজের নফ্সকে নিয়ে মশগুল থাকা। সেমতে বর্ণিত আছে, বুস্তামের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামীর মজলিসে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকত। একদিন সে আরয করল ঃ

আমি ত্রিশ বছর ধরে অবিরাম রোযা রাখছি এবং রাত জেগে নফল এবাদত করছি। কিন্তু এত সাধনা সত্ত্বেও আপনি যে জ্ঞান বর্ণনা করেন, তা নিজের অন্তরে বিদ্যমান পাই না। অথচ আমি এই জ্ঞানকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং ভালবাসি। হযরত আবু ইয়াযীদ বললেন ঃ ত্রিশ বছর কেন, যদি তুমি তিনশ' বছরও রোযা রাখ এবং রাত্রি জাগরণ কর, তবু এই জ্ঞানের কণা পরিমাণও পাবে না। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ কারণ এই যে, তুমি নিজের নফসের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে আড়ালে আছ। লোকটি আরয করল ঃ তাহলে এর প্রতিকার কি? তিনি বললেন ঃ প্রতিকার আছে; কিন্তু তুমি তা কবুল করবে না। সে বলল ঃ আপনি বলুন, যাতে আমি তা পালন করতে পারি। তিনি বললেন ঃ এখনি নাপিতের কাছে গিয়ে মাথা ও দাড়ি মুণ্ডন কর। এই পোশাক খুলে কম্বলের লুঙ্গি পরিধান কর। ঘাড়ে আখরুটের একটি ঝুলি তুলে নাও। রাস্তায় গিয়ে নিজের চারপাশে লোকজনকে জড়ো কর। এরপর তাদেরকে বল ঃ যে কেউ আমাকে একটি থাপ্পড় মারবে, আমি তাকে একটি আখরুট দেব। এমনিভাবে প্রত্যেক বাজারে যাও এবং যারা তোমার পরিচিত, তাদের কাছেও যাও এবং থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে আখরুট বিলি কর। লোকটি বলল ঃ সোবহানাল্লাহ্, আপনি আমাকে এমন কথা বললেন! তিনি বললেন ঃ তোমার "সোবহানাল্লাহ্" বলা একটি শিরক। কারণ, তুমি নিজের নফসকে বড় জেনে "সোবহানাল্লাহ্" বলেছ। আল্লাহ্ তা'আলার তাযীমের জন্যে বলনি। লোকটি বলল ঃ আমি এটা করব না। অন্য কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ সর্বাগ্রে এটাই করা দরকার। সে বলল ঃ এটা করার সাধ্য আমার নেই। হযরত আবু ইয়াযীদ বললেন ঃ আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, তুমি প্রতিকার কবুল করবে না। হযরত আবু ইয়াযীদ বর্ণিত এই প্রতিকারটি সে ব্যক্তির জন্যে, যে নিজের নফসের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে কামনা করে! এই চিকিৎসা ছাড়া এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। অতএব, যে ব্যক্তি এই চিকিৎসার শক্তি রাখে না, তার কমপক্ষে এর কার্যকারিতায় বিশ্বাস রাখা উচিত। যার মধ্যে এই বিশ্বাসটুকুও নেই, তার দুর্ভোগ নিশ্চিত। হাদীস শরীফে আছে—

لايستكمل ايمان العبد حتى تكون قلة الشى احب اليه من

كثرته وحتى يكون ان لايعرف احب اليه من ان يعرف -

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান কামেল হয় না, যে পর্যন্ত তার কাছে কোন বস্তুর স্বল্পতা আধিক্যের তুলনায় অধিক প্রিয় না হয় এবং যে পর্যন্ত খ্যাত না হওয়া তার কাছে খ্যাত হওয়ার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় না হয়। আরও আছে—

ثلاث من كن فيه استكمل ايمانه لايخاف فى الله لومة لائم ولايرى الشئ من عمله وعرض امران احد هما للدنيا والثانى للاخرة اختر امر الاخرة على امر الدنيا -

অর্থাৎ, তিনটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যায়, তার ঈমান কামেল হয়ে যায়। এক, আল্লাহ্ তা'আলার কাজে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা। দুই, লোক দেখানোর জন্যে কোন আমল না করা। তিন, সামনে দু'টি বিষয় উপস্থিত হলে— একটি দুনিয়ার ও একটি আখেরাতের— আখেরাতের বিষয়টিকে বেছে নেয়া।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—

لايكمل ايمان العبد حتى يكون فيه ثلاث خصال اذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق واذا رضى لم يدخله رحناه فى باطل واذا قد رلم يتناول ماليس له -

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান কামেল হয় না যে পর্যন্ত তার মধ্যে তিনটি স্বভাব না পাওয়া যায়। এক, যখন সে ক্রুদ্ধ হয়, তখন তার ক্রোধ তাকে হক থেকে সরিয়ে দেয় না। দুই,যখন সে খুশী হয়, তখন খুশী তাকে অসত্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় না। তিন, যখন সে শক্তিশালী হয়, তখন যা তার নয়, সে তা গ্রহণ করে না।

এগুলো হচ্ছে মুমিন হওয়ার শর্ত, যা রসূলে করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। অতএব, সে ব্যক্তির জন্যে আশ্চর্য লাগে, যে ধার্মিকতার দাবী করে অথচ এসব শর্ত থেকে কণা পরিমাণও নিজের মধ্যে পায় না। এছাড়া ঈমানের পর যে সমস্ত স্তর অর্জিত হয়, সেগুলো সে অস্বীকারও করে।

সপ্তম অধ্যায়

নিয়ত, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে ঈমানের রশ্মি ও কোরআনের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইলম ও আমল ব্যতীত দু'জাহানের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। কেননা, আলেমগণ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ধ্বংসের পথে। আবার আলেমগণের মধ্যেও যারা আমলকারী, তারা ব্যতীত সবাই ধ্বংসের পথে। আবার মুখলেস তথা নিষ্ঠাবান আমলকারী ছাড়া সকল আমলকারীও ধ্বংসের পথে। আবার নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণও মহাসংকটের সম্মুখীন।

মোটকথা, নিয়ত ব্যতীত আমল নিরেট পণ্ডশ্রম। আন্তরিকতা ছাড়া নিয়ত শুধু রিয়া, কপটতা, গোনাহ। আবার সত্যবাদিতা ছাড়া নিষ্ঠাও একটি প্রতারণা বৈ নয়। সেমতে গায়রুল্লাহর নিয়ত মিশ্রিত আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

অর্থাৎ, তারা (রিয়া মিশ্রিত) যে সকল আমল করেছিল, আমি সেগুলোর দিকে অগ্রসর হলাম, অতঃপর সেগুলোকে ধুলার ন্যায় উড়িয়ে দিলাম।

আমরা জানি না, যে ব্যক্তি নিয়তের স্বরূপ জানে না, সে কিভাবে নিয়ত সঠিক করবে? যে নিষ্ঠা সম্পর্কে অজ্ঞ, সে কিভাবে নিষ্ঠা পালন করবে এবং যে সত্যবাদিতার অর্থ বুঝে না, সে কিরূপে সত্যবাদী হবে? তাই আল্লাহর এবাদতের জন্যে প্রথমে নিয়ত শিখতে হবে, এরপর নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার স্বরূপ জানতে হবে। তাই আমরা এই তিনটি বিষয়বস্তুকে তিনটি পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তের ফযীলত

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ -

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

এ আয়াতে "এরাদা" অর্থাৎ, কামনা করার অর্থ নিয়ত করা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

انما الاعمال بالنيات ولكل امرء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يعيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه

অর্থাৎ, আমলসমূহ নিয়ত অনুযায়ীই ধর্তব্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়তে অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত সেদিকেই ধর্তব্য হবে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— আমার উম্মতের অধিকাংশ শহীদ শয্যায় মৃত্যুবরণ করবে এবং অনেকে দু'সারির মাঝে নিহত হবে। আল্লাহ জানেন তাদের নিয়ত কি ছিল! আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا -

অর্থাৎ, যদি (বিচারকদ্বয়) সংশোধনের ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ তাদেরকে তাওফীক দান করবেন।

এখানে নিয়তকে তাওফীকপ্রাপ্তির কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুখাকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। অন্তরকে দেখার কারণ এটাই যে, অন্তর হল নিয়তের স্থান। এক হাদীসে আছে, বান্দা সৎকর্ম সম্পাদন করে। ফেরেশতারা সেগুলো মোহর আঁটা থলের মধ্যে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গমন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করে। এরশাদ হয়— এই থলে দূরে নিক্ষেপ কর। কেননা, এতে যে সকল

আমল রয়েছে, সেগুলো আমার নিয়তে করা হয়নি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন, এই ব্যক্তির জন্য এ আমল লিখ, সে আমল লিখ। ফেরেশতারা আরয করে, ইলাহী! এ ব্যক্তি তো এসব আমল করেনি। আল্লাহ্ বলেন ঃ সে এসব কাজের নিয়ত করেছিল।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— মানুষ চার প্রকার। এক, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলম ও ধন-সম্পদ দিয়েছেন। সে ইলম অনুযায়ী নিজের ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করে। তা দেখে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি বলে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এ ব্যক্তির মত ইলম ও ধন-সম্পদ দান করেন, তবে আমিও তাই করব, যা সে করে। এই উভয় প্রকার মানুষ সমান সমান সওয়াব পাবে। তৃতীয় প্রকার সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। সে মূর্খতাবশত নিজের ধন-সম্পদ বাজে কাজে উড়ায়। এটা দেখে চতুর্থ প্রকার ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্ আমাকে ধন-সম্পদ দিলে আমিও তাই করব, যা এ ব্যক্তি করে। এরা উভয়েই গোনাহে সমান অংশীদার হবে। লক্ষণীয় যে, কেবল নিয়তের কারণেই সৎকর্ম ও অসৎ কর্মে অংশীদার করা হয়েছে।

আনাস ইবনে মালেকের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক যুদ্ধে যাবার সময় বলেন ঃ মদীনায় কিছু লোক রয়েছে, যারা এখানে আমরা যা কিছু করছি অর্থাৎ, বিজন বন অতিক্রম করা, জেহাদে কিছু ব্যয় করা, ক্ষুধায় কষ্ট করা ইত্যাদি সব কিছুতে আমাদের সওয়াবের অংশীদার; অথচ তারা মদীনায়ই রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তা কেমন করে? তারা যে আমাদের সঙ্গে নেই। তিনি বললেন ঃ ওযরের কারণে তারা আসতে পারেনি। তাই ভাল নিয়তের কারণে সওয়াবে শরীক হয়ে গেছে। এক হাদীসে আছে, কোন এক ব্যক্তি হিজরত করে এক মহিলাকে বিয়ে করলে সে "মুহাজিরে উম্মে কায়স" নামে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবে সে নিজের নিয়তের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় এক ব্যক্তি বালুর টিলার উপর দিয়ে গমন করে এবং মনে মনে বলে— এই বালু যদি শস্যকণা হয়ে যেত, তবে আমি তা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। আল্লাহ্ তা'আলা তখনকার নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন— এ ব্যক্তিকে বলে দাও, আল্লাহ তোমার দান কবুল করেছেন। ভাল নিয়তের কারণে তোমাকে এই সওয়াব দিয়েছেন, যা এই

পরিমাণ শস্য বন্টন করলে দিতেন। অনেক হাদীসে বলা হয়েছে—

من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা সম্পন্ন করে না, তার জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টির সামনে দারিদ্র্য তুলে ধরেন এবং সে দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে যে আখেরাতের নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে প্রাচুর্য স্থাপন করে দেন এবং তার কাম্য সামগ্রী সরবরাহ করে দেন; কিন্তু সে দুনিয়াত্যাগী দরবেশ হয়ে পরপারে পাড়ি জমায়।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়, তখন ফেরেশতারা নেমে যোদ্ধাদেরকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি দুনিয়ার জন্যে যুদ্ধ করে, অমুক আত্মগরিমার জন্যে এবং অমুক বিদ্বেষবশত যুদ্ধ করে। সাবধান, কারও সম্পর্কে বলো না যে, সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী সমুচ্চে তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আহনাফ ইবনে কায়েসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار

অর্থাৎ, যখন দু'মুসলমান নিজ নিজ তরবারি নিয়ে মারমুখী হয়ে যায়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ একজন তো হত্যাকারী হওয়ার কারণে জাহান্নামী হয়, নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামী হয়? তিনি বললেন ঃ কারণ, সে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি নির্ধারিত কোন মোহরানার উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তা শোধ করার নিয়ত না রাখে, সে যিনা করে। আর যে পরিশোধ না করার নিয়তসহ করয গ্রহণ করে, সে চোর।

নিয়তের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও বুযুর্গগণের উক্তি এরূপ ঃ হযরত

ওমর (রাঃ) বলেন— সর্বোত্তম আমল তাই, যা আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকা। যেসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে, সেগুলোতে নিয়ত সঠিক করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে লিখেন— আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার নিয়ত পূর্ণ হবে, তার জন্যে আল্লাহর সাহায্যও পূর্ণ হবে। যার নিয়তে ত্রুটি থাকবে, তার জন্যে সাহায্যও ত্রুটিযুক্ত হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক ক্ষুদ্র কাজ নিয়তগুণে বড় কাজ হয়ে যায় এবং অনেক বড় কাজ নিয়ত দোষে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন ঃ আগেকার লোকেরা নিয়ত যত্নসহকারে শিখতেন, যেমন আজকাল তোমরা আমল শিখ। হেলাল ইবনে সা'দ বলেন ঃ বান্দা ঈমানদারের মত কথাবার্তা বলে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার আমল না দেখে তাকে এবং তার কথাবার্তাকে ছাড়পত্র দেন না। যদি সে আমল করে, তবে তার পরহেযগারী দেখেন। যদি পরহেযগারীও থাকে, তবে নিয়ত দেখেন! নিয়ত সঠিক হলে তার সকল কাজ সঠিক হয়। মোটকথা, নিয়ত হচ্ছে আমলের ভিত্তি। আমল ভাল হওয়ার জন্যে নিয়ত ভাল হতে হবে। নিয়ত নিজেই উত্তম, যদিও কোন বাধার কারণে আমল না হয়।

নিয়তের স্বরূপ ঃ নিয়ত, এরাদা ও কসদ— এগুলো আরবী ভাষার সমার্থবোধক শব্দ। এটা ইলম ও আমলের মধ্যবর্তী একটি আন্তরিক গুণ। ইলম আগে এবং আমল পরে আসে। কেননা, আমল হচ্ছে এই গুণের ফল ও শাখা। বলা বাহুল্য, কোন আমল সম্পন্ন হওয়ার জন্যে তিনটি বিষয় জরুরী— ইলম, ইচ্ছা ও ক্ষমতা। কেননা, মানুষ যে কাজের ইলম রাখে না, তা করার ইচ্ছা করে না। উদাহরণতঃ মানুষ খাদ্যবস্তুকে না জানলে ও না চিনলে তা খাওয়া তার জন্যে সম্ভব নয়। খাদ্যবস্তুকে জানাও যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত তা খাওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টি না হয়। আবার আগ্রহ ও ইচ্ছাও খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত ক্ষমতা না থাকে— যেমন, পঙ্গু ব্যক্তি খাদ্য চিনে এবং তা খাওয়ার ইচ্ছাও রাখে; কিন্তু পঙ্গুত্বের কারণে খেতে পারে না। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গতিশীল হয় না। ক্ষমতা ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে এবং ইচ্ছা ইলমের পরে জাগ্রত হয়। অতএব, ইচ্ছা ও নিয়ত হল ইলম ও ক্ষমতার মধ্যবর্তী একটি গুণ।

নিয়ত আমলের চেয়ে উত্তম ঃ

نية المؤمن خير من عمله

অর্থাৎ, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

হাদীসে বর্ণিত এ উক্তির কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন— নিয়তকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ এই যে, নিয়ত একটি গোপন বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ তা জানে না। পক্ষান্তরে আমল প্রকাশ্য বিষয়। অবশ্য গোপন আমলের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এতে জনহিতকর কাজ নিয়ে চিন্তাভাবনার নিয়ত স্বয়ং চিন্তা-ভাবনার চেয়ে উত্তম হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কখনও ধারণা করা হয় যে, নিয়তের অগ্রাধিকারের কারণ হচ্ছে নিয়ত আমলের পরিণতি পর্যন্ত থাকে, আর আমল সর্বক্ষণ থাকে না। এ ধারণাও অগ্রাহ্য। কারণ, এতে অধিক আমল অল্প আমলের চেয়ে উত্তম হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নিয়ত সর্বক্ষণ থাকাও জরুরী নয়। কেননা, নামায আমলের নিয়ত কখনও কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে এবং আমল অনেকক্ষণ থাকে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, কেবল নিয়ত এমন আমলের চেয়ে উত্তম, যাতে নিয়ত থাকে না। এরূপ আমল এবাদত নয়; কিন্তু নিয়ত সর্বাবস্থায় এবাদত— আমল হোক বা না হোক। উদ্দেশ্য এই যে, যে এবাদতে নিয়ত ও আমল উভয়টি থাকে, তাতে নিয়ত আমলের তুলনায় উত্তম। সুতরাং হাদীসের অর্থ এই, মুমিনের নিয়ত যা তার এবাদতের একটি অংশ, সে আমলের চেয়ে উত্তম, যা তার এবাদতেরই অংশ।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না এদের মাংস, না এদের রক্ত; কিন্তু পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি।

বলা বাহুল্য, তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের আমল। অতএব, অন্তরের আমল সর্বাবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল অপেক্ষা উত্তম হবে। নিয়ত যেহেতু সৎকর্মের প্রতি অন্তরের প্রবণতাকে বলা হয়, তাই নিয়তের শ্রেষ্ঠত্বও জরুরী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উদ্দেশ্য অন্তরকে সৎকর্মে অভ্যস্ত করা

—১০

এবং সৎকর্মের প্রবণতাকে পাকাপোক্ত করা। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যের পরিমাপেই আমল উত্তম হবে। নিয়তে এ উদ্দেশ্য অর্জিত রয়েছে। তাই নিয়তই শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ পাকস্থলীতে ব্যথা হলে তার এক চিকিৎসা হচ্ছে উপরে ঔষধের প্রলেপ দেয়া এবং অন্য চিকিৎসা হচ্ছে ঔষধ পান করানো, যা পাকস্থলীতে পৌঁছে যাবে। এখানে ঔষধ পান করা, প্রলেপ দেয়ার তুলনায় উত্তম হবে। কেননা, ঔষধের প্রভাব পাকস্থলীতে পৌঁছানোই আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ঔষধ পান করানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়। কারণ, এতে ঔষধ পাকস্থলীর সাথে মিলিত থাকে। সুতরাং এটা অধিক উপকারী হবে।

অনুরূপভাবে এবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের পরিবর্তন ও সদগুণাবলী অর্জন— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া নয়। উদাহরণতঃ সেজদার উদ্দেশ্য মাটিতে কপাল রাখা নয়; বরং অন্তরের গুণ নম্রতাকে মযবুত ও পাকাপোক্ত করা । অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নম্রতা অনুভব করে, সে যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নম্রতা অর্জনে সহায়ক থাকার আকৃতি দেবে, তখন তার নম্রতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এতীমের প্রতি দয়ার্দ্রতা অনুভব করে, সে যখন এতীমের মাথায় হাত বুলাবে এবং আদর করবে, তখন তার অন্তরের গুণটি অধিক মযবুত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ত ব্যতীত আমল মোটেই উপকারী নয়। যেমন , কেউ এতীমের মাথায় হাত বুলায়; কিন্তু মন গাফেল থাকে কিংবা মনে করে সে কাপড়ের উপর হাত বুলাচ্ছে। এরূপ আমল দ্বারা অন্তর এতটুকুও প্রভাবান্বিত হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গাফেল অবস্থায় সেজদা করে এবং মন থাকে দুনিয়ার চিন্তায় মশগুল, তার অন্তরও প্রভাবিত হবে না এবং নম্রতা মযবুত করতেও সহায়ক হবে না। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে এ ধরনের সেজদা করা না করা সমান। এরূপ সেজদাকে বাতিল ও বেকার বলা হয়। কিন্তু সেজদার উদ্দেশ্য যদি রিয়া হয় কিংবা কোন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়, তবে তা করা না করা সমান হবে না; বরং একটি অনিষ্ট বেড়ে যাবে। আমলের চেয়ে নিয়ত উত্তম হওয়ার এটাই আসল কারণ। এ থেকে অন্য একটি হাদীসের অর্থও বুঝা যায়। বলা হয়েছে—

من هم حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকর্মের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা করে না, তার

জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

কেননা, নিয়তের অর্থ হচ্ছে সৎকর্মের প্রতি অন্তরের ঝোঁক, যা একান্ত সদগুণ। আমল দ্বারা এই গুণ অধিক জোরদার হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কোরবানীর জন্তু যবেহ করার উদ্দেশ্য গোশত ও রক্ত নয়; বরং দুনিয়ার মহব্বত থেকে অন্তরকে ফিরানো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর পথে জন্তুকে উৎসর্গ করা। এটা নিয়ত ও দৃঢ় ইচ্ছার সাথে সাথে অর্জিত হয়ে যায়। যদি কোন বাধার কারণে যবেহ নাও হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, কিছু লোক মদীনায় থেকেও জেহাদে আমাদের সাথে শরীক। কেননা, তাদের নিয়তও তাদের মত ছিল, যারা জেহাদে বের হয়েছিল। বিশেষ ওযরবশতই তারা দৈহিকভাবে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

নিয়ত সম্পর্কিত আমলের বিবরণ ঃ আমল তিন প্রকার— গোনাহ, এবাদত ও অনুমোদিত কর্ম। নিয়তের কারণে এই তিন প্রকারে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম, গোনাহের ক্ষেত্রে নিয়তের কারণে কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং انما الاعمال بالنيات অর্থাৎ, নিয়তগুণে কর্ম এ হাদীস শুনে যদি কোন মূর্খ মনে করে, গোনাহ নিয়তের গুণে এবাদত হয়ে যায়, তবে তা নিরেট ভুল হবে। উদাহরণতঃ কেউ এক ব্যক্তির খাতিরে অন্যের গীবত করলে কিংবা অন্যের মাল ফকীরকে খাইয়ে দিলে কিংবা হারাম ধন-সম্পদ দিয়ে মাদ্রাসা অথবা মসজিদ নির্মাণ করলে তা হবে মূর্খতার কাজ। নিয়তের গুণে এসব কাজের যুলুম ও গোনাহ বিলুপ্ত হবে না। বরং শরীয়তের চাহিদার বিপরীতে এসবে সৎকর্মের নিয়ত করা আলাদা গোনাহ। কেউ জেনে-শুনে এরূপ করলে সে হবে শরীয়তের দুশমন। না জেনে করলে অজ্ঞানতার কারণে গোনাহগার হবে। কেননা, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কোন্ কর্ম সৎকর্ম, তা শরীয়ত দ্বারাই জানা যায়। সুতরাং যে কাজ অসৎ, তা সৎকর্ম কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই হযরত সহল বলেন ঃ মূর্খতাবশত আল্লাহর নাফরমানীর চেয়ে বড় কোন নাফরমানী নেই, যেমন জ্ঞানবশত আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে বড় কোন আনুগত্য নেই। সারকথা, যে ব্যক্তি মূর্খতার কারণে গোনাহ দ্বারা সৎকর্মের নিয়ত করবে, তার মূর্খতাজনিত আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। তবে এক অবস্থায় গ্রাহ্য হবে, যদি সে অল্প দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে এবং

এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ না পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তবে যারা জেনে স্মরণ রেখেছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل ان يمكره على جهله ولا للعالم ان يسكت على علمه -

অর্থাৎ, মূর্খ তার মূর্খতার কারণে ক্ষমার যোগ্য হবে না। মূর্খের জন্যে মূর্খতার উপর অবস্থান করা জায়েয নয়। তেমনি আলেমের জন্যে চুপ থাকা জায়েয নয়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, "নিয়তগুণে কর্ম" হাদীসটি বিশেষভাবে এবাদত ও অনুমোদিত কর্মসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— গোনাহের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, এবাদত নিয়তের কারণে গোনাহ্ হয়ে যায় এবং নিয়তের কারণেই এবাদতও থাকে। অনুমোদিত কর্মের অবস্থাও তাই অর্থাৎ নিয়ত দ্বারা তা গোনাহ ও এবাদত উভয়টিই হতে পারে। কিন্তু গোনাহ্ কোন প্রকারেই এবাদত হতে পারে না; বরং বদ নিয়তের কারণে তা অধিকতর গুরুতর গোনাহ্ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়, এবাদত দুটি বিষয়ে নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত— বিশুদ্ধতা এবং অধিক সওয়াবপ্রাপ্তি। এবাদত বিশুদ্ধ তখন হবে, যখন আল্লাহর এবাদতের নিয়ত করা হবে— অন্য কিছুর নয়। অতএব, রিয়া তথা লোক দেখানোর নিয়ত করলে এবাদত গোনাহে পরিণত হবে। এবাদতের সওয়াব অধিক তখন হয়, যখন একই আমলে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করা হয়। এরূপ করলে প্রত্যেক নিয়তের জন্যে আলাদা এক সওয়াব পাওয়া যায়। কেননা, প্রত্যেক নিয়তই একটি নেকী। হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক নেকীর পেছনে দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে বসে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করতে পারে। প্রথমত, মসজিদে বসে পরওয়ারদেগারের যিয়ারতের নিয়ত করবে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর

ঘর। যে এখানে আসে, তার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور اكرام زائره -

অর্থাৎ, যে মসজিদে বসে, সে আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত করে। যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য যিয়ারতকারীর সমাদর করা। দ্বিতীয়ত, এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করার নিয়ত করবে, যাতে যতক্ষণ অপেক্ষা করা হয়, ততক্ষণই নামাযে থাকার সওয়াব পাওয়া যায়। কোরআন মজীদে উল্লিখিত رَابِطُوْا বাক্যে একথাই বুঝানো হয়েছে। তৃতীয়ত, কান, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গকে গোনাহ্ থেকে বিরত রেখে সংসারত্যাগী হওয়ার নিয়ত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

رهبانية امتى القعود فى المساجد -

অর্থাৎ, আমার উম্মতের সংসার ত্যাগ হচ্ছে মসজিদে বসা।

চতুর্থত, সাহসিকতাকে আল্লাহতে সীমিত করা। পঞ্চমত, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে একাকী হওয়া। হাদীসে আছে—

من غدا الى المسجد ليذكر الله تعالى اويذكر به كان كالمجاهد فى سبيل الله -

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে অথবা স্মরণের উপদেশ দেওয়ার জন্যে মসজিদে যায়, সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর অনুরূপ।

ষষ্ঠত, কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নিয়ত করবে। সপ্তমত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার নিয়ত করবে। কেননা, মসজিদে এমন লোকও থাকে, যারা নামায ভালরূপে পড়তে পারে না অথবা অবৈধ কাজকর্ম করে। অষ্টমত, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে গোনাহ্ ত্যাগ করার নিয়ত করবে। অনেক নিয়ত করার

এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। সকল এবাদতেই এরূপ মনে করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক এবাদতেই অনেক প্রকার নিয়ত করার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়, অনুমোদিত কর্মসমূহের মধ্যেও এমনি ধরনের এক অথবা একাধিক নিয়ত হতে পারে। ফলে, অনুমোদিত কাজও উৎকৃষ্ট এবাদতে পরিণত হতে পারে। বড় ক্ষতি তাদের, যারা এ বিষয়ে গাফেল। কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে, এসব কাজ কি নিয়তে করা হয়েছিল? এটা সেই অনুমোদিত কাজের বেলায়, যাতে কারাহাতের (অর্থাৎ মাকরূহ হওয়ার) মিশ্রণ নেই। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

حلالها حساب وحرامها عقاب - (এর হালালে হিসাব আছে এবং হারামে শাস্তি আছে)। মুয়ায ইবনে জাবালের হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ان العبد ليسأل يوم القيامة من كل شيئ حتى عن كحل عينه وعن فتات الطينة باصبعه وعن لمس ثوب اخيه -

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন বান্দা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, এমনকি, নিজের চোখের সুরমা, অঙ্গুলি দ্বারা মাটি খোঁড়া এবং নিজের ভাইয়ের কাপড় স্পর্শ করা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে সুগন্ধি লাগায়, সে কিয়ামতের দিন যখন উত্থিত হবে, তখন তার সুগন্ধি মেশকের চেয়েও উৎকৃষ্ট হবে। আর যে অন্যের জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন তার দুর্গন্ধ মৃতের চেয়েও বেশী হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, সুগন্ধি লাগানো একটি মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ। কিন্তু তাতে সুনিয়ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। প্রশ্ন হয় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করা একটি মানসিক আনন্দের কাজ। তা আল্লাহর জন্যে কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, যে ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করে, তার উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করা অথবা গর্ব ও প্রাচুর্য প্রকাশ করা অথবা মানুষকে দেখানো হতে পারে, যাতে মানুষের অন্তরে তার স্থান হয় এবং মানুষ তাকে খোশবুপ্রিয় ও রুচিশীল বলে আখ্যায়িত করে। যে পরনারীকে দেখে, তার খোশবু লাগানোর উদ্দেশ্য নিজের প্রতি পরনারীকে আকৃষ্ট করা হতে পারে। এসব

কারণে সুগন্ধি ব্যবহার করা গোনাহের কারণ। এ কারণেই কিয়ামতে এর দুর্গন্ধ মৃতের চেয়েও বেশী হবে। কিন্তু কেবল প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করা গোনাহ্ নয়। তবে জিজ্ঞাসা এ সম্পর্কেও করা হবে। যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তার শাস্তি হবে। যে সব নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার আল্লাহর জন্যে হয়, সেগুলো এই— জুমআর দিন খোশবু লাগিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা, আল্লাহর ঘরের তাযীমের নিয়ত করা, নিজ দেহ থেকে দুর্গন্ধ দূর করার নিয়ত করা, যাতে নিকটে উপবেশনকারীদের কষ্ট না হয়, আপন মস্তিষ্কের চিকিৎসার নিয়ত করা, যাতে সুগন্ধি দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তা করা সহজ হয়। ইমাম শাফেঈ বলেন ঃ যার খোশবু ভাল হয়, তার বুদ্ধি বাড়ে। মোটকথা, এমনি ধরনের আরও অনেক নিয়ত আছে। অন্তরে আখেরাতের তেজারত ও সৎকর্মের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হলে এরূপ নিয়ত করতে কেউ অক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে অন্তরে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা প্রবল হলে এসব নিয়ত মনে জাগ্রত হয় না।

মুবাহ তথা অনুমোদিত কর্ম যেমন গণনার বাইরে, তেমনি সেগুলোতে নিয়তেরও কোন শেষ নেই। নিম্নে বর্ণিত একটি উদাহরণ দ্বারা বাকীগুলোকে অনুমান করে নেয়া যায়। জনৈক সাধক বলেন— আমি মুস্তাহাব মনে করি যে, প্রত্যেক কাজে একটি না একটি নিয়ত করে নিই; এমনকি পানাহার, নিদ্রা, মলত্যাগ এবং অন্যান্য সব কাজে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত হওয়া চাই। কেননা, যে কাজ শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক অবসর লাভের কারণ হয়, তা ধর্মে-কর্মে সহায়ক হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি পানাহারে এবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত করে এবং স্ত্রী-সহবাসে পত্নীর মনোরঞ্জন ও সুসন্তান লাভের নিয়ত করে, সে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস দ্বারা এবাদত পালনকারী গণ্য হবে। যার মনে আখেরাতের চিন্তা প্রবল, তার জন্যে এ দু'টি প্রধান কাজে সৎকর্মের নিয়ত করা অসম্ভব নয়। এমনিভাবে যখন কারও ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন তাতেও সৎ নিয়ত করে সে ধন-সম্পদকে "ফী সাবীলিল্লাহ" বলে দেয়া উচিত। যখন শুনে যে, কেউ তার গীবত করে, তখন এ ভেবে খুশী হবে যে, এর বিনিময়ে গীবতকারী তার আমলনামা থেকে পাপ নিয়ে যাচ্ছে এবং গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকীসমূহ তার আমলনামায় চলে আসছে। কোন জওয়াব না দিয়ে এবং সম্পূর্ণ চুপ থেকে এ বিষয়ের নিয়ত করবে।

হাদীস শরীফে আছে— হিসাব-নিকাশের পর বান্দার নিজস্ব আমল যখন বেকার হয়ে যাবে এবং সে দোযখের যোগ্য হয়ে যাবে, তখন তার জন্যে সৎকর্মের এমন আমলনামা খোলা হবে, যা দ্বারা সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। বান্দা এই আমলনামা দেখে বিস্মিত হয়ে বলবে— ইলাহী, এসব আমল তো আমি কখনও করিনি। তাকে বলা হবে, এসব আমল সে লোকদের, যারা তোমার গীবত করেছিল। এখন এগুলো তুমি পেয়ে গেছ।

নিয়ত ইচ্ছাধীন নয় ঃ মূর্খ ব্যক্তি যখন নিয়তের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ শুনে, তখন সে তার যাবতীয় কাজের শুরুতে মনে মনে বলে— আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যবসায়ের নিয়ত করছি অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়ার নিয়ত করছি। এতেই সে মনে করে, বুঝি নিয়ত হয়ে গেছে। অথচ এটা মনের জল্পনা মাত্র। নিয়তের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, যে বিষয়ের সাথে মনের বর্তমান অথবা ভবিষ্যত স্বার্থ জড়িত, তার প্রতি মনের উত্তেজনা ও প্রবণতাকে বলা হয় নিয়ত। প্রবণতা না থাকলে কেবল ইচ্ছার মাধ্যমে নিয়ত হাসিল করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক কাজের সাথে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ জড়িত, তখন সে সেই কাজের দিকে মনোযোগী হয়। মনে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। উদাহরণতঃ যার বিশ্বাসে সন্তান জন্মগ্রহণের কোন ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক উদ্দেশ্য নেই, তার পক্ষে স্ত্রী-সহবাসের সময় সন্তানের নিয়ত করা সম্ভব নয়। তার সহবাসের উদ্দেশ্য হবে কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কেননা, নিয়ত উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে উদ্দেশ্য, কামবাসনা চরিতার্থ করা। অনুরূপভাবে যদি অন্তরে এ বিশ্বাস প্রবল না থাকে যে, বিবাহ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত প্রতিপালন করা হয়, তবে বিবাহে সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মুখে 'সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করলাম, বলে দিলে নিয়ত হয়ে যাবে না। হাঁ, এই নিয়ত হাসিল করার পদ্ধতি হল— প্রথমে শরীয়তের প্রতি এবং উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যাবৃদ্ধি চেষ্টা করলে যে অসীম সওয়াব হয়, সে বিষয়ের প্রতি ঈমান মযবুত করা। এরপর সন্তান লালন-পালনের কষ্ট সম্পর্কিত যাবতীয় বিরুদ্ধ ভাব মন থেকে দূর করে দেয়া। এরূপ করলে সন্তান লাভের সত্যিকার নিয়ত অর্জিত হতে পারে।

মোটকথা, নিয়তের জন্যে মনের উত্তেজনা ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের বিশ্বাস পূর্ব থেকে থাকা উচিত বিধায় অনেক পূর্ববর্তী বুযুর্গ কোন কোন সৎকাজ

সম্পাদন করতে দ্বিধা করেছেন। কারণ, তাদের মধ্যে সে সৎকাজের নিয়ত উপস্থিত ছিল না। বর্ণিত আছে, ইবনে সীরীন (রঃ) হযরত হাসান বসরীর জানাযার নামায পড়েননি এবং বলেন ঃ আমার মনে নিয়ত উপস্থিত হয় না। কুফার আলেম হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মানের ইন্তেকাল হলে হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল— আপনি তাঁর জানাযায় যাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার মধ্যে নিয়ত থাকলে অবশ্যই যেতাম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কাছে কেউ কোন সৎকর্মের অনুরোধ জানালে তারা জওয়াব দিতেন— যদি আল্লাহ্ নিয়ত দান করেন, তবে অবশ্যই করব। হযরত তাউস (রহঃ) নিয়ত ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতেন না। কেউ কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করলেও তিনি জওয়াব দিতেন না। আবার নিয়ত থাকলে জিজ্ঞাসা ছাড়া আপনা-আপনিই বর্ণনা শুরু করতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ ব্যাপার কি! কোন সময় আপনি প্রশ্নের উত্তরেও হাদীস বর্ণনা করেন না, আবার কোন সময় আপনা-আপনি বর্ণনা করেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি চাও যে, নিয়ত ছাড়াই আমি হাদীস বর্ণনা করি? যখন আমার মধ্যে নিয়ত উপস্থিত হয়, তখনই বর্ণনা করি। হযরত তাউস (রহঃ)-কে কেউ বলল ঃ আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ যখন নিজের মধ্যে নিয়ত পাব, তখন করব। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক মাস ধরে জনৈক রোগীকে দেখতে যাওয়ার নিয়ত তালাশ করছি। এখন পর্যন্ত সঠিক নিয়ত পাইনি।

আগেকার দিনের বুযুর্গগণের রীতি ছিল যে, তারা নিয়ত ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তারা জানতেন, নিয়ত হচ্ছে আমলের প্রাণ। সত্যনিষ্ঠ নিয়ত ছাড়া আমল রিয়ার নামান্তর। এরূপ আমল খোদায়ী গযবের কারণ— নৈকট্যের নয়। তারা আরও জানতেন যে, মুখে "নিয়ত করি" বলার নাম নিয়ত নয়। বরং এটা অন্তরের প্রেরণা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে উন্মোচনের স্থলবর্তী। মাঝে মাঝে অর্জিত হয় এবং মাঝে মাঝে হয় না। যার মনে অধিকাংশ সময় ধর্মীয় জ্ঞান প্রবল থাকে, তার অধিকাংশ সময় নিয়ত অর্জিত হয়। আর যার মনে দুনিয়া প্রবল থাকে, তার এটা অর্জিত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখলাসের ফযীলত

এখলাস সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

অর্থাৎ, তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল খাঁটিভাবে আল্লাহর এবাদত করতে।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ -

অর্থাৎ, সাবধান! খাঁটি এবাদত আল্লাহরই হয়ে থাকে।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ -

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তওবা করে, সংশোধিত হয়, আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করে এবং আপন এবাদতকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করে।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا -

অর্থাৎ, অতএব যে তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং নিজের পালনকর্তার এবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

এ আয়াতটি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমল করে এবং তজ্জন্যে মানুষের প্রশংসা কামনা করে না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم اخلاص العمل لله

والنصيحة للولاة ولزوم الجماعة -

অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে মর্দে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না— আল্লাহর জন্যে আমলকে খাঁটি করা, শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দেয়া এবং মুসলিম দলের সাথে থাকা।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এখলাস আমার রহস্য। আমি যাকে ইচ্ছা এই রহস্য অবগত করি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমলের স্বল্পতার জন্যে চিন্তিত হয়ো না; বরং কবুল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হও। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) একবার মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন—

اخلص العمل يجزء ك منه القليل -

অর্থাৎ, এখলাস সহকারে আমল কর। এরূপ আমল অল্পই তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে—

مامن يخلص لله العمل اربعين يوما الاظهرت ينابيع الحكم -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাস সহকারে আমল করে, তার অন্তর ও জিহ্বা থেকে প্রজ্ঞার ঝরনা প্রবাহিত হতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও এরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১) যাকে ইলম দান করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি তোমার ইলম দিয়ে কি করেছ? সে বলবে ঃ ইলাহী, দিবারাত্রি আমি এরই খেদমত করেছি। আল্লাহ বলবেন— তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার বাসনা ছিল যেন মানুষ তোমাকে আলেম বলে। অতঃপর ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ বলবেন ঃ মনে রেখ, তোমাকে দুনিয়াতে আলেম বলা হয়ে গেছে। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাকে প্রশ্ন করবেন— তুমি তোমার

ধন-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ? সে বলবে— পরওয়ারদেগার, আমি দুনিয়াতে দিবারাত্রি সদকা-খয়রাত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন— তুমি মিথ্যা বলছ। তৎসঙ্গে ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ আরও বলবেন, বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। বস্তুত তা বলা হয়ে গেছে। (৩) যে আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, আল্লাহ তাকে বলবেন— তুমি কি করেছ? সে বলবে, ইলাহী, তুমি জেহাদের নির্দেশ দিয়েছিলে। তাই আমি যুদ্ধ করেছি এবং তোমার পথে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন— তুমি মিথ্যাবাদী। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আরও বলবে— বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মানুষ তোমাকে একজন মহাবীর বলে। তা বলা হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উরুতে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ হে আবু হোরায়রা, সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তিকে দিয়েই জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে। হযরত আবু হোরায়রা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন, অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ পাক ঠিকই বলেছেন —

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেই। তারা এতে ঠকে না।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীতে বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে নিয়োজিত ছিল। একদিন কিছু লোক তার কাছে এসে বলল ঃ এখানে একটি সম্প্রদায় বৃক্ষের পূজা করে। আবেদ রাগান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ কুড়াল কাঁধে নিয়ে বৃক্ষটি কেটে ফেলার জন্যে রওয়ানা হল। পথে শয়তান এক বুড়োর বেশে তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আবেদ বলল ঃ আমি অমুক বৃক্ষটি কেটে ফেলতে চাই। বুড়ো বলল ঃ তুমি নিজের এবাদত ও কাজকর্ম ছেড়ে এ

বৃক্ষের পেছনে পড়লে কেন? এতে তোমার কি লাভ? আবেদ বলল ঃ এটাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। বুড়ো শয়তান বলল ঃ আমি তোমাকে এটা কাটতে দেব না। কথা কাটাকাটি চরমে পৌছলে আবেদ বুড়োকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসল। বুড়ো বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কিছু উপকারী কথা বলতে চাই। আবেদ দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ো বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর এ বৃক্ষ কাটা ফরয করেননি। তুমিও এর এবাদত কর না। যদি অন্য কেউ এবাদত করে, তবে তার গোনাহ তোমার উপর বর্তাবে না। ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর অনেক পয়গম্বর রয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে বৃক্ষ এলাকায় কোন পয়গম্বর পাঠিয়ে তাকে বৃক্ষ কর্তনের নির্দেশ দেবেন। যে কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তার পেছনে পড়ার প্রয়োজন তোমার আছে কি? আবেদ বলল ঃ আমি অবশ্যই বৃক্ষটি কর্তন করব। বুড়ো পুনরায় কুস্তি লড়ার ভাব প্রকাশ করলে আবেদ তাকে পুনরায় ভূতলশায়ী করে দিল এবং বুকের উপর চেপে বসল। বুড়োবেশী শয়তান অপারগ হয়ে বলতে লাগল ঃ এস, আমি তোমাকে আরও একটি কথা বলব, যা তোমার জন্যে নিশ্চিতই উত্তম ও কল্যাণকর হবে। আবেদ বলল ঃ আচ্ছা বল কি বলতে চাও। বুড়োবেশী শয়তান বলল ঃ আগে আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর বলব। আবেদ তাকে ছেড়ে দিল। বুড়ো বলল ঃ তুমি একজন অভাবী মানুষ। পরের দেয়া অন্ন ভক্ষণ কর। আমার মনে হয় অপরকে খাওয়াবার, প্রতিবেশীদের খাতির-আপ্যায়ন করার এবং অমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকার সাধ তোমার মনেও আছে। আবেদ বলল ঃ এ সাধ কার না আছে? বুড়ো বলল ঃ তা হলে এখন তুমি ফিরে যাও। আমি এখন থেকে প্রতিরাত্রে তোমার শিয়রে দু'টি দীনার রেখে দেব। ভোরে এগুলো তুলে নিও এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে সেগুলো ব্যয় করো। এটা তোমার জন্যে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যে বৃক্ষ কর্তনের তুলনায় অধিক উপকারী হবে। এ বৃক্ষটি কেটে কোন লাভ নেই। কারণ, এর জায়গায় অন্য বৃক্ষ রোপণ করা হবে এবং পূজা করা হবে। আবেদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনে মনে বলল ঃ বুড়ো ঠিকই বলেছে। আমি তো পয়গম্বর নই যে, বৃক্ষটি কাটা আমার জন্যে অপরিহার্য হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটা কাটার হুকুমও করেননি, যা না কাটলে আমি নাফরমান সাব্যস্ত হব। সে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে

উপকারও রয়েছে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে দীনারের ব্যাপারে পাকাপোক্ত চুক্তি হয়ে গেল।

আবেদ তার এবাদতখানায় ফিরে এল এবং রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে সে শিয়রের কাছে দু'টি দীনার পেয়ে তুলে নিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও তাই হল। এরপর কোনদিন সে দীনারের দেখা পেল না। সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে একদিন কাঁধে কুড়াল নিয়ে সে বৃক্ষের উদ্দেশে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে বুড়োবেশী ইবলীসও তার সামনে এসে বলল ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? আবেদ বলল, সে বৃক্ষ কর্তন করতে যাচ্ছে। ইবলীস বলল ঃ এখন তুমি সে বৃক্ষ কর্তন করতে পারবে না এবং সে পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হবে না। একথা শুনে আবেদ প্রথমবারের মত বুড়োকে মাটিতে ফেলে দিতে চাইল। বুড়োবেশী ইবলীস বলল ঃ এখন সে দিন বাসি হয়ে গেছে। অতঃপর সে আবেদকে উপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারল এবং লাথির উপর লাথি মারতে লাগল। আবেদকে তার পায়ে বলের মত মনে হচ্ছিল। এরপর ইবলীস তার ছাতির উপর বসে বলল ঃ হয় তুমি এ কাজ থেকে বিরত হবে, না হয় আমি তোমাকে যবেহ করে ফেলব। আবেদ নিজের ভেতরে মোকাবিলার শক্তি না পেয়ে হার মেনে নিল এবং বলল ঃ এখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল পূর্বে আমি কিরূপে জয়ী হয়েছিলাম এবং এখন তুমি কিভাবে জয়ী হলে? ইবলীস বলল ঃ এর কারণ, পূর্বে তুমি যা করেছিলে, তা আল্লাহর জন্যে করেছিলে এবং এখলাসের বলে বলীয়ান ছিলে। কিন্তু এখন তুমি ক্রোধ ও দুনিয়ার হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মাঠে নেমেছ। তাই আমি অনায়াসেই তোমাকে পরাভূত করে দিয়েছি।

সত্যি বলতে কি, উপরোক্ত কাহিনীতে নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যায়ন ও সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

অর্থাৎ,(শয়তান বলল ঃ) আমি অবশ্যই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। কিন্তু যারা তোমার এখলাস বিশিষ্ট বান্দা, তাদের কথা আলাদা।

কেননা, এখলাস ছাড়া বান্দা শয়তানের হাত থেকে ছাড়া পায় না। তাই হযরত মারূফ কারখী নিজেকে প্রহার করতেন এবং বলতেন— হে নফস, এখলাস অবলম্বন কর যাতে মুক্তি পাও। ইয়াকুব মককুফ বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে নেক কর্মসমূহকে গোপন করা, যেমন কুকর্মসমূহকে গোপন

করা হয়। আবু সোলায়মান বলেন, যার একটি পদক্ষেপও সঠিক হয় এবং তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ত না থাকে, সেই সুখী।

এখলাসের স্বরূপ ঃ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ থাকা সম্ভব। কোন বস্তু অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হলে,তাকে বলা হয় "খালেস" বা খাঁটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ -

অর্থাৎ, গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে নির্গত খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুপেয়।

অতএব দুধের মধ্যে গোবর ও রক্তের সংমিশ্রণ না থাকাই হচ্ছে দুধের খাঁটিত্ব। এখলাস অর্থ খাঁটি করা এবং এর বিপরীত হচ্ছে এশরাক অর্থাৎ শরীক করা। এ থেকে বুঝা যায়, যে মুখলেস নয়, সে মুশরেক। তবে শিরকের অনেক স্তর রয়েছে। তাওহীদের ক্ষেত্রে এখলাসের বিপরীত হচ্ছে উপাস্যতায় এশরাক। শিরকের মত এখলাসও কিছু গোপন এবং কিছু প্রকাশ্য। শিরক ও এখলাসের স্থান হচ্ছে অন্তর। নিয়তের মাধ্যমে উভয়টি অন্তরে উপস্থিত হয়। একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ সম্পাদিত হয় এবং তাতে অন্য কোন উদ্দেশ্যের মিশ্রণ না থাকে, তাই এখলাস হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ কেউ শুধু রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল অথবা শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান করল,আভিধানিক দিক দিয়ে উভয়টিকেই এখলাস বলা হবে। কেননা, এতে এক উদ্দেশ্যের সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ নেই। কিন্তু পরিভাষায় কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান করাকেই এখলাস বলা হয়। রিয়ার উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এখানে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখানে আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, নৈকট্য লাভের নিয়তের সাথে রিয়া অথবা অন্য কোন মানসিক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকলে তার বিধান কি হবে? উদাহরণতঃ কেউ নৈকট্য লাভের নিয়তে রোযা রাখে কিন্তু সাথে সাথে চিকিৎসার খাতিরে পরহেযের উপকারও হয়ে যায়। অথবা কেউ হজ্জ করে যাতে দেশ ভ্রমণের আনন্দও অর্জিত হয়ে যায়। কিংবা শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা হাসিল হয়ে যায়। অথবা কেউ

তাহাজ্জুদ পড়ে যাতে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে হেফাযতও হয়ে যায়। অথবা কেউ উযু করে যাতে হাত পায়ের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং দেহ ঠাণ্ডা থাকে। এসব ক্ষেত্রে নৈকট্য লাভের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকার কারণে আমলসমূহ এখলাস বহির্ভূত হয়ে যাবে এবং এসব আমলকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি বলা যাবে না। কিন্তু মানুষের কোন কাজ ও এবাদত এ জাতীয় মানসিক আনন্দমুক্ত থাকে না। তাই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সারা জীবনে খাঁটি ভাবে আল্লাহর জন্যে একটি মুহূর্তও পাবে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেননা, এখলাস অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। মনকে উপরোক্ত রূপ মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। নিরেট নৈকট্য লাভের নিয়ত সেই ব্যক্তির জন্যে কল্পনা করা যায়, যে আল্লাহর পাগলপারা আশেক, আখরাতের চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং এ ধরনের পার্থিব মহব্বতের জন্যে যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অবকাশ নেই। এমনকি, খানাপিনার প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। এগুলোর প্রয়োজন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনের বেশী নয়। এরূপ ব্যক্তি আহার, পান, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি সকল কাজের ক্ষেত্রে খাঁটি আমলকারী ও সঠিক নিয়ত বিশিষ্ট হবে। এমনকি, সে এই নিয়তে ঘুমাবে যাতে পরবর্তী এবাদতের জন্যে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় তার নিদ্রাও এবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আমলে এখলাসের উপস্থিতি খুবই বিরল হবে। এ থেকে এখলাস অর্জনের এই উপায় জানা যায় যে, জৈবিক বাসনা ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে, দুনিয়ার লোভ-লালসা ছিন্ন করতে হবে এবং অন্তরে আখেরাতের চিন্তাই প্রবল রাখতে হবে।

এমন অনেক আমল রয়েছে, যেগুলোতে মানুষ শ্রম স্বীকার করে এবং একান্ত ভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ধারণা পোষণ করে অথচ এটা মানুষের একটা বিভ্রান্তি। কেননা, এতে বিপদের কারণ তাদের জানা থাকে না। উদাহরণতঃ জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি ত্রিশ বছরের নামায কাযা পড়েছি। এগুলো আমি মসজিদের প্রথম সারিতে পড়েছিলাম। কাযার কারণ, একদিন ওযরবশত আমার মসজিদে যেতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে, আমি দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়লাম এবং মনে মনে খুব লজ্জিত হলাম যে, মুসল্লীরা আমাকে দ্বিতীয় সারিতে দেখেছে। এই লজ্জা থেকে জানতে পারলাম, লোকেরা আমাকে যে প্রথম সারিতে দেখত, তাতে আমি আন্তরিকভাবে খুশী ও আনন্দিত হতাম। অথচ পূর্বে বিষয়টি টের পাইনি।

বলা বাহুল্য, এটা এমন একটি সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয়, যা থেকে আমল কমই মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকেই এটা টেরও পায় না। আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন, তাদের কথা ভিন্ন। যারা এ থেকে গাফেল, তারা আখেরাতে নিজের সৎ আমলসমূহকে গোনাহ আকারে দেখতে পাবে। নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতে এরূপ লোকদের কথাই বুঝানো হয়েছে—

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا -

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় প্রকাশ পাবে, যার ধারণা তারা করত না এবং নিজের উপার্জিত কর্মের গোনাহ তাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا -

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে তাদের কথা কি বলব, যারা আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত! তারা এমন লোক, যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই সীমিত; অথচ তারা মনে করে তারা চমৎকার কাজ করছে।

আলেম সমাজই এই ফেতনায় সর্বাধিক পতিত। তাদের অধিকাংশের ইলম চর্চায় যে প্রেরণাটি কাজ করে, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের আনন্দ এবং তারীফ ও প্রশংসা-প্রীতি। শয়তান তাদের সামনে সত্যকে গোপন করে দেয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, তোমার উদ্দেশ্য তো খোদায়ী ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে বিরোধীদেরকে প্রতিহত করা। ওয়ায়েযরা জনসাধারণকে এবং শাসকবর্গকে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে। সাধারণ মানুষ তাদের উপদেশ মেনে নিলে এবং তাদের প্রতি মনোযোগী হলে তারা আহলাদে আটখানা হয়ে যায়। তারা বলে— আমরা এজন্য আনন্দিত যে, আল্লাহ তা'আলা ধর্মের সাহায্যের কাজে আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন। অথচ তাদের মত অন্য কোন কর্মী সৃষ্টি হয়ে গেলে, সে তাদের চেয়ে ভাল ওয়ায করলে এবং মানুষ

তার প্রতি মনোযোগী হলে তারা তাকে সহ্য করতে পারে না এবং মনে মনে দুঃখিত হয়। এখন প্রশ্ন, যদি দ্বীনের খাতিরেই তারা ওয়ায করত, তবে তাদের অবস্থা এমন হয় কেন? এক্ষেত্রে তো তাদের আরও খুশী হওয়া উচিত ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর করা দরকার ছিল যে, তিনি দ্বীনের একাজে অন্যকে নিযুক্ত করেছেন। ফলে, তাদের একাজে পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। কিন্তু শয়তান এরপরও তাদেরকে ছাড়ে না এবং বলে— তোমাদের দুঃখ এজন্য নয় যে, মানুষ তোমাদেরকে ছেড়ে অন্যের ওয়ায শুনছে; বরং দুঃখ এজন্যে যে, তোমরা সওয়াব লাভে বঞ্চিত হয়েছ। অর্থাৎ, মানুষ তোমাদের ওয়ায দ্বারা সৎপথে আসলে তোমাদের সওয়াব হত। এই সওয়াব না পাওয়ার জন্যে দুঃখ করা খারাপ নয়— ভাল। কিন্তু তারা জানে না যে, সত্যের আনুগত্য এবং উত্তম ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দিলে আখেরাতে সওয়াব বেশী হয় একা নিজে করার তুলনায়। যদি এরূপ দুঃখ করা প্রশংসনীয় হত, তবে হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ)-ও দুঃখ করতেন। কেননা, জনগণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব পালন করা অপরিসীম সওয়াবের কাজ। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতপ্রাপ্তিতে আনন্দিতই হয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জানি না, আজকাল আলেমগণ এ জাতীয় বিষয়সমূহে আনন্দিত হয় না কেন? যারা নফসের চক্রান্ত সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল, তারাই শয়তানের ধোকা সম্পর্কে জানে ও বুঝে।

সারকথা, এখলাসের স্বরূপ জানা ও তদনুযায়ী আমল করা একটি অথৈ সমুদ্র। এতে উত্তীর্ণ হওয়ার মত লোক খুবই বিরল। কোরআনে আছে–

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

অর্থাৎ, (শয়তান বলেছিল,) তোমার এখলাস বিশিষ্ট বান্দাগণ ছাড়া আমি সবাইকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ব।

বলা বাহুল্য, এখানে উপরোক্ত বিরল লোকদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব বান্দার উচিত এসব সূক্ষ্ম বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করার কাজে সদা তৎপর থাকা। অন্যথায় সে অজান্তেই শয়তানের দলে ভিড়ে যাবে।

এখলাস সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি ঃ হযরত সূমী (রহঃ) বলেন ঃ এখলাস হল এখলাসের প্রতি লক্ষ্য না থাকা। কেননা, যে এখলাসের প্রতি

লক্ষ্য রাখবে, তার এখলাসের জন্যে এখলাসের প্রয়োজন থাকবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমলকে আত্মম্ভরিতা থেকে পরিষ্কার রাখা উচিত। এখলাসের প্রতি দৃষ্টি রাখা আত্মম্ভরিতার নামান্তর, যা আমলের অন্যতম আপদ। খুলুস বা নিষ্ঠা তাকেই বলা হয়, যা যাবতীয় আপদ থেকে মুক্ত হবে। যে এখলাসে আত্মম্ভরিতা থাকে, তাতে একটি আপদ থেকে যায়। হযরত সহল (রহঃ) বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে নিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য পরিব্যাপ্ত। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের উক্তিও এ অর্থই জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নিয়ত সাচ্চা করা। হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হল ঃ নফসের জন্যে সর্বাধিক কঠিন কাজ কি? তিনি বললেন ঃ এখলাস। কেননা, এতে নফসের কোন অংশ থাকে না।

রুয়ায়ম (রহঃ) বলেন ঃ আমলের এখলাস হচ্ছে উভয় জাহানে এখলাসের জন্য কোন বিনিময় কামনা না করা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, জৈবিক বাসনা পার্থিব হোক অথবা পারলৌকিক সবই আপদ। আসলে আমল দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিত নয়। এতে সিদ্দীকগণের এখলাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতের আশায় অথবা দোযখের ভয়ে আমল করে, সে পার্থিব ভোগ-বিলাসের দিক দিয়ে মুখলেস বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বাসনার অন্বেষণকারী। সত্যপন্থীদের কাছে সত্যিকার চাওয়ার বিষয় হচ্ছে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি।

আবু ওছমান বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার দিকে সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রেখে সৃষ্টির প্রতি তাকানো বিস্মৃত হওয়া। এতে কেবল রিয়ার আপদ থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ মলিনতা থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার নাম এখলাস। এখলাস সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সন্তোষজনক উক্তি তাই, যা রসূলে আকরাম (সাঃ) করেছেন। তাঁকে এখলাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

ان تقول ربى الله ثم تستقم كما امرت -

অর্থাৎ, একথা বলা যে, আমার পরওয়ারদেগার আল্লাহ্। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী সরল পথে অবস্থান করা।

এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের নফস ও খেয়ালখুশীর কিংবা পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কারও এবাদত না করা। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী সোজা ও সরল থাকা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া। বাস্তব এখলাস তাই।

যে সব বিষয় এখলাসকে কলুষিত করে ঃ যে সব বিষয় এখলাসকে কলুষিত ও দূষিত করে, সেগুলোর মধ্যে কতক সুস্পষ্ট ও কতক অস্পষ্ট। সুস্পষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রিয়া। উদাহরণতঃ যখন কেউ নামাযে এখলাস করে, তখন যদি কিছু লোক তাকে দেখে অথবা কাছে আসে, তখন শয়তান তাকে বলে নামায উত্তমরূপে পড় যাতে দর্শকরা তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং সাধু মনে করে। নামাযী একথা মেনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিনয় প্রকাশ করে এবং রুকু-সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে। প্রথম স্তরের এই রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের নামাযীদের কাছেও গোপন থাকে না। রিয়ার দ্বিতীয় স্তর এই যে, নামাযী এই আপদটি আঁচ করে নেয় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করে। অর্থাৎ, শয়তানের আনুগত্য করে না এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; বরং পূর্বে যেভাবে পড়ত, সেভাবেই পড়তে থাকে। তখন শয়তান তার কাছে কল্যাণের বাহানায় আসে এবং বলে ঃ তুমি তো অনুসৃত, পুরোহিত ও নামযাদা ব্যক্তি। তুমি যা করবে, তাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে। ফলে, তাদের আমলের সওয়াব তুমিও পাবে যদি তুমি ভালরূপে আমল কর। পক্ষান্তরে তুমি খারাপ আমল করলে অন্যদের খারাপ আমলের কুফল তোমার উপরও বর্তাবে। যারা প্রথম স্তরের ধোকার জালে আবদ্ধ হয় না, তারা কখনও এই দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও রিয়া এবং এর কারণেও এখলাস বরবাদ হয়ে যায়। কেননা, যদি বাস্তবিকই নামাযে খুশু তার কাছে উত্তম হয় যে, অন্যের কারণে তা ত্যাগ করে না, তবে একাকী নামায পড়ার সময় নিজেকে খুশুতে অভ্যস্ত করে না কেন? সত্যিকার সাধু সে ব্যক্তি, যার অন্তর উজ্জ্বল এবং তার ঔজ্জ্বল্য অন্যের উপর প্রতিফলিত হয়। একথা ঠিক যে, কেউ তার অনুসরণ করলে অনুসরণকারী সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু এই অনুসৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে বিষয় তোমার মধ্যে ছিল না, তা প্রকাশ করলে কেন?

তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম। তা এই যে, বান্দা নিজের নফসের পরীক্ষা নেবে এবং শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হয়ে

জেনে নেবে যে, নির্জনে এক অবস্থা হওয়া এবং জনসমক্ষে অন্য অবস্থা হওয়া নিছক রিয়া। এখানে এখলাস হল, নামায একাকীত্বেও তেমনি হওয়া, যেমন জনসমাবেশে হয়। কেউ যদি মানুষের দেখা অবস্থায় অভ্যাস অনুযায়ী নামাযে অধিক খুশু করে এবং একদিকে দৃষ্টি রেখে একাকীত্বেও নিজ নফসের প্রতি মনোনিবেশ করে অধিক খুশু করে, তবে তাও সূক্ষ্ম ও গোপন রিয়া। কেননা, সে নির্জনে এই নিয়তে উত্তমরূপে নামায পড়ে যে, জনসমাবেশেও যেন উত্তমরূপে নামায আদায় হয়। অতএব, নির্জনে ও জনসমাবেশে উভয় জায়গায় তার লক্ষ্য রইল মানুষের প্রতি। এখানে এখলাস এভাবে হত যে, চতুষ্পদ জন্তুর দেখা ও মানুষের দেখা উভয়টি নামাযীর দৃষ্টিতে সমান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নামাযী ধারণা করে নির্জনে ও জনসমাবেশে একই রূপে নামায পড়লে সে রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তা ঠিক নয়। রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হল মানুষের প্রতি দৃষ্টি তেমনি থাকা, যেমন জড় পদার্থের প্রতি দৃষ্টি হয়— নির্জনে হোক অথবা জনসমাবেশে।

চতুর্থ স্তর যা চূড়ান্ত পর্যায়ের গোপন তা হল এই যে, এক ব্যক্তি শয়তানের ধোকা জেনে ফেলেছে। ফলে, তার নামায পড়া মানুষে দেখলেও শয়তান একথা বলতে পারে না যে, তুমি দর্শকদের খাতিরে খুশু কর। ফলে, শয়তান তার কাছে এসে বলে ঃ আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর, যার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। আল্লাহ তোমার অন্তরকে তাঁর দিক থেকে গাফেল দেখুক— এ বিষয়ে লজ্জাবোধ কর। নামাযীর মনে এ ধারণা আসার সাথে সাথে তার অন্তর হাযির হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুশু করতে শুরু করে। নামাযী মনে করে, এটাই এখলাস। অথচ এটা হুবহু ধোকা ও প্রতারণা। কেননা, যদি আল্লাহর প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে এই খুশু হত, তবে একাকীত্বেও তাই হত। কেবল অন্য কারও আগমনের কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হত না। এই আপদ থেকে বাঁচার আলামত এই যে, উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা একাকীত্বেও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেমন জনসমাবেশে থাকে। মোটকথা, যে পর্যন্ত মানুষের দেখা ও গবাদি পশুর দেখার মধ্যে নিজের আমলে পার্থক্য হতে থাকবে, সে পর্যন্ত নামাযী এখলাস বহির্ভূত এবং গোপন শিরকে লিপ্ত বলে গণ্য হবে। এটাই সেই শিরক, যা মানুষের অন্তরে কালো পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক গোপন, যে পিঁপড়া অন্ধকার রাত্রে কঠিন পাথরের উপর দিয়ে চলে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে।

মিশ্র আমলের সওয়াব ঃ আমল যখন আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে খালেস হয় না এবং তাতে রিয়া ইত্যাদি আপদের মিশ্রণ থাকে, তখন সে আমল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এরূপ মিশ্র আমল দ্বারা সওয়াব পাওয়া যাবে, না শাস্তি, না কোন কিছুই হবে না?— এ সম্পর্কে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, যে আমলের উদ্দেশ্য কেবল রিয়া হবে, তা তো আযাব ও গযবের কারণ হবেই এবং যা বিশেষভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, তা সওয়াবের কারণ হবে। মতভেদ কেবল মিশ্র আমল সম্পর্কে। বাহ্যিক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ রেওয়ায়েতও রয়েছে। আমাদের মতে উদ্দেশ্যের শক্তি ও প্রাবল্যের নিরিখে বিচার হওয়া উচিত। যদি দ্বীনী উদ্দেশ্য ও জৈবিক উদ্দেশ্য সমান সমান হয়, তবে এরূপ আমল সওয়াব ও আযাব এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিরই কারণ হবে না। আর রিয়ার উদ্দেশ্য প্রবল হলে তা আযাবেরই কারণ হবে। তবে এই আযাব শুধু রিয়ার উদ্দেশ্যে করা আমলের আযাব অপেক্ষা হালকা হবে। আর যদি নৈকট্যের নিয়ত প্রবল হয়, তবে যে পরিমাণ প্রবল হবে, সে পরিমাণ সওয়াব হবে। এর কারণ আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তি—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

অর্থাৎ, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

আরও এরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। পুণ্য কাজ হলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন।

এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, সৎকর্মের ইচ্ছা পণ্ড হবে না। যদি সৎ কর্মের ইচ্ছা রিয়ার ইচ্ছা অপেক্ষা প্রবল হয়, তবে রিয়ার ইচ্ছার সমান তা পণ্ড হবে এবং বাড়তিটুকু অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি সৎ কর্মের ইচ্ছা কম এবং রিয়ার ইচ্ছা বেশী হয়, তবে শুধু রিয়ার ইচ্ছার কারণে যতটুকু আযাব হত, তা থেকে সৎকর্মের ইচ্ছা পরিমাণ আযাব কমে যাবে। সুতরাং যদি কেউ এমন সৎকর্ম করে, যা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক ফুট নৈকট্য অর্জিত

হয় এবং তাঁর সাথে এমন অসৎকর্ম করে, যা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক ফুট দূরত্ব অর্জিত হয়, তবে এই ব্যক্তি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তাতেই থেকে যাবে। না সওয়াব হবে, না আযাব। হাদীস শরীফে আছে—

اتبع السيئة الحسنة تمحا -

অর্থাৎ, অসৎ কর্মের পেছনে সৎকর্ম কর। এই সৎকর্ম অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেবে।

সুতরাং নির্ভেজাল রিয়াকে নির্ভেজাল এখলাস মিটিয়ে দেয়। যদি কারও মধ্যে উভয়টি একত্রিত হয়, তবে একটি অপরটির বিপরীত ক্রিয়া করবে। এ বিষয়ে উম্মতের এজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জে রওয়ানা হয় এবং তার সাথে পণ্য সামগ্রীও থাকে, তার হজ্জ জায়েয হবে এবং সে হজ্জের সওয়াব পাবে।

অবশ্য আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় রিয়ার সংমিশ্রণ সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়। হজ্জের সফরে ব্যবসায়ের ইচ্ছা করাও অনুরূপ একটি সংমিশ্রণ। তাউস এবং আরও কয়েকজন তাবেঈ রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করে এবং তাতে পছন্দ করে যে, মানুষ তার প্রশংসা করুক এবং সওয়াবও হোক। রসূলে করীম (সাঃ) এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং নিজের পালনকর্তার এবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

হযরত মুয়ায (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রিয়াকে নিম্নতম শিরক বলেছেন। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আমলে শিরক করবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার প্রতিদান তার কাছ থেকে গ্রহণ কর, যার জন্যে তুমি আমল

করেছিলে। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি আত্মমর্যাদার জন্যে যুদ্ধ করে, অন্যজন বীরত্বের খাতিরে যুদ্ধে নামে এবং তৃতীয় জন আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা জানার জন্যে লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

আমরা বলি, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কেননা, এগুলোতে সে ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যে দুনিয়ার জন্যেই আমল করে এবং দুনিয়ার অন্বেষণই তার নিয়তে প্রবল থাকে। দ্বীনী আমলের বিনিময়ে দুনিয়া তলব করা হারাম। কেননা, এতে এবাদত স্বস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মিশ্র আমল বলতে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আমল, যাতে উভয় নিয়ত সমান সমান থাকে। এরূপ আমলে সওয়াব ও আযাব কিছুই হয় না। সুতরাং এরূপ আমল দ্বারা সওয়াবের আশা করা উচিত নয়।

মোটকথা, এখলাসে আপদ অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপদের কারণে আমল ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের উপরোক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য আসলে এখলাসকে ত্যাগ না করা। যদি আমলই না করা হয়, তবে আমল ও এখলাস উভয়টি বর্জিত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, জনৈক ফকীর হযরত আবু সাঈদ হেরাযের খেদমত করত এবং তাকে কাজকর্মে সাহায্য করত। একদিন তিনি ফকীরকে কাজকর্মে এখলাস অবলম্বন করতে বললেন। ফকীর প্রত্যেক কাজের সময় অন্তরের অবস্থা দেখতে লাগল। এখলাস অর্জনে অক্ষম হয়ে অবশেষে সে কাজকর্মই বন্ধ করে দিল। এতে হযরত আবু সাঈদ কষ্টে পড়ে গেলেন। কারণ, তার কাজকর্মে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। তিনি ফকীরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এখন কাজ কর না কেন? ফকীর বলল ঃ আপনার এরশাদ অনুযায়ী এখলাস অবলম্বনে ব্যর্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। এখলাস আমলকে ছিন্ন করে না। আমল করে যাও এবং এখলাস অর্জনের চেষ্টা করতে থাক। আমি তোমাকে আমল ছেড়ে দিতে বলিনি। বরং আমলকে খাঁটি করতে বলেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিদ্‌কের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, "তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে।"

সিদ্‌কের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'সিদ্দীক' শব্দটি এ থেকেই উদগত! আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রশংসায় তাদেরকে সিদ্দীক বলেছেন। বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ, কিতাবে ইবরাহীমের আলোচনা করুন। সে ছিল সিদ্দীক তথা সাচ্চা নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ, কিতাবে ইদ্‌রীসের আলোচনা করুন। সে ছিল সিদ্দীক ও নবী। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا - وان الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا -

অর্থাৎ, সত্যবাদিতা পূণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য বলতে থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক হিসাবে লিখিত হয়। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়। পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর উপকার সে-ই পায়, যার মাঝে এগুলো থাকে— সত্যবাদিতা, লজ্জা, সচ্চরিত্রতা ও শোকর। বিশর ইবনে হারেছ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে নিষ্ঠা সহকারে আচরণ করে, সে মানুষকে ঘৃণা করে। এক ব্যক্তি জনৈক দার্শনিককে বলল ঃ আমি কোন সাচ্চা মানুষ দেখিনি। দার্শনিক বলল ঃ যদি তুমি সাচ্চা হতে, তবে সাচ্চাদেরকে চিনতে। জনৈক ব্যক্তি হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মজলিসে চিৎকার দিয়ে উঠল। অতঃপর সে দজলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত শিবলী বললেন ঃ যদি সে সাচ্চা হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে দেবেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-কে বাঁচিয়েছিলেন। আর যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তাকে নিমজ্জিত করে দেবেন, যেমন ফেরাউনকে নিমজ্জিত করেছিলেন।

আলেম ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনটি বিষয় সঠিক হয়ে গেলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যাবে— (১) বেদআত ও খেয়ালখুশীমুক্ত ইসলাম, (২) আমলসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিষ্ঠা এবং (৩) হালাল খাদ্য। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ আমি তাওরাতের প্রান্তটীকায় বাইশটি বাক্য দেখেছি যা বনী ইসরাঈলের সাধু বক্তিরা সমবেত হয়ে পাঠ করত। বাক্যগুলো এই ঃ কোন ভাণ্ডার জ্ঞানের চেয়ে অধিক উপকারী নয়। কোন ধন সহনশীলতা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক নয়। কোন স্বভাব ক্রোধের চেয়ে অধিক নীচ নয়। কোন সঙ্গী আমলের চেয়ে বেশী শোভাদায়ক নয়। কোন সহচর মূর্খতার চেয়ে অধিক দোষী নয়। কোন গৌরব খোদাভীতি অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। কোন বীরত্ব বাসনা বর্জনের চেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ নয়। কোন আমল চিন্তা-ভাবনা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নয়। কোন পুণ্য কাজ সবর অপেক্ষা উচ্চ নয়। কোন দোষ অহংকার অপেক্ষা অধিক অপমানকর নয়। কোন ঔষধ নম্রতার চেয়ে অধিক নরম নয়। কোন ব্যাধি বোকামি অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক নয়। কোন রসূল সত্য বিমুখ নয়। সত্যবাদিতার চেয়ে অধিক কোন হিতাকাংখী নেই। কোন ফকীর-লোভের চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত নয়। কোন প্রাচুর্য সম্পদ আগলে রাখার চেয়ে অধিক হতভাগা নয়। কোন জীবন সুস্থতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয়। সাধুতার চেয়ে অধিক সহনীয় কোন পাপ নেই। খুশুর চেয়ে উত্তম কোন এবাদত নেই। অল্পে তুষ্টির চেয়ে ভাল কোন বৈরাগ্য নেই। চুপ থাকার চেয়ে অধিক কোন হেফাযতকারী নেই। কোন অদৃশ্য বস্তু মৃত্যুর চেয়ে অধিক নিকটবর্তী নয়।

মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ মরুযী বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে নিষ্ঠার সাথে অন্বেষণ করবে, তখন তিনি তোমার হাতে একটি আয়না

দিবেন, যার মধ্যে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখতে পাবে।

সিদ্‌কের স্বরূপ ঃ "সিদ্‌ক" তথা নিষ্ঠা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) কথায় নিষ্ঠা, (২) নিয়তে নিষ্ঠা (৩) সংকল্পে নিষ্ঠা (৪) সংকল্প বাস্তবায়নে নিষ্ঠা (৫) আমলে নিষ্ঠা এবং (৬) ধর্মীয় মকামসমূহে নিষ্ঠা। যে ব্যক্তি এই ছয়টি বিষয়েই নিষ্ঠার গুণে গুণান্বিত হয়, তাকে বলা হয় সিদ্দীক। কারণ, সে সিদকের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। এখন এই ছয়টি অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) কথায় সত্যবাদিতা বা নিষ্ঠা সেই সমস্ত উক্তি ও খবরে হয়ে থাকে, যেগুলো অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওয়াদা পূর্ণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য নিজের কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সত্য ছাড়া কোনরূপ কথাবার্তা না বলা। সিদকের সকল প্রকারের মধ্যে এ প্রকারটিই সর্বাধিক স্পষ্ট। যে ব্যক্তি নিজের মুখের হেফাযত করে এবং বাস্তব অবস্থার খেলাফ কিছু না বলে, তাকে বলা হয় সাদেক তথা সত্যবাদী। কিন্তু এই সিদকের পূর্ণতার দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম, রূপক ভাষা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, বলা হয়, মিথ্যা এড়ানোর জন্যে রূপক ভাষার আশ্রয় নেয়া হয়। আসলে এটাও মিথ্যার স্থলবর্তী। মাঝে মাঝে সময়ের উপযোগিতার কারণে এর আশ্রয় নিতে হয়। যেমন, বালক-বালিকা ও নারীদের শাসন করার ক্ষেত্রে, যালেমদের কবল থেকে আত্মরক্ষার বেলায় এবং শত্রুর মোকাবিলা করার সময়। এসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব রূপক ভাষা ব্যবহার করা যায়, যাতে পরিষ্কার মিথ্যা না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতি ছিল তিনি যখন সফরে রওয়ানা হতেন, তখন অন্যদের কাছে তা গোপন রাখতেন, যাতে শত্রুরা খবর না পায়। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا اونمى خيرا -

অর্থাৎ, সে মিথ্যাবাদী নয়, যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে ভাল কথা বলে অথবা ভাল কথা পৌঁছায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জায়গায় মিথ্যা ভাষণকে সময়োপযোগী বলেছেন। এক— যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। দুই— যার দুই স্ত্রী রয়েছে এবং তিন— যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব জায়গায় সিদকের অর্থ নিয়তের সত্যবাদিতা। ফলে সৎ নিয়ত ও সদিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখা

হয়, ভাষার প্রতি নয়। সুতরাং যার ইচ্ছা সৎ হবে এবং শুধু কল্যাণই কাম্য হবে, সে সত্যবাদী ও সিদ্দীক কথিত হবে। এতদসত্ত্বেও এসব জায়গায় ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণনা করা উত্তম। উদাহরণতঃ বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গকে যখন কোন যালেম ব্যক্তি তালাশ করত এবং তিনি ঘরেই থাকতেন, তখন নিজের স্ত্রীকে বলতেন— অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে একটি বৃত্ত আঁক এবং তার ভিতরে আঙ্গুল রেখে বলে দাও তিনি এখানে নেই। এ বাহানায় তিনি মিথ্যা বলা থেকে এবং যালেম থেকে আত্মরক্ষা করতেন। পত্নীর কথা সত্য হত; কিন্তু যালেম বুঝত যে, তিনি ঘরে নেই।

পূর্ণতার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ব্যবহৃত ভাষার অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা। নতুবা মুখে সত্য কথা বললে এবং নিজের অবস্থা সে অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে মিথ্যা ভাষণ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ কেউ আল্লাহর কাছে মোনাজাত ও দোয়ায় মুখে বলে—

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ -

অর্থাৎ, আমি আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার প্রতি নিবিষ্ট করলাম, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু তার অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ এবং দুনিয়ার কামনা-বাসনায় মশগুল। এমতাবস্থায় সে হবে মিথ্যাবাদী। অথবা কেউ মুখে বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ, আমি শুধুমাত্র তোমারই বন্দেগী করি, অথচ তার মধ্যে বন্দেগীর স্বরূপ অনুপস্থিত থাকে, তবে তার কথা সত্য হবে না।

(২) নিয়তে সত্যবাদিতা হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, সাধকের যাবতীয় কাজকর্মের প্রেরণাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছু না হওয়া। অতএব, যদি কোন জৈবিক বাসনা এর সাথে মিলিত হয়ে যায়, তবে নিয়তের সত্যতা বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সাধককে মিথ্যাবাদী বলা হবে। এখলাসের ফযীলত সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক হাদীসে তিন ব্যক্তির প্রশ্ন ও উত্তর বার্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আলেমকে প্রশ্ন করা হবে তুমি ইলম শিখে কি আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আমি অমুক কাজ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী; বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলুক। এখানে লক্ষণীয় যে, তাকে একথা বলা হয়নি যে, তুমি আমল করনি; বরং কেবল নিয়তের ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এমনিভাবে

মুনাফিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে—

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অথচ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছিল اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। তাদের এ কথাটি সত্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কথাটিকে মিথ্যা বলেননি; বরং একথা বলার পেছনে তাদের অন্তরে যে নিয়ত লুক্কায়িত ছিল, তাকে মিথ্যা বলেছেন।

(৩) সংকল্পে সত্যবাদিতার অর্থ এই যে, মানুষ কখনও আমল করার পূর্বে মনে মনে সংকল্প করে বলে, যদি আলাহ তা'আলা আমাকে অর্থ-সম্পদ দান করেন, তবে সমস্তই সদকা করে দেব অথবা অর্ধেক সদকা করব। এই সংকল্প কখনও মানুষের মনে পাকাপোক্ত ও সত্যিকারভাবে হয় এবং কখনও এতে এক প্রকার সংশয় ও দুর্বলতা থাকে। এই সংশয় ও দুর্বলতা সিদ্কের পরিপন্থী। অতএব, এখানে সিদ্কের অর্থ যেন শক্তিশালী হওয়া। এই অর্থ অনুযায়ী সাদেক ও সিদ্দীক এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যে তার সদকা করার সংকল্পকে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী পায়।

(৪) সংকল্প বাস্তবায়নেও সিদ্কের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, মানুষ প্রায়ই সংকল্প করে ফেলে। কারণ, এতে কোন কিছু ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু যখন বাস্তবায়নের সময় আসে, তখন কামনা-বাসনা জোরদার হবার কারণে সংকল্প শিথিল হয়ে যায়। এটা সংকল্প বাস্তবায়নে সিদকের পরিপন্থী। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের সিদ্ক সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে।

এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদর যুদ্ধে ওযরবশত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শরীক ছিলেন না। এটা ছিল তার জন্যে অসহনীয়। তিনি বললেন ঃ এটা ছিল শাহাদত লাভের প্রথম সুযোগ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যোগদান করেছেন, আর আমি কি না অনুপস্থিত রইলাম! আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে শাহাদত লাভের এরূপ সুযোগ আবার এলে আল্লাহ তা'আলা দেখবেন

আমি কি করি! বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই আনাস ইবনে নযর পরবর্তী বছর উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সা'দ ইবনে মুয়ায তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আমর, কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের চমৎকার হাওয়া আমি উহুদের দিক থেকে অনুভব করছি। এরপর তিনি বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। তাঁর দেহে আশিটির উপরে তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাত ছিল। তাঁর ভগ্নী বলেন ঃ যখমের কারণে আমি আমার ভাইকে চিনতে পারিনি। এরপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখে চিনতে পেরেছি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ চার ব্যক্তি শহীদ— (১) যে ঈমানদার শত্রুকে দেখে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন মানুষ এই ব্যক্তির প্রতি মাথা তুলে তাকাবে। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা তুললেন যাতে তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। (২) যে ঈমানদার শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর একটি ঘাতক তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং সে শহীদ হয়ে যায়। (৩) যে ঈমানদার কিছু ভাল ও কিছু মন্দ আমল করে। অতঃপর শত্রুর সাথে ভিড়ে আল্লাহ্কে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। (৪) যে ঈমানদার নিজের উপর যুলুম করে। অতঃপর শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্কে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, দুটি লোক মানুষের সামনে এসে বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধন-সম্পদ দিলে আমরা সদকা করব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধন-সম্পদ দিলেন। কিন্তু তারা কৃপণতা অবলম্বন করল। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّآ اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ -

অর্থাৎ, তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করল, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ (ধন-সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা সদকা করব এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ্ যখন

তাদেরকে অনুগ্রহ করে দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা অবলম্বন করল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। অতঃপর আল্লাহ্ এর চিহ্ন হিসাবে নিফাক স্থাপন করে দিলেন, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ করেছিল।

এ আয়াতে সংকল্পকে অঙ্গীকার বলা হয়েছে এবং এর খেলাফ করাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সিদ্‌ক তৃতীয় প্রকার সিদ্‌কের তুলনায় কঠিনতর। কেননা, মানুষ কখনও সংকল্প করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবায়নের সময় এলে নানাবিধ বাসনার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হয়ে পিছু হটে যায়।

(৫) আমলে সত্যবাদিতা হচ্ছে এমন চেষ্টা করা যাতে বাহ্যিক আমলে কোনরূপ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ, যে গুণ বাস্তবে তার মধ্যে নেই, বাহ্যিক আমল দ্বারা তা যেন আছে বলে প্রকাশ না পায়। কিন্তু এ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পাওয়া যেন আমল বর্জন করার মাধ্যমে না হয়। এই সিদ্‌কের উদ্দেশ্য রিয়া বর্জন নয়। কেননা, অধিকাংশ নামাযী নামাযে খুশুখুযুর আকার ধারণ করে থাকে। কিন্তু রিয়া তথা কাউকে দেখানো তাদের উদ্দেশ্য থাকে না; কিন্তু তাদের অন্তর নামায থেকে গাফেল থাকে এবং বাজারে ঘুরাফেরা করে। এরূপ ব্যক্তি আমলে মিথ্যাবাদী এবং সে সিদক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে— রিয়া সম্পর্কে নয়। মোটকথা, বাহ্যিক অবস্থা অন্তরের অবস্থার পরিপন্থী হওয়া ইচ্ছাকৃত হলে তা রিয়া। এর ফলে এখলাস বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যদি অনিচ্ছায় হয়, তবে সেটা মিথ্যা এবং এতে সিদক বিনষ্ট হয়। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরূপ দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً -

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা উত্তম করে দাও এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাকে সৎ করে দাও।

যায়দ ইবনে হারেছ বলেন ঃ যখন মানুষের বাইরের অবস্থা ও ভেতরের অবস্থা সমান হয়ে যায়, তখন সে পুণ্যবান হয়ে যায়। যদি ভেতরের অবস্থা বাইরের তুলনায় ভাল হয়, তবে তাকে বলা হয় "ফয্‌ল"। আর বাইরের অবস্থা ভেতরের তুলনায় উত্তম হলে তার নাম হয় "জুর" তথা অন্যায়।

আতিয়্যা ইবনে আবদুল গাফের বলেন ঃ ঈমানদারের ভেতরের অবস্থা বাইরের অবস্থার চেয়ে ভাল হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করে বলেন ঃ সে হচ্ছে আমার সত্যিকার বান্দা। অতএব বুঝা গেল, ভেতর ও বাইর সমান হওয়া এক প্রকার সিদক।

(৬) ধর্মীয় মকামসমূহে সত্যবাদিতা হচ্ছে খওফ, রেঁযা, যুহদ, তাওয়াক্কুল, মহব্বত ইত্যাদি তরীকতের বিষয়সমূহে যথার্থ হওয়া। কেননা, এসব বিষয়ের এক অংশ হচ্ছে সূচনা; এরপর আসে এগুলোর চূড়ান্ত সীমা তথা হাকীকত (স্বরূপ)। যে ব্যক্তি এগুলোর হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে-ই যথার্থ মুহাক্কিক। কোন গুণ কারো মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলে সে ব্যক্তিকে সে গুণে যথার্থ বলা হয়। যেমন, আমরা বলি অমুক ব্যক্তি যথার্থ বীর, অমুক ব্যক্তি যথার্থ খোদাভীরু। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

অর্থাৎ, ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর সন্দিহান হয় না এবং নিজের ধন ও প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে। তারাই যথার্থ নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী।

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا -

অর্থাৎ, কিন্তু সৎকর্ম হল আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা, তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের এবং ক্রীতদাসের জন্যে সম্পদ ব্যয় করা। বস্তুত যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে, যারা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, বিপদাপদ ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, তারাই হল সত্যবাদী।

এক্ষণে আমরা খওফ তথা ভয়ের ক্ষেত্রে যথার্থতার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। যে বান্দা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে। কিন্তু এ ভয় এমন যে, একে কেবল শাব্দিক দিক দিয়েই ভয় বলা যায়। সত্যিকার ভয়ের যে স্তর তা সেই পর্যন্ত পৌঁছল না। দেখ, মানুষ যখন কোন বাদশাহকে ভয় করে অথবা পথিমধ্যে ডাকাতকে ভয় করে, তখন তার শরীরের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে, জীবন তিক্ত হয়ে যায় এবং আহার-নিদ্রা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামের আগুনকে ভয় করার পর মানুষ যখন কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন এসব কিছুই হয় না। তার দেহের রঙ স্বাভাবিকই থাকে এবং হাত-পা কাঁপে না। এর কারণ কি? রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لم ارمثل النار نام ها ربها ولامثل الجنة نام طالبها –

অর্থাৎ, দোযখ থেকে পলায়নকারী যেভাবে ঘুমায়, তেমন ঘুমাতে আমি কাউকে দেখি না এবং জান্নাত অন্বেষণকারীর মতও আমি কাউকে ঘুমুতে দেখি না।

সুতরাং খওফের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কঠিন। এসব মকামের স্বরূপ ও সিদকের কোন সীমা নেই। প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা অনুযায়ী এগুলোর অংশ প্রাপ্ত হয়। যে বেশী অংশ পায়, তাকেই সত্যিকার বান্দা বলা হয়। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে বললেন— আমি আপনাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি আমাকে আসল আকৃতিতে দেখলে ঠিক থাকতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, আমি দেখতেই চাই। জিবরাঈল ওয়াদা করলেন ঃ আচ্ছা, জোছনা রাতে 'বাকী' নামক স্থানে দেখিয়ে দেব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাঁদনী রাতে সেখানে পৌঁছলে জিবরাঈলকে দেখলেন আকাশের সমগ্র দিগন্ত আচ্ছাদিত করে বিরাজমান। দেখার সাথে সাথেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন জিবরাঈলকে পূর্বের আকৃতিতে দেখে বললেন ঃ আমার মনে হয় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝে এ ধরনের কেউ নেই। জিবরাঈল আরয করলেন ঃ আপনি ইসরাফীলকে দেখলে ভালই হত। আরশে মোয়াল্লা তার কাঁধে এবং পা পৃথিবীর সর্বনিম্নে নামানো। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর মাহাত্ম্যের সামনে যখন তিনি সংকুচিত হন, তখন ক্ষুদ্র পাখীর মত হয়ে যান। এখানে দেখা উচিত যে, হযরত ইসরাফীল খওফের কত বিরাট অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। সকল ফেরেশতা এরূপ নন। কেননা, তারা খওফের ক্ষেত্রে সমান নন। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— আমি মে'রাজ রজনীতে উর্ধ্বাকাশে হযরত জিবরাঈলকে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে উটের পিঠে পুরানো চাদরের মত পড়ে থাকতে দেখেছি। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও খওফ ছিল। কিন্তু তাদের খওফ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খওফের সমান ছিল না।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল, খওফ, মহব্বত ইত্যাদি স্তরগুলোতে যারা সাদেক তথা নিষ্ঠাবান, তাদের সংখ্যা খুবই কম। মাঝে মাঝে বান্দা কোন কোন স্তরে সাদেক আর কোন কোন স্তরে সাদেক নয়। যে সব মকামে সাদেক, তাতে যথার্থই সিদ্দীক। আবু বকর ওররাফ বলেন ঃ সিদক তিন প্রকার— তাওহীদে সিদক, এবাদতে সিদক এবং মারেফতে সিদক। তাওহীদে সিদক সাধারণ মুমিনদেরও অর্জিত হয়। যেমন, আল্লাহ্ বলেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, তারা সাদেক।

এবাদতে সিদক আলেম ও পরহেযগারদের অর্জিত হয়। আর মারেফতে সিদক ওলীগণ অর্জন করেন।

অষ্টম অধ্যায়

মুরাকাবা ও মুহাসাবা

(ধ্যানমগ্নতা ও আত্মবিশ্লেষণ)

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের মানদণ্ড স্থাপন করব। অতঃপর কারও প্রতি সামান্যও যুলুম করা হবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও আমল থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব করার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا -

অর্থাৎ, আমলনামা রাখা হবে। তখন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন, তারা আমলনামায় লিখিত বিষয়বস্তুর কারণে ভীত হচ্ছে। তারা বলবে ঃ হায় আমাদের দুর্ভোগ, এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন পাপই সন্নিবেশিত না করে ছাড়ে না। তারা যা কিছু করেছিল সমস্তই উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -

অর্থাৎ, যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম বলে দিবেন। আল্লাহ্ তা গণনা করে রেখেছেন এবং তারা ভুলে গেছে। প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর দৃষ্টির সামনে উপস্থিত।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

অর্থাৎ, সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু-পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, অতঃপর পুরোপুরি দেয়া হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যা সে উপার্জন করেছে। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا وَّيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ -

অর্থাৎ, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভালমন্দ কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। সে আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তার মধ্যে ও তার কৃতকর্মের মধ্যে দূরবর্তী ব্যবধান থাকত। আল্লাহ্ নিজে থেকে তোমাদের সাবধান করেন।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ -

অর্থাৎ, জেনে নাও, আল্লাহ তোমাদের অন্তরস্থিত বিষয় জানেন, সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু থেকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ জেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ

অবশ্যই নেবেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তারা এ কথাও উপলব্ধি করেছেন যে, এই বিপদ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা, নিজের অবস্থার পুরোপুরি দেখাশুনা করা এবং কিয়ামতে হিসাব নেয়ার পূর্বে নিজেই নিজের নফসের হিসাব নেয়া। কেননা, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, কিয়ামতে তার হিসাব হাল্কা হবে। সে জওয়াব দিতে সক্ষম হবে এবং তার পরিণাম শুভ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই নিজের নফসের হিসাব নেবে না, সে সর্বদা পরিতাপ করবে এবং তার কুকর্ম তাকে লাঞ্ছনা ও গযবে নিপতিত করবে। আল্লাহ তা'আলা সবর ও দেখাশুনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবর কর, সবরে থাক দৃঢ় এবং দেখাশুনা করতে থাক।

এসব কারণে বুযুর্গগণ মুহাসাবা তথা আত্মবিশ্লেষণের পথ বেছে নিয়েছেন। নিম্নে এই মুহাসাবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

নফসের প্রতি শর্ত আরোপ করা ঃ যারা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং ব্যবসার কাজে শরীক হয়, তাদের সবার উদ্দেশ্য থাকে হিসাবের পর কিছু মুনাফা অর্জন করা। ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার শরীকের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তার হাতে অর্থ অর্পণ করে। ব্যবসায়ের পর সে তার শরীকের সাথে হিসাব করে এবং মুনাফা গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আখেরাতের পথে ব্যবসায়ী হচ্ছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং তার মুনাফা হচ্ছে নফসকে পবিত্র ও শুদ্ধ করা। আখেরাতের সাফল্য এর উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

অর্থাৎ, যে নফ্সকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে, সে সফল হয়। আর যে নফসকে ধূলি ধূসরিত করে, সে ব্যর্থ হয়।

আখেরাতের ব্যবসায়ে জ্ঞান-বুদ্ধি নফসের সাহায্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ, তাকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যা দ্বারা সে পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। দুনিয়ার কারবারে ব্যবসায়ী শরীকের প্রতি প্রথমে কিছু শর্ত আরোপ করে,

অতঃপর সেগুলো পালিত হয় কিনা, তার দেখাশুনা করে। তেমনিভাবে জ্ঞানবুদ্ধিও নফসের সাথে চারটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকে ঃ (১) প্রথমে তার প্রতি কিছু শর্ত আরোপ করা। অর্থাৎ, কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যে, এগুলো মেনে চলতে হবে। (২) প্রতি মুহূর্তে অব্যাহতভাবে নফসের দেখাশুনা করা। কেননা, নফসকে বল্গাহীন উটের মত ছেড়ে দিলে তার কাছ থেকে কর্তব্যে অবহেলা ও খেয়ানত ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় মুনাফা দূরের কথা, পুঁজি রক্ষা করাই কঠিন হবে। (৩) দেখা-শুনার পর নফসের কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নিতে হবে এবং এতে কঠোরতা অবলম্বন করা জরুরী। (৪) হিসাবের পর যদি মুনাফার পরিবর্তে লোকসান দেখা যায়, তবে নফসকে শাস্তি দিতে হবে।

অতএব, ঈমানদার বান্দা যখন ভোরে ঘুম থেকে উঠে এবং ফজরের নামায পড়ে নেয়, তখন কিছু সময় নিজের নফসের সাথে শর্ত করার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নেবে। যেমন, ব্যবসায়ী মূলধন সোপর্দ করার আগে নিজের শরীকের সাথে শর্ত করার জন্যে একান্তে বসে যায়। অন্য কাউকে এই মজলিসে আসতে দেয় না, যাতে শরীক শর্তগুলো উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে এবং অন্য কথায় চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত না হয়। এরপর নিজের নফসকে এভাবে বলবে— আমার এই আয়ুই আমার পুঁজি। এটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মূলধনই খতম হয়ে যাবে এবং ব্যবসা ও মুনাফার কোন আশা থাকবে না। আজকের এই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সময় দিয়েছেন এবং আমার মৃত্যু বিলম্বিত করেছেন। অতএব, এ দিনটিকে বিনষ্ট করো না। মনে রেখ, হাদীসে বলা হয়েছে— বান্দার দিবারাত্রিতে চব্বিশটি ভাণ্ডার এক কাতারে সাজানো হয়। তন্মধ্যে একটি ভাণ্ডার তার জন্যে খোলা হয়। সে সেটাকে পুণ্যকর্মের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পায়। এটা সেই সময়, যাতে সে সৎকর্ম করে। এটা দেখে বান্দার এত আনন্দ ও খুশী হয় যে, এই খুশী দোযখীদের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের কোন কষ্টই অনুভূত হবে না। আর যে মুহূর্তে বান্দা পাপকর্ম ও আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে,সে মুহূর্তের ভাণ্ডারও খোলা হয়। সেটা কাল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্ধকার তাকে ঘিরে ফেলে। এ ভাণ্ডারটি দেখার পর বান্দার মধ্যে এত ভয় ও আতংক দেখা দেয় যে, এ আতংক জান্নাতীদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তাদের সুখ ও শান্তি বিলীন হয়ে যাবে। বান্দার জন্যে আরও একটি ভান্ডার খোলা হয়, যা

থাকে শূন্য। এতে না খুশীর বিষয় থাকে, না দুঃখের। এটা সেই মুহূর্ত, যাতে বান্দা ঘুমিয়ে অথবা গাফেল থাকে অথবা দুনিয়ার মোবাহ তথা অনুমোদিত কর্মে মশগুল থাকে।

ভাণ্ডারটি দেখে বান্দা অনুতাপ করে, হায়! এটা কেন শূন্য রইল! এতে তার এত ক্ষতি হয়, যা কোন বড় সাম্রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতি অপেক্ষা কম নয়। এমনিভাবে প্রাত্যহিক চব্বিশ ঘন্টার ভাণ্ডার বান্দার সমগ্র জীবনে খোলা হতে থাকে। অতএব, বান্দা নিজের নফসকে বলবে— আজ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে নিজের ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করে নাও। এরপর চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে নফসকে উপদেশ দেবে। কেননা, এগুলো এ ব্যবসায়ে নফসের খাদেমের অনুরূপ। এই ব্যবসায়ের তৎপরতা তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং নফসকে এভাবে নির্দেশ দেবে যে, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থেকে হেফাযতে রাখবে। চোখকে গায়র মাহরামের দিকে দেখা থেকে, কোন মুসলমানের গুপ্ত অঙ্গের দিকে দেখা থেকে এবং তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা থেকে বাঁচাবে। এসব বিষয় থেকে চোখকে বিরত রাখার পর এমন বিষয়ে লাগাতে বলবে, যা এই ব্যবসায়ে লাভদায়ক এবং যার জন্যে চোখ সৃষ্ট হয়েছে। যেমন, শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য কারিগরীকে দেখা, সৎকর্মসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা, কোরআন ও হাদীস দেখা এবং জ্ঞানার্জনের জন্যে বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে উপদেশ দেবে। বিশেষত জিহ্বা ও পেট সম্পর্কে অধিক জোর দিয়ে বলবে। কেননা, জিহ্বার ত্রুটিসমূহ— যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, অপরের দোষ বলা, শত্রুর প্রতি অভিসম্পাত করা, বদ দোয়া দেয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদি খুবই অনিষ্টকর। অথচ জিহ্বা সৃষ্টি হয়েছে যিকির, অপরকে যিকিরের উপদেশদান, শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর জন্যে। সুতরাং নফসের সাথে শর্ত করবে যে, সারাদিন যিকির ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে জিহ্বা হেলাবে না। মুমিনের উপকারী কথাবার্তা যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। পেটকে জোরপূর্বক বাধ্য করবে, যাতে লোভ-লালসা ত্যাগ করে এবং হালাল রুযী আহার করে। নফসের সাথে আরও শর্ত করবে যে, বর্ণিত বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটির খেলাফ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আহার বন্ধ করে দেয়া হবে এবং দৈহিক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হবে।

এরপর নফসকে সেসব এবাদতের নির্দেশ দিবে, যেগুলো দিনে কয়েক বার হয়ে থাকে। অতঃপর নফল এবাদত সম্পর্কে উপদেশ দেবে। এসব শর্ত প্রত্যহ নবায়ন করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন এসব এবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন শর্ত করার প্রয়োজন থাকে না।

নফসের সাথে উপরোক্ত রূপ শর্ত করাকে বলা হয় "মুহাসাবা কাবলাল আমল" অর্থাৎ, আমল-পূর্ববর্তী আত্মবিশ্লেষণ। মুহাসাবা কখনও আমলের পরেও হয়। বান্দা যদি সারাদিন তার সামনের আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তা কম-বেশী হল কিনা দেখে, তবে তাও মুহাসাবার অন্তর্ভুক্ত।

মুরাকাবার ফযীলত ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে— হযরত জিবরাঈল (আঃ) একবার রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, 'এহসান' কি? তিনি বললেন ঃ বান্দার এমন মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে। যদি এই ভাব সৃষ্টি করা সম্ভবপর না হয়, তবে কমপক্ষে এমন হওয়া যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। অতএব মুরাকাবার অর্থ এবাদতের সময় এই মনোভাব হওয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দেখছেন এবং আমি আল্লাহকে দেখছি। শেষোক্ত ভাব সম্ভব না হলে কমপক্ষে প্রথমোক্ত মনোভাব সহকারে এবাদত করা। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্ম নিয়ে তার উপর দণ্ডায়মান রয়েছেন।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?

হযরত ইবনুল মুবারক এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মুরাকাবা কর। সে মুরাকাবার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সর্বদা এমনভাবে থাক যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছ। আবু ওছমান মাগরেবী বলেন ঃ অধ্যাত্ম পথে মানুষ যেসব বিষয় নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তম হচ্ছে মুহাসাবা ও মুরাকাবা এবং ইলম দ্বারা আমলের শাসন।

বর্ণিত আছে, কোন এক বুযুর্গের এক তরুণ শিষ্য ছিল। তিনি তার

প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। একদিন অন্যরা আরয করল ঃ ব্যাপার কি, আপনি তার অধিক সম্মান করেন, অথচ সে বয়সে তরুণ এবং আমরা প্রবীণ! উত্তরে বুযুর্গ কয়েকটি পাখী আনিয়ে প্রত্যক শিষ্যকে একটি করে পাখী ও একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাখী এমন জায়গা থেকে যবেহ্ করে আনবে, যেখানে কেউ দেখে না। অতঃপর সকল শিষ্যই নিজ নিজ পাখী যবেহ্ করে আনল। কিন্তু তরুণ শিষ্যটি তার পাখী জীবিতই নিয়ে এল। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যবেহ করলে না কেন? সে বললঃ আমি এমন কোন জায়গা পেলাম না, যেখানে কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্রই আমাকে দেখেন। অতঃপর তরুণের এই মুরাকাবার ভাবটি সমস্ত শিষ্যই পছন্দ করল এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী বলেন ঃ এমন সত্তার মুরাকাবা কর, যাঁর দৃষ্টি থেকে তুমি উধাও হও না। এমন সত্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যাঁর নেয়ামত তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এমন সত্তার এবাদত কর, যাঁর দিক থেকে তুমি বেপরওয়া হতে পার না এবং খুশু ও নম্রতা তাঁর জন্যে কর, যাঁর রাজত্ব থেকে তুমি বাইরে যেতে পার না।

হুমায়দ তবীল সোলায়মান ইবনে আলী (রহঃ)-কে বললেনঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি গোনাহ্ কর, তখন তোমার মধ্যে দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটি ধারণা থাকে— হয় এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দেখছেন। এরূপ হলে তুমি নিঃসন্দেহে দুঃসাহস কর। না হয় এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দেখেন না। এরূপ হলে তুমি নিঃসন্দেহে কাফের।

ফারকাদ সন্জী (রহঃ) বলেন ঃ মুনাফিক এদিক-ওদিক তাকায়। যখন কাউকে দেখে না, তখন দ্রুত গোনাহের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু সে কেবল মানুষকেই ভয় করে— আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করে না।

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শেষরাতে এক জায়গায় বিশ্রামের জন্যে অবতরণ করলে পাহাড় থেকে এক রাখাল তাঁর কাছে এল। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার ছাগপাল থেকে একটি ছাগল আমার কাছে বিক্রি কর। রাখাল আরয করল ঃ আমি

গোলাম। বিক্রি করার ক্ষমতা আমার নেই। হযরত ওমর পরীক্ষার ছলে বললেন ঃ তাতে কি, মালিককে বলে দেবে, একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। গোলাম বলল ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলাকে কি বলব বলে দিন। তিনি তো দেখেন। হযরত ওমর কেঁদে দিলেন এবং গোলামের সাথে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মালিকের কাছ থেকে গোলামকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার মুরাকাবার অবস্থা তোমাকে মুক্ত করেছে। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতেও তোমাকে মুক্ত করবেন।

মুরাকাবার স্বরূপ ও স্তর ঃ সূফীগণের পরিভাষায় এক প্রকার মারেফত থেকে উদ্ভূত অন্তরের একটি অবস্থার নাম মুরাকাবা। এই অবস্থা থেকে কিছু আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং কিছু আমল অন্তরে সৃষ্টি হয়। অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দিকে মশগুল ও মনোযোগী থাকা। যে মারেফত থেকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে অন্তরের যাবতীয় বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত বলে জানা। এই মারেফত যখন নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হয়ে যায়, তখন অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং তার সাহসিকতাকে আল্লাহর দিকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করে দেয়।

মুরাকাবার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর ঃ সিদ্দীকগণের মুরাকাবা। এই স্তরের অবস্থা এই যে, তখন অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ নিরীক্ষণে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অতঃপর তাতে অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ থাকে না। এই মুরাকাবার আমল কেবল অন্তরেই সীমিত থাকে। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া দূরের কথা, অনুমোদিত কাজকর্মের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না। যখন এবাদতের দিকে ধাবিত হয়, তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই ধাবিত হয়। এ কারণেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিক রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার তদবীর ও চেষ্টা-চরিত্রের প্রয়োজন হয় না। সে ব্যক্তিই এরূপ হয়, যার একটি মাত্র চিন্তা থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেন। যে ব্যক্তি এ স্তরে পৌঁছে যায়, সে পরিবেশ থেকে এমন গাফেল হয়ে যায় যে, কেউ তার কাছে এলে সে টের পায় না। চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখে না। কিছু বলা হলে বধির না হওয়া সত্ত্বেও তা শুনে না। এক বুযুর্গের ক্ষেত্রে এমনি হত। তাকে কেউ এজন্য তিরস্কার করলে তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আমার কাছে এস, তখন আমাকে ধাক্কা দিয়ো। এটা

মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এর দৃষ্টান্ত সেসব মানুষের ভেতরও পাওয়া যায়, যারা রাজ-দরবারে বসে রাজার সম্মানে ডুবে থাকে। কখনও মানুষের মন পার্থিব কোন কাজের চিন্তায় এমনভাবে ডুবে যায় যে, কোথাও যাওয়ার সময় অন্যমনস্কভাবে গন্তব্যস্থল পার হয়ে এগিয়ে যায় এবং যে কাজের জন্যে যায়, তাও ভুলে যায়।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এ যুগে আপনি এমন কোন ব্যাক্তিকে জানেন কি, যে নিজের অবস্থায় বেভুল হয়ে মানুষ থেকে বেখবর হয়ে গেছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এমন কেবল এক ব্যক্তিকে জানি, যে এক্ষণি তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। কিছুক্ষণ পরই ওতবা ক্রীতদাস সেখানে এসে উপস্থিত হল। আবদুল ওয়াহেদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথা থেকে এলে? সে এমন এক জায়গার নাম বলল, সেখান থেকে বাজার হয়ে আসতে হয়। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ পথে কারও সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে? সে বলল ঃ না, আমি কাউকে দেখিনি।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবনীতে লেখা আছে— তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার ধাক্কা লেগে এক মহিলা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এ মহিলাকে ধাক্কা দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার কাছে তো প্রাচীর ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি।

হযরত শিবলী (রহঃ) হযরত আবুল হাসান নূরীর কাছে গিয়ে দেখেন তিনি ঘরের এক কোণে চুপচাপ একাগ্র চিত্তে বসে আছেন। দৃশ্যত তার কোন কিছুই নড়াচড়া করছিল না। হযরত শিবলী বললেন ঃ তুমি এই মুরাকাবা ও স্থিরতা কোথায় শিখলে? তিনি বললেন ঃ আমার এখানে একটি বিড়াল ছিল। সে যখন শিকার ধরতে চাইত, তখন ইঁদুরের গর্তের কাছে ওঁৎ পেতে বসে থাকত এবং শরীরের একটি লোমও নাড়া দিত না। তার কাছ থেকে আমি এই পদ্ধতি শিখে নিয়েছি।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফীক বলেন ঃ আমি আবু আলী রুদবারীর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে মিসর থেকে রমল্লা যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। দরবেশ ঈসা ইবনে ইউনুস মিসরী আমাকে বললেন ঃ ছুর নামক স্থানে এক যুবক ও এক প্রৌঢ় ব্যক্তি মুরাকাবায় একত্রে বসে আছে। যদি তুমি তাদেরকে এক নজর দেখে নাও, তবে হয়তো তোমার উপকারই হবে।

একথা শুনে আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ছুরে প্রবেশ করলাম। আমার কোমরে একটি কাপড় বাঁধা ছিল, কাঁধ ছিল খোলা। মসজিদে প্রবেশ করে দু'টি লোককে কেবলামুখী বসে থাকতে দেখলাম। আমি সালাম করলে তারা উত্তর দিল না। আমি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার সালাম করলাম; কিন্তু জওয়াব শুনা গেল না। আমি তাদেরকে সালামের জওয়াব দেয়ার জন্যে কসম দিলাম। যুবক তার নানা রঙের তালি দেয়া পোশাক থেকে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হে ইবনে খফীক! দুনিয়া সামান্য। সামান্য থেকেও সামান্যই রয়ে গেছে। তুমি এ সামান্য থেকে অনেক কিছু করে নাও। তোমার কাজকর্ম খুবই কম। ফলে আমাদের সাথে সাক্ষাতের অবসর পেয়েছ। এরপর সে আমার দিকে লক্ষ্য করল। আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই বিলীন হয়ে গেল। এরপর যুবক মাথা নত করল। আমি তাদের কাছে রইলাম এবং যোহর ও আসরের নামায সে মসজিদেই পড়লাম। আসরের পর আমি বললাম ঃ আমাকে উপদেশ দিন। যুবক আবার মাথা তুলে বলল ঃ হে ইবনে খফীক, আমরা নিজেরাই বিপদগ্রস্ত। নসিহতের ভাষা আমাদের নেই। আমি তাদের কাছে পানাহার ও ঘুম ছাড়াই তিনদিন অবস্থান করলাম। তারাও পানাহার করল না এবং ঘুমালও না। এরপর আমি মনে মনে স্থির করলাম আমাকে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্যে আমি তাদেরকে কসম দেব। সম্ভবত তাদের উপদেশ আমার জন্যে উপকারী হবে। আমি তাই করলাম। সেমতে যুবক মাথা তুলে বলল ঃ হে ইবনে খফীক! এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন কর, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে হয়, অন্তরে তার ভীতি সঞ্চার হয় এবং যে তোমাকে অবস্থার ভাষায় উপদেশ দেয়— কথার মাধ্যমে নয়। এখন তুমি চলে যাও, আসসালাম। যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য প্রবল, তাদের মুরাকাবা এমনি হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্য কোন কিছুর অবকাশ থাকে না।

মুরাকাবার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, এমন পরহেযগারদের মুরাকাবা, যাদের অন্তরে এ বিশ্বাস নিশ্চিতরূপেই প্রবল থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ভেতরের ও বাইরের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু প্রতাপের নিরীক্ষণ তাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ করে না; বরং তাদের অন্তরে হাল ও আমলের প্রতি মনোযোগ দেয়ারও অবকাশ থাকে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের লজ্জা প্রবল থাকে। এ কারণেই তারা কোন কাজ করলে অনেক আস্তে-ধীরে ও ভেবেচিন্তে করে। যে কাজের ফলে কিয়ামতে

অপমান ভোগ করতে হয়, তারা তার ধারে-কাছে যায় না। যেন তারা দুনিয়াতেই আল্লাহ তা'আলাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করে। তাই কিয়ামতের অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

উপরোক্ত দু'টি স্তরের পার্থক্য বাস্তব ঘটনা মাধ্যমেও জানা যায়। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি নির্জনে কোন কাজ করে এবং তার কাছে হঠাৎ কোন মহিলা এসে উপস্থিত হয়, তবে সে লজ্জাবশত পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করে উত্তমরূপে বসবে। এখানে লজ্জার কারণেই সে এরূপ করবে, সম্মানের কারণে নয়। কিন্তু যদি কোন বাদশাহ অথবা বুযুর্গ তার কাছে এসে হাযির হয়, তবে সে তার সম্মানের প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করবে যে, সকল কাজকর্ম ছেড়ে দেবে। এখানে লজ্জার কারণে নয়, বরং সম্মানের দিক দিয়েই এরূপ করবে। আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবায় বান্দার স্তর এমনিভাবেই বিভিন্ন হয়।

যে ব্যক্তি মুরাকাবার স্তরে থাকে, তার প্রথমে দেখা উচিত যে মুরাকাবা সে করতে চায়, তা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, না নিছক খেয়ালখুশী, না শয়তানের অনুসরণ? এ বিষয়টি উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত মুরাকাবা করবে না। এরপর যখন খোদায়ী নূরের মাধ্যমে জানা যাবে এটা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, তখন মুরাকাবার উদ্যোগ নেবে। যদি জানা যায় গায়রুল্লাহর জন্যে, তবে বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে লজ্জাবশত নিজের নফসকে তিরস্কার করবে। যারা প্রথম প্রথম মুরাকাবা করে, তাদের জন্যে এ পদ্ধতিটি ওয়াজেব ও অপরিহার্য। হাদীসে আছে, বান্দার প্রতিটি কাজে তা সামান্য হলেও তিনটি দফতর খোলা হয় এবং তাতে তিনটি প্রশ্ন থাকে। প্রথম দফতরে এ প্রশ্ন থাকে এ কাজটি কেন করলে? দ্বিতীয় দফতরে প্রশ্ন থাকে কিভাবে করলে? তৃতীয় দফতরে প্রশ্ন থাকে কার জন্যে করলে? প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য— এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণে করেছ, না কেবল মনে চেয়েছে তাই করেছ?

যদি প্রথম প্রশ্নের জওয়াব সঠিক হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে— এ কাজ কিভাবে করেছ? অর্থাৎ, নিশ্চিত সজ্ঞানে করেছ, না মূর্খতা সহকারে, না অনুমানের মাধ্যমে? যদি এ প্রশ্নের জওয়াবও শুদ্ধ হয়, তবে তৃতীয় প্রশ্ন হবে— এ কাজ কার জন্যে করেছ? অর্থাৎ, এখলাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি আল্লাহর জন্যে করে থাক, তবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা দেবেন। আর যদি মানুষকে দেখানোর জন্যে করে থাক, তবে মানুষের

কাছেই এর পুরস্কার চাও। আর যদি দুনিয়া পাওয়ার জন্যে করে থাক, তবে তা আমি তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে ফেলেছি। আর যদি ভুলক্রমে করে থাক, তবে সওয়াব খতম এবং আমল বরবাদ হয়েছে। আর যদি অন্য উপাস্যের জন্যে করে থাক, তবে আযাব ও গযবের যোগ্য হয়েছ। কারণ তুমি আমার বান্দা ছিলে, আমার দেয়া রিযিক খেয়েছিলে এবং আমার নেয়ামত ভোগ করেছিলে। এরপর অন্যের জন্যে কাজ করার অর্থ কি? তুমি কি আমার একথা শুননি—

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত কর, তারাও তো তোমাদের মতই আমার বান্দা।

মুহাসাবার ফযীলত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ -

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত, সে আগামীকালের জন্যে কি অগ্রে পাঠিয়েছে।"

এখানে অতীত আমলসমূহের হিসাব নেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমার কাছ থেকে হিসাব নেয়ার পূর্বে তুমি তোমার নফসের কাছ থেকে হিসাব নাও এবং তোমার পরীক্ষা নেয়ার পূর্বে তুমি তার পরীক্ষা নাও। এক হাদীসে আছে— বুদ্ধিমানের জন্যে চারটি মুহূর্ত থাকা উচিত। তন্মধ্যে একটি মুহূর্ত নফসের হিসাব নেয়ার জন্যে থাকা দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই তওবা কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

বলা বাহুল্য, গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর সেটিকে অনুশোচনার দৃষ্টিতে দেখার নামই তওবা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انى لاستغفر الله واتوب اليه فى اليوم مأة مرة -

অর্থাৎ, আমি দৈনিক একশ' বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে যখন শয়তান স্পর্শ করে অমনি সচকিত হয়ে যায়। এরপর তাদের চোখ খুলে যায়।

হযরত ওমর (রাঃ) রাত হলে নিজের পায়ে দুররা দিয়ে আঘাত করতেন এবং নফসকে বলতেন, আজ তুই কি কি করেছিস? মায়মূন ইবনে মেহরান বলেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না— যে পর্যন্ত সে নফসের হিসাব এমনভাবে না নেয়, যেমন ব্যবসায়ে শরীকের কাছ থেকে নেয়া হয়। হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) একবার খড়ির বোঝা মাথায় তুলে নিলে এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এ কাজের জন্যে তো আপনার গোলামই ছিল। তিনি বললেন ঃ আমার নফস এটা খারাপ মনে করে কি না আমি তাই পরীক্ষা করছিলাম।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মুমিন তার নফসের ব্যবস্থাপক হয়ে থাকে। আল্লাহর ওয়াস্তে সে তার কাছ থেকে হিসাব নেয়। কিয়ামতে তাদের হিসাব হালকা হবে, যারা দুনিয়াতে নিজের নফসের কাছ থেকে হিসাব নেয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন— একদিন আমি হযরত ওমরের সাথে বাইরে বের হলাম। তিনি এক বাগানে চলে গেলেন। আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়াল ছিল। আমি তাঁকে বাগানে একথা বলতে শুনলাম ঃ কি চমৎকার, ওমর ইবনে খাত্তাব এখন আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহর কসম, তুই আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোকে আযাব দেবেন।

আহ্নাফ ইবনে কায়সের কোন এক শিষ্য বর্ণনা করেন— আমি আমার শায়খের সাথে থাকতাম। তিনি রাতের বেলায় নামাযের জায়গায় বসে অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন এবং বাতির কাছে গিয়ে তার শিখায় নিজের আঙ্গুল রাখতেন। যখন তীব্র উত্তাপ অনুভূত হত, তখন নফসকে বলতেন— তুই অমুক দিন অমুক কাজ কেন করেছিলে?

আমলের পর আত্মবিশ্লেষণ ঃ নফসের সাথে শর্ত করার জন্যে দিনের শুরুতে যেমন একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা দরকার, তেমনি দিনের শেষেও একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা জরুরী। তাতে বান্দা তার সারাদিনের আমলের হিসাব নফসের কাছ থেকে গ্রহণ করবে। দুনিয়াতে ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার শরীকদের কাছ থেকে বছরের শেষে অথবা মাসের শেষে অথবা দিনের শেষে এমনি ধরনের হিসাব নিয়ে থাকে, যাতে দুনিয়ার অর্থকড়ি বিনষ্ট না হয়ে যায়। অথচ দুনিয়ার অর্থকড়ি বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীর জন্যে উত্তম। বিনষ্ট না হয়ে পাওয়া গেলেও তা একান্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তু। ধ্বংসশীল বস্তুর জন্যে মানুষ যখন এতটুকু ঝামেলা পোহায়, তখন চিরন্তন সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তার হিসাব মানুষ নিজের নফসের কাছ থেকে কেন নিবে না?

শরীকের সাথে হিসাব-কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে পুঁজি ঠিক আছে কি না যাচাই এবং লাভ-লোকসান কতটুকু হয়েছে, তা দেখা। কিছু লাভ হলে তা নেয়া এবং তার কৃতিত্বের জন্যে ধন্যবাদ দেয়া। আর যদি লোকসান হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্যে তার ক্ষতিপূরণ করা। এমনিভাবে ধর্মে-কর্মে বান্দার পুঁজি হচ্ছে ফরয কর্মসমূহ, লাভ নফল ও মোস্তাহাব কর্মসমূহ এবং লোকসান গোনাহখাতা। এ ব্যবসায়ের সময়-কাল হচ্ছে সমস্ত দিন এবং এর পরিচালক হচ্ছে নফসে আম্মারা তথা কুকর্মের আদেশকারী রিপু। সুতরাং প্রথমে তার কাছ থেকে ফরয কর্মসমূহের হিসাব নেয়া উচিত সে তা যথাযথ আদায় করেছে কি না। করে থাকলে আল্লাহর শোকর করে নফসকে উৎসাহ দেয়া উচিত যেন সে এমনি করে। আর যদি ফরয আদায় না করে থাকে, তবে তার কাছে এগুলোর কাযা দাবী করা উচিত। অসম্পূর্ণরূপে আদায় করে থাকলে নফল দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

আর যদি নফস গোনাহ করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেয়ার কাজে মশগুল হতে হবে, যাতে সে কৃত গোনাহের ক্ষতি উত্তমরূপে পূরণ করে নিতে পারে। দুনিয়ার হিসাবে যেমন কড়াগণ্ডা খুঁজে বের করা হয়, তেমনি নফসের বেলায়ও করা দরকার। নফসের আত্মসাৎ ও প্রতারণা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা উচিত। নফস অত্যন্ত প্রতারক ও ধোকাবাজ। সুতরাং তার কাছ থেকে সারাদিনের কথাবার্তার সঠিক জওয়াব চাইবে।

এমনিভাবে দৃষ্টি, চিন্তাভাবনা, উঠাবসা, পানাহার ও নিদ্রার হিসাব নিতে হবে। এমনকি, চুপ থাকারও জওয়াব চাইতে হবে যে, কেন চুপ রইল। এভাবে এক এক দিনের হিসাব নেয়ার পর সারা জীবনের দিন ও মুহূর্তসমূহের হিসাব নিতে হবে। সেমতে সূবা ইবনে সাম্মার জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি রিক্কা নামক স্থানে বাস করে নিজের নফসের হিসাব নিতেন। একদিন তিনি নিজের বয়স হিসাব করে দেখলেন ষাট বছর পূর্ণ হয়েছে। ষাট বছরের দিন হিসাব করে একুশ হাজার ছ'শ' দিন পেলেন। এরপর তিনি হঠাৎ এক চিৎকার করে বললেন ঃ হায়! আমি একুশ হাজার ছ'শ' গোনাহ নিয়ে রাব্বুল আলামীনের সামনে হাযির হব! যদি দৈনিক দশটি গোনাহ করে থাকি, তবে আমার কি উপায় হবে! এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি ওফাত পেয়েছেন। এমনিভাবে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব করবে। যদি মানুষ প্রত্যেক গোনাহের পর একটি কংকর নিজের ঘরে রেখে দেয়, তবে অল্পদিনেই তার ঘর কংকরে ভর্তি হয়ে যাবে। মানুষ অনেক গোনাহ করে, কিন্তু তা স্মরণ রাখার ব্যাপারে তার শৈথিল্যের অন্ত নেই। অথচ তার দুই কাঁধে বসে দুই ফেরেশতা নিরন্তর তার গোনাহসমূহ লিখে যায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা গুনে রাখেন, অথচ মানুষ তা ভুলে যায়।

ক্রটির পর নফসের শাসন ঃ নফসের হিসাব নেয়ার পর যদি দেখা যায়, নফস চেষ্টা সত্ত্বেও অপরাধ ও ক্রটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তবে তাকে ঢিলা ছেড়ে দেবে না। কেননা, ঢিলা ছেড়ে দিলে একের পর এক গোনাহ করা তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে। গোনাহের প্রতি তার এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হবে— যা থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যাবে। আর তাই হবে তার ধ্বংসের কারণ। বরং এমতাবস্থায় নফসকে শাস্তি দিতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কামনার তাড়নায় কোন সন্দেহযুক্ত লোকমা খেয়ে ফেলে, তবে উদরকে ক্ষুধার শাস্তি দেবে। যদি পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে, তবে চোখকে কিছু দেখতে দেবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক অঙ্গের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। অধ্যাত্ম পথের পথিকদের এটাই ছিল রীতি। সেমতে মনসুর ইবনে ইবরাহীম জনৈক আবেদের অবস্থা লিখেন যে, সে এক মহিলার সাথে কথাবার্তা বলল। এরপর ক্রমান্বয়ে তার উরুর উপর

হাত রাখল। এরপরই সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের হাত আগুনে রেখে দিল। ফলে তা জ্বলে-পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত তার এবাদতখানায় এবাদত করছিল। একদিন সে বাইরের দিকে তাকিয়ে এক মহিলাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। তার মনে কুবাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে মহিলার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের পা এবাদতখানার বাইরে রাখল। অমনি আল্লাহর রহমত তার সাহায্যে এগিয়ে এল। তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল এবং সে মনে মনে বলতে লাগল ঃ আমি একি করছি! অতঃপর সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে পা এবাদতখানার ভেতরে নিতে চাইল। সে ভাবতে লাগল, যে পা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর জন্যে বাইরে এসেছিল, সে আবার আমার সাথে এবাদতখানায় কিরূপে যাবে? আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না। অতঃপর সে তার পা বাইরেই রেখে দিল। বৃষ্টি, বরফ, বাতাস ও রৌদ্র লেগে লেগে এক সময় সে পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার এই তওবা কবুল করলেন এবং তার কথা পরবর্তী আসমানী কিতাবে উল্লেখ করলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত গযওয়ান ও হযরত আবু মূসা এক সাথে কোন এক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। এক মহিলা আত্মপ্রকাশ করলে গযওয়ান তার দিকে তাকালেন। এরপর হাত তুলে আপন চোখে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে চোখ ফুলে গেল। তিনি চোখকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ তুই এমন বস্তুর দিকে দেখিস, যা তোর জন্যে ক্ষতিকর।

মালেক ইবনে যয়গম বর্ণনা করেন, একদিন রেমাহ কায়সী আসরের পর আমাদের বাড়ীতে এসে আমার পিতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ এ সময়ে ঘুম! এখন কি ঘুমের সময়! অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন। আমি তার পেছনে এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালাম যে, আপনি বললে আমরা তাকে জাগিয়ে দেই। লোকটি ফিরে এসে বললঃ তিনি তো ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফুরসত তার ছিল না। অতঃপর আমি তাকে দেখতে ছুটলাম। দেখলাম তিনি কবরস্তানে রয়েছেন এবং নিজের নফসকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন— তুই একথা কেন বললি যে, এ কি ঘুমের সময়? একথা বলা তোর জন্যে কি জরুরী ছিল? মানুষ যখন ইচ্ছা ঘুমাবে। তুই

কে? তুই কি জানিস তা ঘুমের সময় কি না? খবরদার! আমি আল্লাহ তাআলার সাথে পাকা অঙ্গীকার করছি, যা কোনদিন ভঙ্গ করব না। আমি এক বছর পর্যন্ত ঘুমের জন্যে মাটিতে কোমর লাগাব না— যদি কোন অসুখ-বিসুখ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে। নির্লজ্জ কোথাকার, তুই কতদিন অন্যকে শাসন করবি এবং নিজে গোনাহ্ থেকে বিরত হবি না? তিনি এসব কথা বলে কেঁদে যাচ্ছিলেন। তার খবরই ছিল না যে, আমিও সেখানে রয়েছি। এই অবস্থা দেখে আমি তাকে তেমনি রেখে চলে এলাম।

তামীম দারেমী এক রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাহাজ্জুদের জন্যে জাগতে পারলেন না। তিনি নফসকে এর শাস্তি এই দিলেন যে, এক বছর পর্যন্ত অনবরত রাত্রি জাগরণ করলেন এবং নিদ্রাকে হারাম করে নিলেন।

হযরত তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একদিন বস্ত্র খুলে গ্রীষ্মকালে কংকরের উপর খুব গড়াগড়ি করল। সে তার নফসকে বলছিল— হে রাতের মৃত এবং দিনের অকর্মণ্য! এখন মজা দেখ। জাহান্নামের উত্তাপ এর চেয়েও অনেক বেশী। ইতিমধ্যে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর লোকটির নজর পড়ল। তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন। সে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার নফস আমার উপর প্রবল হয়ে গেছে। তিনি এরশাদ করলেন ঃ যে চিকিৎসা তুমি করেছ, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। জেনে নাও, তোমার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেছেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের এই ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু পাথেয় নিয়ে নাও। এরপর চারদিক থেকে তাকে বলা হল ঃ মিয়াঁ, আমাদের জন্যেও দোয়া করো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তাদের সকলের জন্যে দোয়া কর। লোকটি বলল ঃ ইলাহী, তাকওয়াকে তাদের পাথেয় বানাও এবং হেদায়েতের উপর সবাইকে সংহত কর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, তুমি তাকে সরল পথে রাখ।

ইবনে সেমাক (রহঃ) হযরত দাউদ তাঈর খেদমতে তখন পৌঁছেন, যখন তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তার লাশ তখনও ঘরেই রাখা ছিল। তিনি চোখ দেখে বললেন ঃ হে দাউদ! তুমি কয়েদী হওয়ার পূর্বেই নিজের নফসকে কয়েদী করেছ এবং আযাবপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে আযাব দিয়েছ। যে সত্তার জন্যে তুমি এ কাজ করতে, আজ দেখবে তিনি তোমাকে কেমন বিপুল সওয়াব দান করেন!

মুহাম্মদ ইবনে বিশর দাউদ তাঈকে দেখলেন, রোযার ইফতারের পর তিনি পানসে রুটি খাচ্ছেন। তিনি আরয করলেন ঃ আপনি লবণ দিয়ে রুটি খেয়ে নিন। দাউদ তাঈ বললেন ঃ আমার নফস দশদিন ধরে লবণ খেতে চায়। কিন্তু দাউদ যতদিন দুনিয়াতে থাকবে লবণের স্বাদ গ্রহণ করবে না। মোটকথা, সাবধানী ব্যক্তিবর্গ নফসকে এমনিভাবে সাজা দিতেন।

মোজাহাদা ঃ এর অর্থ চেষ্টা, পরিশ্রম ও সাধনা। গোনাহ্ ও ত্রুটির কারণে নফসকে উপরোক্ত রূপে সাজা দেয়ার পর দেখবে, নফস কোন মুস্তাহাব কাজে অথবা ওযীফায় অলসতা করে কি না। যদি অলসতা করে, তবে তার শাসন হল, ওযীফার বোঝা তার উপর চেপে দেয়া এবং অতীত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে কয়েক প্রকারের ওযীফা তার জন্যে অপরিহার্য করা। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এভাবেই আমল ও মোজাহাদা করতেন। সেমতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর যখন জামাত কাযা হয়ে যেত, তখন তিনি সারা রাত জেগে নফল এবাদত করতেন। একবার মাগরিবের নামাযে এতটা বিলম্ব হয়ে যায় যে, সন্ধ্যা তারা দেখা যেতে থাকে। তিনি এ কারণে দু'টি গোলাম মুক্ত করে দেন। ইবনে আবী রবীআর ফজরের সুন্নত কাযা হয়ে গেলে তিনি একটি গোলাম মুক্ত করে দেন। কোন কোন বুযুর্গ নিজের উপর সারা বছরের রোযা অথবা পদব্রজে হজ্জ অথবা সমুদয় সম্পদ সদকা করে দেয়া জরুরী করে নিতেন।

এখানে প্রশ্ন হল, যদি নফস সার্বক্ষণিক ওযীফার সাধনা করতে প্রস্তুত না হয়, তবে তার প্রতিকার কি? জওয়াব এই যে, হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত মোজাহাদাকারীগণের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব নফসকে শুনাতে হবে। সর্বাধিক উপকারী প্রতিকার হচ্ছে, যে ব্যক্তি এবাদতে খুব মোজাহাদা করে, তার সংসর্গে থাকা, তার অবস্থা দেখা এবং অনুসরণ করা। জনৈক বুযুর্গ বলতেন, এবাদতে যখন আমি কিছুটা অলসতার সম্মুখীন হতাম, তখন আমি খ্যাতনামা বুযুর্গ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের অবস্থা ও মোজাহাদা প্রত্যক্ষ করতাম। এক সপ্তাহ্ পর্যন্ত তাই করতাম। ফলে অলসতা দূর হয়ে যেত। কিন্তু এই চিকিৎসা কঠিন। কেননা, আজকাল এবাদতে মোজাহাদা করে এরূপ ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তীদের মোজাহাদা এখন নেই। পূর্ববর্তীদের অবস্থা শোনার চেয়ে উত্তম কোন চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান যুগে নেই। তাই পূর্ববর্তীদের রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাদের পরিশ্রম ও সাধনা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু

সওয়াব ও সুফল চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে। যে তাদের অনুসরণ করে না, তার জন্যে বড়ই পরিতাপ।

নিম্নে আমরা মোজাহাদাকারীদের গুণাবলী উল্লেখ করব, যেগুলো পাঠ করে মুরীদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অনুসরণ করে আমলে পরিশ্রম ও সাধনা অর্জিত হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

رحم الله اقواما يحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى -

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি রহম করুন, যাদেরকে মানুষ রুগ্ন মনে করে, অথচ তারা রুগ্ন নয়।

হযরত হাসান বলেন, এই হাদীসে রুগ্ন বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে এবাদত ও সাধনা রোগীর মত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ -

অর্থাৎ, যারা পালন করে যা তারা পালন করে এবং তাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত।

হযরত হাসান বলেন, এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সৎকর্ম সাধ্যমত সম্পাদন করার পরও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, এসব আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাবে কি না!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله -

অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই সুখী, যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ আমার যে সব বান্দা মোজাহাদা ও চেষ্টা করে, তারা কেন এমন করে? ফেরেশতারা বলে— ইলাহী, তুমি তাদেরকে একটি বিষয়ের ভয় প্রদর্শন করেছ এবং একটি বিষয়ের জন্যে আগ্রহান্বিত করেছ। তাদের চেষ্টা ও সাধনা এ কারণেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে দেখতে পেলে

কি হবে? ফেরেশতারা আরয করে, তাহলে তাদের চেষ্টা ও মোজাহাদা আরও বেড়ে যাবে।

হযরত হাসান বলেন ঃ আমি অনেক লোককে দেখেছি এবং তাদের সাথে অবস্থান করেছি। তারা দুনিয়ার কোন বস্তু পেয়ে আনন্দিত হয় না এবং কোন বস্তু হারিয়েও দুঃখ করে না। দুনিয়া তাদের কাছে সে মাটির চেয়েও নিকৃষ্ট, যাকে তোমরা পদতলে পিষ্ট কর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যে, সারাজীবন তাদের কোন কাপড় জুটেনি, কখনও স্ত্রীর কাছে কোন খাদ্যের ফরমায়েশ করেনি এবং ঘুমানোর জন্যে মাটিতে কোন কিছু বিছায়নি। এতদসত্ত্বেও আমি তাদেরকে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমলকারী পেয়েছি। যেখানে রাত হত, সেখানেই তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যেত। মুখমণ্ডল মাটিতে রাখত এবং অশ্রুতে কপোল ভাসিয়ে দিত। তারা যখন কোন ভাল কাজ করত, তখন আনন্দিত হত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তা কবুল করার দোয়া করত। পক্ষান্তরে যখন কোন খারাপ কাজ করত, তখন অনুতপ্ত হত এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা করার জন্যে কাকুতি-মিনতি করত। বিশ্বাস কর, তারা সব সময় এ অবস্থায়ই থাকত। তারা গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা না করে এবং মাগফেরাত ছাড়া নাজাত পায়নি অর্থাৎ, এত কিছুর পরও নাজাতের জন্যে তাদেরকে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাগফেরাত কামনা করতে হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয অসুস্থ হলে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। তাদের মধ্যে জনৈক যুবক ছিল অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্বল। ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার এই দুরবস্থা কেন? যুবক বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন, অসুখ-বিসুখের কারণেই এই অবস্থা। তিনি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য কথা বল। যুবক আরয করল ঃ সত্য এই যে, আমি দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে দেখলাম তা তিক্ত। ফলে, দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, আরাম-আয়েশ সবই আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে গেছে। সোনা ও পাথর আমার কাছে একই রকম মনে হয়। আমার অবস্থা এই থাকে যে, আমি যেন আরশের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষকে দলে দলে জান্নাতে ও দোযখে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এ ভয়েই সারাদিন পিপাসিত থাকি এবং সারারাত

জেগে এবাদত করি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সওয়াব ও শাস্তির সামনে আমার এই এবাদত নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য বৈ নয়।

আবু নাঈম বলেন ঃ দাউদ তাঈ রুটির ক্ষুদ্রাংশসমূহ পানিতে গুলিয়ে পান করে নিতেন। রুটি খেতেন না। এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ রুটি চিবোতে অনেক সময় লেগে যায়। পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করার চেয়ে বেশী সময় রুটি খাওয়ায় ব্যয় হয়ে যায়। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে এসে বলল ঃ আপনার ঘরের ছাদে একটি কাঠ ভেঙ্গে গেছে। তিনি বললেন ঃ তা হতে পারে। কারণ, বিশ বছর ধরে আমি ছাদের দিকে তাকাইনি।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অনর্থক কথাবার্তার ন্যায় অনর্থক দৃষ্টিপাতকেও খারাপ মনে করতেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ একবার আহমদ যরীনের কাছে আমরা সকাল থেকে আসর পর্যন্ত বসে রইলাম। কিন্তু তিনি না ডানদিকে তাকালেন, না বামদিকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি চক্ষু দান করেছেন, যাতে বান্দা এগুলো দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য দর্শন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াই দর্শন করে, তার জন্যে গোনাহ্ লেখা হয়।

হযরত আবু দারদা বলেন ঃ যদি তিনটি বিষয় না থাকতো, তবে আমি এক দিনের জীবনকেও ভাল মনে করতাম না— (১) দুপুরে আল্লাহ্র জন্যে তৃষ্ণার্ত থাকা, (২) অধিক রাতে সেজদা করা এবং (৩) এমন লোকদের সংসর্গে বসা, যারা গ্রীষ্মকালে উত্তম খোরমা বাছাই করার মত সৎকর্ম বাছাই করে। আসওয়াদ ইবনে এয়াযীদ এবাদতে মোজাহাদা করতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে রোযা রাখতেন। ফলে, তাঁর দেহ সবুজ ও ফ্যাকাসে হয়ে যেত। আলকামা ইবনে কায়স তাঁকে বলতেন ঃ তুমি নিজের নফসকে আযাব দিচ্ছ কেন? তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ আমি তো তাকে সম্মানিত করতে চাই। রোযার সাথে সাথে তিনি নামায এত বেশী পড়তেন যে, প্রায়ই মাটিতে পড়ে যেতেন। আনাস ইবনে মালেক ও হাসান একবার তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এসব কাজের হুকুম দেননি; অর্থাৎ, এতটুকু মোজাহাদা ফরয করেননি। তুমি কেন তা কর? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি মালিকানাধীন গোলাম। মিনতি ও অসহায়তা প্রকাশ পায়— এমন কোন কাজ না করে থাকতে পারি না।

ছাবেত বানানী (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, নামায ছিল তাঁর সর্বাধিক

প্রিয় কাজ। তাই তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করতেন— ইলাহী, যদি তুমি কাউকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দাও, তবে তা আমাকেই দিয়ো— যাতে আমি কবরেও নামায পড়তে পারি।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত সিররী অপেক্ষা অধিক এবাদতকারী কাউকে দেখিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল আটানব্বই বছর। কিন্তু মৃত্যুশয্যা ছাড়া তাঁকে কেউ কখনও শায়িত দেখেনি।

আবু মুহাম্মদ মাগাযেলী বলেন ঃ আবু মুহাম্মদ জারীরী (রহঃ) পূর্ণ এক বছর মক্কা মোয়াযযমায় কা'বাগৃহের খাদেম হয়ে বসবাস করেন। এ সময়ে কখনও তিনি ঘুমাননি, কথা বলেননি, স্তম্ভ অথবা প্রাচীরে হেলান দেননি এবং পা ছড়িয়ে বসেননি। একদিন আবু বকর কুত্তানী (রহঃ) তার কাছে গিয়ে সালাম করে বললেন ঃ আপনি কিসের বলে এই এতেকাফে সক্ষম হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ যে ইলম আমার অন্তরকে পাকাপোক্ত রেখেছে, সে ইলমই আমাকে বাহ্যিক কাজে সহায়তা করেছে। এই জওয়াব শুনে কুত্তানী মাথানত করে চিন্তা করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বর্ণিত আছে, কিছু লোক সফরে পথ ভুলে গেল। তারা জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দরবেশের কাছে গিয়ে পৌঁছল। দরবেশকে ডাক দিলে সে এবাদতখানা থেকে মাথা বের করে তাদের দিকে দেখল। তারা বলল ঃ পথ কোন্ দিকে? আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। দরবেশ মাথায় ইশারা করে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিল। আগন্তুকরা এর উদ্দেশ্য বুঝে নিল যে, দরবেশ মারেফতের পথ দেখাচ্ছে। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব, জওয়াব দেবে কি? দরবেশ বলল ঃ জিজ্ঞেস কর; কিন্তু বেশী নয়। কেননা, দিন পুনরায় ফিরে আসবে না এবং মৃত্যু তাড়াহুড়া করছে। তার কথাবার্তায় সবাই বিস্মিত হল। তারা বলল ঃ আসন্ন কিয়ামতে কি বিষয়ের উপর মানুষের হাশর হবে? দরবেশ বলল ঃ নিজ নিজ নিয়তের উপর। তারা বলল ঃ আমাদের কিছু উপদেশ দাও। সে বলল ঃ নিজের নফসের স্তর অনুযায়ী পাথেয় সংগ্রহ কর। উত্তম পাথেয় তা'ই, যা মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছায়। এরপর তাদেরকে পথ বলে দিয়ে সে মাথা ভেতরে নিয়ে গেল।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আমি এক চীন দেশীয় দরবেশের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে "ও দরবেশ" বলে ডাকলাম। সে জওয়াব দিল না। আমি দ্বিতীয়বার ডেকে জওয়াব পেলাম না। তৃতীয়বার

ডাকার পর সে আমার দিকে মাথা তুলে বলল ঃ মিয়া সাব, আমি দরবেশ নই। দরবেশ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর সম্মান করে, তাঁর বিপদে সবর করে, তাঁর ফয়সালায় রাযী থাকে, তাঁর নেয়ামতের শোকর করে, তাঁর মাহাত্ম্যের সামনে বিনম্র হয়, তাঁর ইযযতের মোকাবিলায় হেয় থাকে, তাঁর হিসাব ও আযাব নিয়ে চিন্তা করে, দিনে রোযা রাখে, রাতে দাঁড়িয়ে এবাদত করে, দোযখের স্মরণ যাকে ঘুমাতে দেয় না। এ হচ্ছে দরবেশ। আমি তো একটি ক্ষেপা কুকুর মাত্র। আমি নিজেকে এই এবাদতখানায় আটকে রেখেছি, যাতে মানুষকে কামড় না দেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম— কি বিষয় মানুষকে আল্লাহ তা'আলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আল্লাহকে চেনার পর তারা বিমুখ কেন? সে বলল ঃ ভাই, কেবল দুনিয়ার মহব্বত ও সাজ-সজ্জা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দুনিয়া গোনাহ ও নাফরমানীর জায়গা। সে-ই হুশিয়ার ও সতর্ক, যে দুনিয়াকে মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে, আল্লাহর সামনে গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং নৈকট্যের বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগী হয়। হযরত ওয়ায়স করনী (রহঃ) এক রাত্রিকে বলতেন— এটা রুকুর রাত। অতঃপর সে রাতে এক রুকু করেই ভোর করে দিতেন। যখন পরের রাত আসত, তখন বলতেন— এটা সেজদার রাত। অতঃপর সে রাতও সেজদায় কাটিয়ে দিতেন।

বর্ণিত আছে, ওতবা গোলাম (রঃ) যখন তওবা করলেন, তখন পানাহারের প্রতি তার মোটেই আকর্ষণ ছিল না। তার স্নেহময়ী জননী বলতেন— বাছা, নিজের নফসের প্রতি নম্র হও। তিনি বলতেন— মা, আমি আরামই চাই। এখন সামান্য কষ্ট করে নিতে দাও। এরপর সুদীর্ঘকাল আরামই করব।

রবী' ইবনে খায়ছামের কন্যা পিতাকে জিজ্ঞাসা করত— আব্বাজান, ব্যাপার কি? সব মানুষ ঘুমায় কিন্তু আপনি ঘুমান না? তিনি বলতেন, বেটী, আমি আগুনকে ভয় করি। তার জননী পুত্রের কান্নাকাটি ও রাত্রি জাগরণের অবস্থা দেখে একদিন বলল ঃ বাছা, তুমি বোধ হয় কাউকে খুন করেছ। ফলে, এমন উদ্বিগ্ন থাক। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, মা। মা বলল ঃ কে সেই ব্যক্তি? আমি তার আত্মীয়-স্বজনকে খোঁজ করব, যাতে তারা তোমাকে মাফ করে দেয়। তোমার এই দুরবস্থা তারা দেখলে অবশ্যই দয়ার্দ্র হয়ে ক্ষমা করে দেবে। তিনি বললেন ঃ মা, সেতো আমার নফস। রবী' বলেন ঃ আমি হযরত ওয়ায়স করনী (রহঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁকে ফজরের

নামাযের পর বসা অবস্থায় পেলাম। আমিও বসে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, তাঁর ওযীফায় বাধা দেয়া উচিত হবে না। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না, এমনকি যোহর পড়লেন। যোহরের পর আসর পর্যন্ত একটানা নামায পড়তে থাকলেন। আসরের পর নিজের জায়গায় বসে গেলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত বসে রইলেন। মাগরিবের বৈঠকে বসলেন এবং এশা পড়লেন। এরপর আবার বসে রইলেন। অবশেষে ফজরের নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে বললেন ঃ ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই এমন চক্ষু থেকে, যে চক্ষু ঘুমিয়ে পড়ে এবং এমন পেট থেকে, যে তৃপ্ত হয় না। আমি মনে মনে বললাম ঃ তাঁর কাছ থেকে আমার এতটুকুই যথেষ্ট। অতঃপর চলে এলাম।

জনৈক আবেদ বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি সবেমাত্র এশার নামায সমাপ্ত করেছেন। অতঃপর তিনি কি করেন, তা দেখার জন্যে আমি বসে রইলাম। তিনি নিজেকে একটি কম্বলে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন এবং সারারাত একবারও পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন না। অবশেষে ভোর হল। মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে নামাযে শরীক হলেন। কিন্তু উযু করলেন না। এতে আমার মনে খটকা বাজল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি সারারাত শুয়ে ঘুমালেন। এরপরও নতুন উযু করলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি তো সারারাত কখনও জান্নাতের বাগ-বাগিচায় এবং কখনও দোযখের জঙ্গলসমূহে ছুটাছুটি করেছি। এমতাবস্থায় কি ঘুম আসে?

হযরত আলী (রাঃ)-এর জনৈক সহচর বর্ণনা করেন— আমি তাঁর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি ডানদিকে ফিরে বসলেন। তিনি কিছুটা চিন্তান্বিত ছিলেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি এভাবেই বসে রইলেন। অতঃপর বামদিকে ফিরে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি। আজকাল তাদের অনুরূপ কোন দ্বীনদারী দেখা যায় না। তারা ভোরবেলা মলিন, ফ্যাকাসে ও এলোকেশে গাত্রোত্থান করতেন। রাত সেজদা ও নামাযে কাটিয়ে দিতেন এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন। যখন যিকির করতেন, তখন ঝড়ের দিনে গাছ যেমন আন্দোলিত হয়, তেমনি আন্দোলিত হতেন। তাদের চোখের অশ্রু পরনের বস্ত্র ভিজিয়ে দিত। কিন্তু আজকাল আপনারা কি করেন, সারারাত গাফেল হয়ে নিদ্রা যান।

আবু মুসলিম খওলানী তাঁর নামাযের ঘরে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের নফসকে ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন— মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ হয়তো মনে করবেন, দ্বীনদারী কেবল তাঁরাই করে গেছেন, অন্যরা এতে তাঁদের সাথে শরীক হয়নি। আল্লাহর কসম, আমিও একাজে তাঁদের সাথে উত্তমরূপে যোগদান করব, যাতে তাঁরাও জানেন তাঁদের পেছনে কিছু লোক রয়ে গেছে।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন ঃ আমার নিয়ম ছিল প্রত্যহ সকালে উঠে প্রথমে আমার ফুফী আম্মা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করা। একদিন সকালে গিয়ে দেখি, তিনি চাশতের নামায পড়ছেন। নামাযে اَفَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ আয়াতখানি বারবার পাঠ করে কাঁদছেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তাঁর নামায ও ক্রন্দন শেষ হচ্ছিল না। বিলম্ব দেখে আমি এই মনে করে বাজারে চলে গেলাম যে, প্রথমে নিজের কাজ শেষ করে পরে এসে সালাম করে যাব। আমি কাজ শেষ করে ফিরে এসে তাঁকে পূর্ববৎ ক্রন্দনরত ও দোয়ারত অবস্থায় পেলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে আমার বাড়িতে অতিথি হন। হঠাৎ তাঁর একটি পা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে এশার উযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মৃত্যুকে মোটেই ভয় করি না; কেবল আশংকা করি, আমার তাহাজ্জুদের নামায বন্ধ হয়ে না যায়!

হযরত হাসানকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এর কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ নূর থেকে কিছু নূর পরিয়ে দেন।

মোটকথা, এ হচ্ছে পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোজাহাদা ও মুরাকাবার অবস্থা। এখন যদি তোমার নফস অবাধ্য হয় এবং এবাদতে শৈথিল্য করে, তবে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা কর। কেননা, এধরনের লোকদের অস্তিত্ব এখন বিরল। আর যদি তাদেরকে দেখার ভাগ্য হয় এবং দেখে অনুসরণ করতে পার, তবে সোনার উপর সোহাগা। কেননা, অনুসরণের ক্ষেত্রে দেখার প্রভাব শোনার চেয়ে বেশী।

যদি তোমার নফস বলে পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো যবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাদের অনুসরণের সাধ্য আমাদের নেই, তবে যে সব মহিলা এবাদতে মোজাহাদা করে গেছেন, তাদের ঘটনাবলী পাঠ করে আপন নফসকে বল ঃ হতভাগা, তোর লজ্জা নেই? তুই কি অবলা মহিলাদেরও পেছনে পড়ে থাকবি? পুরুষ হয়ে দুনিয়া অথবা দ্বীনের ব্যাপারাদিতে মহিলাদের পেছনে পড়ে থাকা খুবই অপমানের কথা।

এখন আমরা মহিলাদের মধ্যে যারা মোজাহাদা করেছে, তাদের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করব।

বর্ণিত আছে, হাবীবা আদভিয়া যখন এশার নামায শেষে নিজের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, ইলাহী, তারকারাজি বিচ্ছুরিত হয়েছে, চক্ষুসমূহ মুদিত হয়ে গেছে, বাদশাহরা দরজা বন্ধ করে নিয়েছে এবং প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর সাথে একান্তে চলে গেছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। এরপর তিনি নামায পড়তে থাকতেন। ফজর হয়ে গেলে বলতেন, ইলাহী, রাত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং দিন আলোকিত হয়েছে। আমি জানি না, তুমি আমার এই রাত কবুল করেছ কিনা। কবুল করার কথা জানলে নিজেকে মোবারকবাদ দিতাম। আর নামনযুর করার কথা জানলে অনুতাপ প্রকাশ করতাম। তোমার ইযযতের কসম, যতদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখবে, এ কর্মপন্থা অব্যাহত রাখব। তুমি আমাকে নিজের দরজা থেকে ধাক্কা দিলেও আমি এতটুকুও টলব না। কেননা, আমার অন্তরে তোমার কৃপা ও দান অনেক।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আমার একটি রোমীয় বাঁদী ছিল। তার প্রতি আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলাম। একরাতে যখন সে আমার কাছে ঘুমিয়ে ছিল, তখন আমি জেগে দেখি, সে বিছানায় নেই। আমি তাকে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদে গেলাম। দেখি, সে মাটিতে পড়ে বলে যাচ্ছে— ইলাহী, আমার প্রতি তোমার যে মহব্বত, তার ওসীলায় আমাকে ক্ষমা কর। আমি বললাম ঃ আমার প্রতি তোমার যে মহব্বত— একথা বলো না; বরং বল ঃ তোমার প্রতি আমার যে মহব্বত, তার ওসীলায় আমার গোনাহ মাফ কর। বাঁদী বলল ঃ প্রভু, তা নয়। তিনিই আমাকে মহব্বত করেন। সে কারণেই তো আমাকে শিরক থেকে বের করে ইসলাম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং আমাকে রাতের বেলায় জাগিয়ে রেখেছেন।

আবু হাশেম কারশী বলেন ঃ একবার ইয়ামনের সারিয়্যা নাম্নী এক মহিলা আমাদের ঘরে এসে অবস্থান করে। রাত হলেই আমি তার

কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেতাম। একদিন আমি আমার খাদেমকে বললাম ঃ এই মহিলাকে উঁকি দিয়ে দেখ তো সে কি করছে? সে দেখে জানতে পারল সে অনিমেষ নেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলামুখী হয়ে বলে যাচ্ছে ঃ ইলাহী, তুমি সারিয়্যাকে সৃষ্টি করেছ, অতঃপর নিজের নেয়ামত খাইয়ে লালন-পালন করেছ এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রেখেছ। তোমার সকল অবস্থাই তার জন্যে কল্যাণকর। তোমার দেয়া বিপদাপদ তার ধারণায় সদ্ব্যবহার। এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে তোমার ক্রোধের সামনে পেশ করে এবং বিনা দ্বিধায় তোমার নাফরমানী করার দুঃসাহস করে। তুমি কি জান, তার ধারণায় তার কুকর্ম তুমি দেখ না? অথচ তুমি সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমান।

যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ একরাতে আমি কানআন উপত্যকা থেকে বের হলাম। উপত্যকার উপরে পৌঁছে দেখি, আমার সামনে দিয়ে একটি কাল বস্তু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বলছে وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ এবং কাঁদছে। সে কাছে এলে জানা গেল, ছোট বালতি হাতে পশমী জোব্বা পরিহিতা এক মহিলা। সে বলল ঃ তুমি কে, আল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে অন্যের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ? আমি বললাম ঃ একজন পুরুষ মুসাফির। সে বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তা'আলা আছেন— এতদসত্ত্বেও মুসাফির হওয়ার কি অর্থ? আমি তার কথায় কেঁদে ফেললাম। সে প্রশ্ন করল ঃ কাঁদলে কেন? আমি বললাম ঃ ঔষধ এমন ব্যথার উপর পড়েছে যাতে যখম হয়ে গেছে। সে বলল ঃ তুমি সত্যবাদী হলে কান্নার কোন কারণ নেই। আমি বললাম ঃ সত্যবাদীরা কাঁদে না নাকি? সে বলল ঃ না। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ কান্না অন্তরের একটি সুখ। তার কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। আমি কিছুই বললাম না।

ইবনে আলা সাদী বলেন ঃ আমার পিতৃব্য কন্যা বরীরা খুব এবাদত করত এবং কোরআন অত্যধিক তেলাওয়াত করত। সে যখন দোযখের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত পাঠ করত, তখন ভীষণ কাঁদত। অধিক কান্নার ফলে অবশেষে তার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেল। তার চাচাত ভাইয়েরা পরস্পর বলল ঃ চল, আমরা অধিক কান্নার জন্য তাকে তিরস্কার করি। সেমতে আমরা সবাই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ বরীরা, তুমি কেমন আছ? সে জওয়াব দিল, অতিথি হয়ে অজানা ভূমিতে পড়ে আছি। কবে

ডাক পড়বে, তারই অপেক্ষায় আছি। আমরা বললাম ঃ তাহলে এই কান্না আর কতদিন চলবে? দৃষ্টিশক্তি তো রহিতই হয়ে গেছে। সে বলল ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার চোখের কোন কল্যাণ থেকে থাকে, তবে যা নষ্ট হয়েছে, তা ক্ষতি। আর যদি তার কাছে এই চোখের অনিষ্ট থেকে থাকে, তবে আরও বেশী ক্রন্দন করা দরকার। একথা বলে বরীরা মুখ ফিরিয়ে নিল। অতঃপর তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে আমরা চলে এলাম।

খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ আমরা একবার রাহেলা আবেদার কাছে গেলাম। সে রোযা রাখতে রাখতে কৃষ্ণবর্ণ, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ এবং নামায পড়তে পড়তে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ফলে, বসে বসেই নামায পড়ত। আমরা তাকে সালাম করে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু ক্ষমাগুণ বর্ণনা করলাম, যাতে তার এবাদত সহজ হয়। সে শুনে এক বুকফাটা চিৎকার দিয়ে বলল ঃ من آنم كه من دانم অর্থাৎ, আমি কে, তা আমিই জানি! এই আত্মোপলব্ধির কারণে আমার অন্তর আহত এবং কলিজা খণ্ড-বিখণ্ড। হায়, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে সৃষ্টি না করতেন এবং দুনিয়াতে আমার কথা আলোচিত না হত! একথা বলে সে নামায পড়তে লাগল।

সুতরাং তুমি যদি নিজের নফসের দেখাশুনা ও হেফাযত করতে চাও, তবে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ও মহিলাগণের অবস্থা দেখ, যাতে তোমার মাঝেও মোজাহাদার বাসনা জাগ্রত হয়! তুমি নিজের সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর প্রতি কখনও তাকিয়ো না। কারণ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, "যদি তুমি পৃথিবীবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"

এছাড়া কাফের সম্প্রদায়কে সমসাময়িক লোকদের সাথে একাত্মতাই ধ্বংস করেছে। তারাও বলেছিল ঃ

اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এক ধর্মপথে পেয়েছি; আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করি।

মোটকথা, তুমি নফসকে শাসন করতে থাক এবং মোজাহাদার পথে ধাবিত হও। নফস অমান্য করলে তাকে তিরস্কার ও ধমক দাও।

নফসের শাসন ও নিন্দা ঃ মানুষের সর্ববৃহৎ শত্রু হল তার নফস। বগলের এই সর্পটি মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম থেকে পলায়ন করে। তাই মানুষ একে শুদ্ধ করতে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদতে আকৃষ্ট করতে এবং কামনা-বাসনা থেকে আলাদা রাখতে নির্দেশিত হয়েছে। মানুষ যদি এ শত্রুর খবর না নেয়, তবে সে অবাধ্য হয়ে পলায়ন করে এবং এরপর আর বশে আসে না। পক্ষান্তরে যদি সর্বক্ষণ ভীতিপ্রদর্শন, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে, তবে এ নফসই নফসে লাওয়ামা (তিরস্কারকারী নফস) হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে এরই কসম খেয়েছেন। এরপর আশা করা যায় এই নফস ক্রমান্বয়ে 'নফসে মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত নফস) হয়ে যাবে, যাকে সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন অবস্থায় আহবান করা হবে। অতএব, মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে কোন সময় নফসকে উপদেশ দান ও তাকে শাসন করা থেকে গাফেল না থাকা। অপরকে উপদেশ দেয়ার পূর্বে নিজের নফসকে উপদেশ দেবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এ মর্মে ওহী নাযিল করেন— হে মরিয়ম-তনয়, তুমি নিজের নফসকে উপদেশ দাও। যদি সে উপদেশ মেনে নেয়, তবে অপরকে উপদেশ দাও। অন্যথায় আমার কাছে লজ্জিত হও। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে এরশাদ করেন—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, হে নবী উপদেশ দিন। উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।

এর পদ্ধতি হল, নফসকে সম্বোধন করে তার নির্বুদ্ধিতা, বোকামি ও মূর্খতা প্রমাণ করা। কারণ, নফস সর্বদাই নিজের বিচক্ষণতা ও হেদায়েতকে বড় করে দেখে এবং তাকে বোকা বলা হলে অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং এভাবে বলবে— হে নফস, তুই তো নিজকে প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় পাকাপোক্ত মনে করিস; কিন্তু তোর সমান বোকা ও স্বল্পজ্ঞানী কেউ নেই। তোর তো জানা আছে যে, জান্নাত ও দোযখ তোর সামনে রয়েছে। তন্মধ্যে যে কোন একটিতে তুই সত্বরই প্রবেশ করবি। এমতাবস্থায় তোর খুশী হওয়া, হাস্য করা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হওয়ার কারণ কি? যে মৃত্যুকে তুই দূরে মনে করিস, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা

নিকটবর্তী। তোর কি জানা নেই যে, মৃত্যু হঠাৎ আসে। মৃত্যু হঠাৎ না এলেও রোগব্যাধি তো হঠাৎ আসে, যা মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়! তোর কি হল যে, মৃত্যু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তোর কোন প্রস্তুতি নেই? তুই কি নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম বুঝিস না?

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ - مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ -

অর্থাৎ, মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী, কিন্তু তারা উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা তা কৌতুকচ্ছলে শুনে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।

যদি তুই মনে করিস, আল্লাহ্ তা'আলা তোকে দেখেন না, এজন্য তাঁর নাফরমানী করিস, তবে তুই বড় কাফের। আর আল্লাহ তোর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত একথা বিশ্বাস করেও যদি নাফরমানী করিস, তবে তুই বড় নির্লজ্জ।

হে নফস, দেখ তোর পালনকর্তা বলেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রতিটি জীবের রিযিক আল্লাহরই দায়িত্বে।

আখেরাত সম্পর্কে বলেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى -

অর্থাৎ মানুষ যা চেষ্টা করে, কেবল তাই পায়।

এ দু'টি আয়াত থেকে জানা যায়, বিশেষত দুনিয়ার রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নিয়েছেন। এতে তোর চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। আর আখেরাতকে তোর উপার্জনের মধ্যে সীমিত রেখেছেন। কিন্তু তুই নিজের কর্মের দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিস। যে

দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে তোর চেষ্টা-চরিত্রের সীমা-পরিসীমা নেই। আর আখেরাতের বিষয়, যা তোর চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, তাতে তোর অবহেলা ও শৈথিল্যের অন্ত নেই। এটা ঈমানের পরিচায়ক নয়। যদি মৌখিক ঈমানই গ্রহণীয় হত, তবে মুনাফিকের স্থান দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে কেন হত? হতভাগা, মনে হয় তুই হিসাব দিবসে বিশ্বাস করিস না। তোর ধারণা, মৃত্যুর পর তুই এমনিই রেহাই পেয়ে যাবি! কখনও তা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন —

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنْثٰى أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى -

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? এরপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেছেন ও সুঠাম করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন?

এরপর যদি তুই ধারণা করিস, তোকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে, তবে তোর মত মূর্খ কেউ নেই এবং তুই মস্ত কাফের। চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ
فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ -

অর্থাৎ, মানুষ নিপাত যাক! সে কত অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ্ তাকে কি বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? বীর্য দিয়ে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে সমাহিত করেন। অতঃপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

হে নফস, যদি তুই আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা মনে না করিস, তবে

সাবধান হচ্ছিস না কেন? যদি কোন ইহুদী ডাক্তার তোকে বলে দেয় যে, তোর রোগে অমুক খাদ্য ক্ষতিকর, তবে সে খাদ্য তোর কাছে সর্বাধিক সুস্বাদু হলেও তুই তা ছেড়ে দিবি এবং সবর করে নিবি। এখন জিজ্ঞাস্য, যে পয়গম্বরকে আল্লাহ্ মোজেযা দিয়ে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কথা এবং ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার কথা তোর কাছে কি এক ইহুদী ডাক্তারের কথারও সমান নয়? অথচ সে বিনা প্রমাণে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিও অসম্পূর্ণ। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোর অবস্থা যদি চতুষ্পদ জন্তুদের কাছে উন্মোচিত হয়, তবে তারাও না হেসে পারবে না।

হে হতভাগা, পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকার করিস না। তুই নিজেই নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর। হেলায় সময় নষ্ট করিস না। এ জীবন গনাগুনতি কয়েক দিনের। রুগ্ন হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং কর্মব্যস্ততার পূর্বে অবসর মুহূর্তকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাতে শিখ। আখেরাতে যতদিন থাকতে হবে, সে পরিমাণে তার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দুনিয়াতেও তো তাই করিস। শীতের মেয়াদ যতদিনের হয়, ততদিনেরই সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করিস। খাদ্য, পোশাক ও খড়ি সংগ্রহ করিস। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের উপর হেলান দিয়ে থাকিস না যে, তিনি জোব্বা, পশম, লাকড়ী ইত্যাদি ছাড়াই শীতের কষ্ট দূর করে দেবেন। অথচ তিনি তাও করতে সক্ষম। তুই কি মনে করিস যে, শীতকালের শৈত্যের তুলনায় জাহান্নামের ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে শৈত্য কম হবে? বরং দুনিয়ার শীত যেমন গরম কাপড়, আগুন ইত্যাদি ছাড়া প্রশমিত হয় না, তেমনি জাহান্নামের শীতও তাওহীদ ও আনুগত্যের লেফ ছাড়া দূর হবে না। আল্লাহ্ তা'আলার এই কৃপা কম নয় যে, তিনি তোকে এই শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলে দিয়েছেন। এর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। লাকড়ী কেনা, গরম কাপড় নেয়া যেমন আল্লাহ্ তা'আলার কাজ নয়, তিনি এগুলোর উর্ধ্বে; বরং এসব সামগ্রী কেবল তোর আরামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি যত এবাদত ও মোজাহাদা রয়েছে, সেগুলো থেকেও তিনি বেপরওয়া। এগুলো কেবল তোর মুক্তির জন্যে। অতএব, যে কেউ ভাল করবে, তা নিজের জন্যে এবং খারাপ করবে, তাও নিজের জন্যে। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু থেকে বেপরওয়া।

হে নফস, তুই আল্লাহ তা'আলার সওয়াব, আযাব ও কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ গাফেল। এ কারণেই মৃত্যুর প্রতি তোর ঈমান ও বিশ্বাস নেই। যদি কেউ রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে এক দরজা দিয়ে ঢুকার পর অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে, এরপর বিরহ নিশ্চিত জেনেও সেই প্রাসাদের কোন সুন্দর বস্তুতে সর্বান্তকরণে ব্যাপৃত হয়ে যায়, তবে সে বুদ্ধিমান হবে, না বুদ্ধির দুশমন? এমনিভাবে দুনিয়া রাজাদের রাজা আল্লাহ তা'আলার ঘর। তোকে এখানে কেবল স্বল্পক্ষণ বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখানে যত বস্তু-সামগ্রী রয়েছে, সেগুলো কারও সাথে যায় না। মৃত্যুর পর দুনিয়াতেই থেকে যায়। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان روح القدس نفث فى روحى احبب ماشئت فانك مفارقه

واعمل ماشئت فانك تجزى به وعش ما شئت فانك ميت -

অর্থাৎ, জিবরাঈল আমার অন্তরে একথা স্থাপন করেছেন, যে বস্তুকে ইচ্ছা মহব্বত কর, তা থেকে বিচ্ছিন্ন অবশ্যই হবে। যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং যতদিন ইচ্ছা জীবন ধারণ কর, মরতে তোমাকে হবেই।

তোর কি জানা নেই, মৃত্যু পেছনে থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়, সে যখন দুনিয়া ছেড়ে যায়, তখন অনেক বেদনা সাথে নিয়ে যায়। প্রত্যেকেই বসবাসের জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে। অথচ তার থাকার জায়গা হয় ভূগর্ভস্থ কবর। দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হবে? কেউ নিজের দুনিয়া আবাদ করে অথচ এখান থেকে সফর অবশ্যই করবে। কেউ নিজের আখেরাত বরবাদ করে অথচ সেখানে অবশ্যই যাবে।

নবম অধ্যায়

ফিকর ও ইবরত

(চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা)

হাদীস শরীফে আছে— এক মুহূর্তের চিন্তাভাবনা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। কোরআন পাকে শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তাভাবনার প্রতি অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চিন্তা-ভাবনা খোদায়ী নূর ও আলোর চাবিকাঠি এবং অন্তর্দৃষ্টির উপায়। অনেক মানুষ চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত; কিন্তু তারা এর স্বরূপ ও ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা জানে না চিন্তাভাবনা কেমন করে করতে হয়, কি কি বিষয়ে করতে হয় এবং কেন করতে হয়? এসব বিষয় বর্ণনা করা জরুরী। তাই আমরা প্রথমে চিন্তাভাবনার ফযীলত, অতঃপর তার স্বরূপ ও ফলাফল বর্ণনা করব। এরপর যেখানে যেখানে চিন্তাভাবনা চলে, সেসব স্থান বর্ণনা করব।

চিন্তাভাবনার ফযীলত ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআন মজীদের বহু স্থানে চিন্তাভাবনার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন। এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তাভাবনা করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে, তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন— কিছু লোক আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে রসূলে আকরাম (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর— স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। কেননা, তাঁর সুউচ্চ মহিমা উদঘাটন করতে তোমরা কখনও সক্ষম হবে না।

বর্ণিত আছে, একদিন রসূলে করীম (সাঃ) কয়েকজন লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন চিন্তাভাবনায় মশগুল। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি, তোমরা কথা বলছ না কেন? তারা আরয করল ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলাম। তিনি বললেন ঃ বেশ তাই কর। স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। এখান থেকে কাছেই একটি শুভ্র ভূখণ্ড আছে, যার আলো শুভ্র। সেখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এমন সব লোক বসবাস করে, যারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী একদম করে না। তারা আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, শয়তান তাদের কোন্ দিকে থাকে? তিনি বললেন ঃ শয়তান সৃজিত হয়েছে কি না সে কথাই তারা জানে না। তারা আরয করল ঃ তারা কি হযরত আদমের সন্তান? উত্তর হল ঃ আদম পয়দা হয়েছে কি না, তারা তাও জানে না।

আত্তার বর্ণনা করেন— একদিন আমি ও ওবায়দ ইবনে ওমায়র হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওবায়দ, তুমি ইদানীং আমার কাছে আসছ না কেন? ওবায়দ আরয করলেন ঃ কারণ রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— زرغبا تزدد حبا –'বিরতি দিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ কর। এতে মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।' অতঃপর ওবায়দ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এমন কোন আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করুন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে দেখেছেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ তাঁর সব কিছুই ছিল আশ্চর্যজনক। এক রাতে তিনি আমার কাছে এলেন এবং আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের এবাদত করতে দাও। এরপর তিনি উঠে একটি মশক থেকে পানি নিয়ে উযু করলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি এত কাঁদলেন যাতে শ্মশ্রু মোবারক ভিজে গেল। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। মুয়াযযিন বেলাল ফজরের নামাযের কথা জানাতে এসে তাঁকে নামাযের বিছানায় শায়িত দেখে বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত গোনাহ মোচন করে দিয়েছেন। এরপরও আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন ঃ হে বেলাল, আমি কাঁদব না কেন? আজ রাতে আমার প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে ব্যক্তির দুর্ভোগ, যে এ আয়াত পাঠ করে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ওফাতের পর এক বসরাবাসী তার মায়ের কাছে তার এবাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করল। হযরত আবু যরের মা বললেন ঃ সে সমস্ত দিন ঘরের কোণে বসে বসে চিন্তাভাবনা করত। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ চিন্তাভাবনা একটি দর্পণ। তাতে মানুষের সৎকর্ম ও কুকর্মসমূহের প্রতিফলন ঘটে।'

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে বলা হল ঃ আপনি খুব বেশী চিন্তাভাবনা করেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ চিন্তাভাবনা জ্ঞান-বুদ্ধির নির্যাস।

তাউস বর্ণনা করেন— ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ তাঁর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রূহুল্লাহ, আজ ভূপৃষ্ঠে আপনার সমান কেউ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যার কথাবার্তা যিকর হয় এবং চুপ থাকা ফিকর হয়, সে আমার সমান।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা চমৎকার এবাদত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক একদিন সহল ইবনে আলীকে নিশ্চুপ ও চিন্তান্বিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় পৌছে গেছেন? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতে।

আবু শোরায়হ একদিন চলতে চলতে হঠাৎ পথের মধ্যেই বসে পড়লেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমার বয়স চলে যাওয়া, আমল কম হওয়া এবং মৃত্যু নিকটে এসে পড়ার চিন্তা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

ইসহাক ইবনে খলফ বলেন ঃ দাউদ তাঈ জোছনা রাতে এক ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কেঁদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে এক প্রতিবেশীর ঘরের উপর পড়ে গেলেন। গৃহকর্তা চোর মনে করে তরবারি হাতে তাঁর দিকে দৌড়ে এল। অতঃপর দাউদকে দেখে তরবারি রেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাকে ছাদের উপর থেকে কে ফেলে দিল? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিস হচ্ছে তাওহীদের ময়দানে ফিকর সহকারে বসে মারেফতের বায়ু সেবন করা, একত্বের দরিয়া থেকে মহব্বতের পেয়ালা পান করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা সহকারে দর্শন করা। অতঃপর বলেন ঃ এই মজলিসগুলো খুবই উত্তম এবং এই পানীয়গুলো খুবই সুস্বাদু। সুখী সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা এগুলো দান করেন।

চিন্তাভাবনার স্বরূপ ও ফলাফল ঃ ফিকরের অর্থ অন্তরে দু'টি মারেফত উৎপন্ন করা, যাতে এগুলোর সাহায্যে তৃতীয় একটি মারেফত অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কোনরূপে একথা জানতে আগ্রহী হয় যে, দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। এখন এ জ্ঞান অর্জন করার দু'টি উপায় আছে। প্রথমত, আখেরাত যে উত্তম, একথা অপরের কাছে শুনা এবং শুনামাত্রই তা সত্য বলে মেনে নেয়া। এ উপায়ের মধ্যে বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান কার্যকর থাকে না। কেবল অপরের কথায় আস্থা স্থাপন করে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবক্তা হওয়া যায়। এ উপায়কে বলা হয় "তাকলীদ"। অর্থাৎ, অনুসরণ। দ্বিতীয়ত, প্রথমে একথা জানা যে, স্থায়ী ও চিরন্তন বস্তু অবলম্বন করা উত্তম। এরপর জানা যে, আখেরাত চিরন্তন। এ দু'টি মারেফত তথা জানার সাহায্যে একটি তৃতীয় মারেফত অর্জন করা। অর্থাৎ, আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। বলা বাহুল্য, এই তৃতীয় বিষয়টি জানা প্রথমোক্ত দু'টি বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং তৃতীয় মারেফত পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে অন্তরে প্রথমোক্ত দু'টি মারেফত উৎপন্ন করাকে বলা হয় ফিকর, তাফাক্কুর, তাদাব্বুর ও তায়াম্মুল। এসব শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমার্থবোধক।

চিন্তাভাবনার উপকারিতা হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং যে মারেফত অর্জিত ছিল না, তা অর্জিত হওয়া। অন্তরে যখন মারেফতসমূহ এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহীত হয়, তখন সেগুলো থেকে আরও মারেফত নির্গত হয়।

অর্থাৎ, নতুন মারেফতটি প্রথম মারেফতের ফল। যখন এই নতুন মারেফতটি অন্য মারেফতের সাথে যোগ হয়, তখন এ থেকে আরও একটি ফল অর্জিত হয়। এমনিভাবে ফল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জ্ঞানও বাড়তে থাকে। মারেফতের এই প্রবৃদ্ধি মৃত্যু অথবা অন্য কোন বাধার কারণেই শুধু বন্ধ হতে পারে।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সে ব্যক্তিই অর্জন করতে পারে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে ফললাভ করতে সক্ষম এবং চিন্তাভাবনার পন্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। কারণ, তাদের কাছে পুঁজিই নেই। অর্থাৎ, সে মারেফত নেই, যা দ্বারা অন্য মারেফত সৃষ্টি হয়, যেমন কারও কাছে মূলধন না থাকলে সে মুনাফা অর্জন করতে পারে না। মাঝে মাঝে মূলধন থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুন জানা না থাকার কারণে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে কখনও মানুষের কাছে মারেফত থাকে, কিন্তু সেগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে না, যাতে ফল লাভ হয়। ব্যবহার পদ্ধতির জ্ঞান কখনও অন্তরে খোদায়ী নূরের কারণে জন্মগতভাবে অর্জিত হয়, যেমন, পয়গম্বরগণের ছিল। এটা খুবই বিরল। কখনও শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এ জ্ঞান অর্জিত হয়। এটাই মানুষের মধ্যে বেশী।

চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে কখনও মারেফত আসে এবং ফলও অর্জিত হয়। কিন্তু অর্জিত হওয়ার অবস্থা সে জানে না এবং বর্ণনা করতে পারে না। বর্ণনা শাস্ত্রে দক্ষতার অভাবই এর কারণ। উদাহরণতঃ অনেক মানুষ জানে আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। কিন্তু তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কখনও বর্ণনা করতে সক্ষম হয় না।

সারকথা, ফিকর হচ্ছে অর্জিত দু'টি মারেফত দ্বারা তৃতীয় মারেফত অর্জন করা। এর ফল জ্ঞান, হাল, আমল ইত্যাদি সবই হতে পারে। কিন্তু এর বিশেষ ফল হচ্ছে জ্ঞান। তবে অন্তরে যখন জ্ঞান অর্জিত হয়, তখন অন্তরের হাল বদলে যায়। বদলে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলও বদলে যায়। কেননা, আমল হালের অনুসারী, হাল জ্ঞানের এবং জ্ঞান ফিকরের অনুগামী। এ থেকে জানা গেল যে, ফিকর যাবতীয় নেক আমলের মূল ও উৎস। এ থেকে ফিকরের ফযীলতও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় যে, ফিকর যিকরের তুলনায় উত্তম। কেননা, ফিকরের মধ্যে যিকর তো থাকেই, আরও কিছু বিষয় অতিরিক্ত থাকে। যিকর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের

তুলনায় উত্তম; বরং আমলের উৎকর্ষ এ কারণেই সাধিত হয় যে, এতে কিছু যিকরও থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ফিকর যাবতীয় এবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই বলা হয়েছে, এক মুহূর্তের ফিকর এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

মোটকথা, এখানে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এক, তাযাক্কুর অর্থাৎ, অন্তরের দু'টি মারেফত অর্জন। দুই, তাফাক্কুর অর্থাৎ, অর্জিত দুই মারেফতের সাহায্যে তৃতীয় উদ্দিষ্ট মারেফত তলব। তিন, প্রার্থিত মারেফত অর্জিত হওয়া এবং তা দ্বারা অন্তর আলোকিত হওয়া। চার, মারেফতের নূর অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরের হাল বদলে যাওয়া। পাঁচ, অন্তরের হাল বদলে যাওয়ার মত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল বদলে যাওয়া এবং অন্তরের খেদমত করা। পাথর দ্বারা লোহাকে আঘাত করলে আগুন নির্গত হয়। তা দ্বারা স্থান আলোকোজ্জ্বল হয়। চোখে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমল করতে উদ্যত হয়। ঠিক এমনিভাবে মারেফতের নূর থেকে ফিকর জন্মলাভ করে। এই ফিকর উভয় মারেফতকে সমন্বিত করে বিশেষভাবে সাজায়, যার ফলে মারেফতের নূর ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর এই নূরের মাধ্যমে অন্তর বদলে যায় এবং পূর্বে যে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। যেমন, আগুনের আলোকে চোখের অবস্থা বদলে যায় এবং পূর্বে যা দৃষ্টিগোচর হত না, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অতঃপর অন্তরের অবস্থার দাবী অনুযায়ী আমলের জন্যে অঙ্গ গতিশীল হয়। যেমন, অন্ধকারের কারণে যে ব্যক্তি কাজ করতে পারত না, আলো আসার পর সে কাজে তৎপর হয়। সুতরাং জানা গেল ফিকরেরই ফল হচ্ছে জ্ঞান ও হাল। এই জ্ঞান ও হাল অসংখ্য ও অগণিত।

ফিকরের পথ ঃ ফিকর কখনও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদিতে এবং কখনও ধর্ম সম্পর্কিত নয়— এমন বিষয়াদিতে হয়ে থাকে। এখানে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ফিকর বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে পাওয়া যায়। এখন ফিকর বান্দা, তার গুণাবলী ও হাল সম্পর্কিত বিষয়ে হবে, অথবা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে হবে। বান্দা সম্পর্কিত বিষয়ের ফিকর দু' রকম। এক– বান্দার এমন হাল নিয়ে ফিকর, যা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় এবং দুই– বান্দার এমন হাল নিয়ে ফিকর, যা আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয়। এ দু'টি প্রকার ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ফিকর করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত ফিকরও দুই প্রকার। এক— আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও সুন্দর নামসমূহ (আসমায়ে হুসনা) নিয়ে ফিকর এবং দুই— তাঁর ক্রিয়াকর্ম, সাম্রাজ্য, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু নিয়ে ফিকর। নিম্নে আমরা ফিকরের উপরোক্ত চারটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

(১) বান্দার গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে ফিকর করার উদ্দেশ্য একথা জানা যে, বান্দার কোন্ কোন্ গুণ ও কর্ম আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন এবং কোন্গুলি অপছন্দ করেন। এই গুণ ও কর্ম আবার দু'প্রকার— বাহ্যিক; যেমন, এবাদত ও গোনাহ্ এবং অভ্যন্তরীণ; যেমন, উদ্ধারকারী ও ধ্বংসকারী গুণাবলী। দ্বিতীয় প্রকারের পাত্র হচ্ছে বান্দার অন্তর। পূর্বেকার খণ্ডগুলোতে এসব গুণা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আমরা গোনাহ্, এবাদত, ধ্বংসকারী গুণ ও উদ্ধারকারী গুণ— এই প্রকার চতুষ্টয়ের জন্যে এক একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব— যাতে চিন্তাভাবনার পথ খুলে যায় ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এর সাহায্যে আরও দৃষ্টান্ত বুঝে নেয়া যায়।

প্রথমত, গোনাহ সম্পর্কে মানুষের উচিত, প্রতিদিন ভোর বেলায় চিন্তা করা যে, সে কোন গোনাহ্ করছে কিনা? যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন গোনাহে লিপ্ত থাকে, তবে তা বর্জন করবে। অতীতে করে থাকলে তওবা ও অনুশোচনার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে নেবে। আর যদি সেদিন করবে এমন গোনাহ থাকে, তবে তা থেকে বিরত থাকার প্রস্তুতি নেবে। উদাহরণতঃ নিজের জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, এর মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, আত্মপ্রশংসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অনর্থক কথাবার্তা ইত্যাদি গোনাহ্ হয়ে থাকে। অতএব, এসব গোনাহের কোন একটিতে কার্যত লিপ্ত থাকলে তা বর্জন করবে এবং অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে নেবে যে, এসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গর্হিত। কোরআন ও হাদীসে এগুলোর শাস্তি বর্ণিত রয়েছে। এরপর চিন্তা করবে যে, এগুলো থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যায়। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, একান্তবাস ও একাকীত্ব অবলম্বন করা ছাড়া জিহ্বার গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। এর আরেকটি উপায় কোন সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তির সংসর্গে থাকা, যাতে সে কোন অন্যায় কথা মুখ থেকে বের হলেই বাধা প্রদান করতে পারে। অথবা মানুষের কাছে বসার সময় মুখে কংকর রেখে দেয়া যায়, যাতে তা সংযমের কথা সর্বক্ষণ স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এরই মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, বাজে কথা, ক্রীড়াকৌতুক ও বেদআতী কথাবার্তা শ্রবণ করা হয়। এটা খারাপ কথা। অতএব, এসব বিষয় শ্রবণ করা থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে একান্তে বাস করা। অথবা সামনে কেউ এসব কথা বললে তাকে নিষেধ করা। উদর সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, উদর পানাহারে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। হালাল রিযিক মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে খাহেশ বৃদ্ধি করে, যা শয়তানের হাতিয়ার, অথবা হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য ভক্ষণ করে। অতএব দেখবে, তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবিকা কিভাবে আসে। তৎসঙ্গে হালাল রিযিকের উপায় চিন্তা করবে। এটা জেনে নেবে যে, হারাম খাদ্য খেয়ে যত এবাদতই করা হোক না কেন, সবই পণ্ডশ্রম। হালাল রিযিক এবাদতের মূল। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার পরিধেয় বস্ত্রে হারামের এক দেরহামও ব্যয়িত হয়েছে। এমনিভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে।

দ্বিতীয়ত, এবাদতের মধ্যে প্রথমে ফরয এবাদত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে যে, একে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা হয় কিনা এবং এর ত্রুটি নফল এবাদত দ্বারা পূরণ করা হয় কিনা? অতঃপর প্রত্যেক অঙ্গের এবাদত সম্পর্কে চিন্তা করবে, যে অঙ্গের যে এবাদত আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়, তা সেই অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে কিনা? উদাহরণতঃ চক্ষু দেখার জন্য সৃজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এবাদতে মশগুল থাকার জন্যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যসমূহ শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও হাদীস দেখতে হবে। এগুলো দেখে চক্ষুকে এবাদতে মশগুল করতে মানুষ সক্ষম। অতএব, চিন্তা করবে চক্ষু দ্বারা এসব করা হয় না কেন?

এমনিভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করে বলবে— আমি মযলুমের ফরিয়াদ শুনতে পারি, জ্ঞানের কথাবার্তা, কেরাআত এবং যিকর শুনতে পারি। তবে কেন কানকে বেকার রাখি? জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি জিহ্বা দ্বারা শিক্ষাদান ও ওয়ায করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। সাধু পুরুষদের অন্তরে আসন করতে পারি। ভাল ভাল কথা বলতে পারি, যার প্রত্যেকটি বাক্যই হবে সদকা। এ নেয়ামত থেকে আমি আমার জিহ্বাকে কেন বঞ্চিত রাখি? ধন-সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি অমুক ধন সদকা করতে পারি। কারণ, এর প্রয়োজন আমার নেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে,

আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। অতএব, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, ধন-সম্পদ, গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এসব বস্তু মানুষের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণ, যা দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার এবাদত করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

তৃতীয়ত, চিন্তাভাবনার বিষয় বিনাশকারী গুণাবলী, সেগুলোর স্থান অন্তর। এগুলো হচ্ছে খাহেশের প্রাবল্য, ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, রিয়া, হিংসা, কুধারণা, ঔদাসীন্য, গর্ব ইত্যাদি। যদি মনে করা হয় যে, অন্তর এসব মন্দ স্বভাব থেকে পাক ও পবিত্র, তবে এর পরীক্ষা নেবে। কেননা, নফস সর্বদাই সৎকর্মের ওয়াদা করতে থাকে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীত কাজ করে। পরীক্ষা এই যে, উদাহরণতঃ নফস যদি অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার দাবী করে, তবে একটি লাকড়ীর বোঝা মাথায় চেপে বাজারে চলে যাবে, যাতে দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এমনিভাবে নফসের পরীক্ষা নিতেন। আর যদি নফস জ্ঞান-গরিমার দাবী করে, তবে এমন কোন কাজ করবে, যা অন্যের উপর ক্রোধের সঞ্চার করে, এরপর দেখবে সে ক্রোধ সংবরণ করতে পারে কিনা? এমনিভাবে সকল গুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত যে, এসব গুণ তার মধ্যে আছে কিনা? যদি কোন লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, অমুক গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তবে এমন উপায় চিন্তা করবে, যাতে সে গুণটি তার দৃষ্টিতে মন্দ প্রতিভাত হয় এবং তার কারণ যে মূর্খতা, তা ফুটে উঠে। উদাহরণতঃ যদি নিজের মধ্যে অহংকার গুণটি পায়, তবে নফসকে এভাবে বুঝাবে যে, তুই নিজেকে কেন বড় মনে করিস? বড় তো সেই, যে আল্লাহ তা'আলার কাছে বড়। মৃত্যুর পরই জানা যাবে তাঁর কাছে কে বড়! বাহ্যত এমনও হয় যে, এক জন কাফের আজীবন কুফর করে মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে মরতে পারে এবং একজন মুমিন অন্তিম মুহূর্তে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। অহংকারের এ বিপর্যয় জানার পর এটা দূর করার প্রতিকার চিন্তা করবে। বলা বাহুল্য, এর প্রতিকার হচ্ছে বিনম্র লোকদের অনুরূপ কাজকর্ম অবলম্বন করা।

চতুর্থত, উদ্ধারকারী গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। এগুলো হচ্ছে তওবা ও গোনাহের জন্যে অনুশোচনা, বিপদে সবর, নেয়ামতে শোকর, ভয়, আশা, সংসার-বিমুখতা, এখলাস, সত্যবাদিতা, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর

তাযীম, আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি, নম্রতা, বিনয় ইত্যাদি। অতএব, বান্দার প্রত্যহ চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, এগুলোর মধ্য থেকে তার কোন্ গুণটির প্রয়োজন। এরপর উদাহরণতঃ যদি তওবা ও অনুশোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে প্রথমে নিজের গোনাহসমূহ অনুসন্ধান করবে। নফসের কাছে সবগুলোকে একত্রিত করবে। অতঃপর শরীয়তে বর্ণিত এসব গোনাহের শাস্তির কথা ভাববে। এরপর মনে মনে বলবে— আমি আল্লাহ্ তা'আলার গযবের কাজ করছি। এই উপায়ে বান্দার মধ্যে তওবা ও অনুশোচনার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে। যদি শোকরের অবস্থা সৃষ্টি করা লক্ষ্য হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজি ও নেয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করবে। একথাও ভেবে দেখবে যে, তিনি নিজ কৃপায় কেমন পর্দা ফেলে রেখেছেন। গোনাহের কারণে বান্দাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করেননি। ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে প্রথমে নিজের যাহেরী ও বাতেনী গোনাহসমূহের প্রতি তাকাবে। এরপর মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা, মৃত্যুর পর মুনকির-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সওয়াল, কবরের আযাব, সাপ, বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গের দংশন, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, চুলচেরা হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাতের তীক্ষ্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে। অতঃপর দোযখ সম্পর্কে কালামে মজীদে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোকে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত রাখবে। এভাবে বান্দার মধ্যে ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। রিজা তথা আশার অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে জান্নাত, তার আনন্দ, বাগ-বাগিচা, ঝরনা, হূর, গেলমান ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে।

আমরা এ সমস্ত গুণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতেও চিন্তাভাবনার সম্প্রসারণে সাহায্য হতে পারে। যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এক জায়গায় পাওয়ার জন্যে কোরআন মজীদ তেলাওয়াতের সমান উপকারী কোন কিছুই নেই। কেননা, কোরআন মজীদে সকল মকাম ও হালের কথা সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে এমন বিষয়ও রয়েছে, যা দ্বারা ভয়, আশা, সবর, শোকর, মহব্বত ও অন্যান্য হাল সৃষ্টি হয়। এগুলোই মানুষকে সকল নিন্দনীয় স্বভাব থেকে বিরত রাখে। অতএব, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা দরকার এবং যে বিষয়ে চিন্তাভাবনা উদ্দেশ্য হবে, সে বিষয়ের আয়াত বারবার পাঠ করা উচিত। প্রয়োজন হলে একশ' বার পাঠ করা কর্তব্য। চিন্তাভাবনা ও বোধগম্যতা সহকারে একটি কোরআনী আয়াত পাঠ করা না বুঝে তা

খতম করার চেয়ে অনেক উত্তম। অতএব, আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে বিরতি দেবে, যদিও তাতে এক রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা, কোরআন পাকের এক এক শব্দের অধীনে অগণিত রহস্য নিহিত রয়েছে। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে চিন্তাভাবনা না করা পর্যন্ত এগুলো হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ গভীর চিন্তা সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তাঁর উক্তির প্রতিটি শব্দও প্রজ্ঞার এক অকূল দরিয়া। এসব শব্দ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি যথাযথ চিন্তা করলে সারা জীবনেও তার চিন্তা পূর্ণ হবে না।

উপরে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে অন্তর প্রদেশ আবাদ করার চিন্তাভাবনা, যাতে নৈকট্য ও মিলনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কেউ যদি নফসের সংশোধনেই সমগ্র জীবন ব্যয় করে দেয়, তবে নৈকট্যের স্বাদ কখন আস্বাদন করবে? হযরত খাওয়াস (রহঃ) বিজন বনে ও প্রান্তরে ঘুরাফেরা করতেন। একবার হোসায়ন ইবনে মনসুর (রহঃ) তাঁর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন ঃ তায়াক্কুলে নিজের অবস্থা দুরস্ত করার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করছি। হযরত হোসায়ন বললেন ঃ আপনি তো অন্তর প্রদেশ আবাদ করার কাজেই জীবন অতিবাহিত করে দিলেন। তাওহীদে বিলয় কখন অর্জিত হবে? এ থেকে জানা গেল যে, এক আল্লাহয় বিলীন হওয়া সাধকের পরম ও চরম কাম্য ও আনন্দ।

উদ্ধারকারী ও বিনাশকারী গুণসমূহ জেনে নেয়ার পর এগুলোকে সকাল-সন্ধ্যার অভ্যাসে পরিণত করে নেবে এবং এগুলো থেকে মোটেই গাফেল থাকবে না। এ ব্যাপারে সাধক নিজের কাছে একটি নোট বই রাখবে। এতে সকল উদ্ধারকারী ও বিনাশকারী গুণসমূহ এবং যাবতীয় গোনাহ্ ও আনুগত্যের কাজগুলো লিখে রাখবে। এর পর প্রত্যহ নিজের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখবে কি কি গুণ তার মধ্যে আছে এবং কি কি নেই। বিনাশকারী গুণসমূহের মধ্য থেকে দশটি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যথেষ্ট। এগুলো থেকে বেঁচে থাকলে অন্য সবগুলো থেকে বেঁচে থাকা হয়ে যাবে। দশটি বিষয় এই ঃ (১) কৃপণতা, (২) অহংকার, (৩) আত্মপ্রীতি, (৪) রিয়া, (৫) হিংসা, (৬) কঠোরতা, (৭) খাদ্য-লালসা, (৮) অতিরিক্ত কামভাব, (৯) অর্থলোভ ও (১০) জাঁকজমকপ্রীতি। উদ্ধারকারী গুণসমূহের মধ্যেও দশটিই যথেষ্ট। আর সেগুলো এই ঃ (১) গোনাহের কারণে

অনুতাপ, (২) বিপদে সবর, (৩) আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি, (৪) নেয়ামতের শোকর, (৫) ভয় ও আশার সমতা, (৬) সংসার অনাসক্তি, (৭) আমলে এখলাস, (৮) মানুষের সাথে সদাচরণ, (৯) আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও (১০) আল্লাহর সামনে খুশু ও নম্রতা।

এই বিশটি বিষয়ের মধ্য থেকে, এক একটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করবে। উদাহরণতঃ যখন একটি বিনাশকারী অভ্যাস দূর হয়ে যাবে, তখন নোট-বই থেকে সেটি কেটে দেবে এবং সে সম্পর্কে আর চিন্তাভাবনা করবে না। তৎসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শোকর করবে যে, তিনি একটি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এমনিভাবে দশটি মন্দ স্বভাব সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত, এক একটি করে নেবে এবং চিন্তাভাবনা করবে। অতঃপর নোট-বই থেকে তা কেটে দিতে থাকবে। এরপর নফসকে উদ্ধারকারী গুণে গুণান্বিত করার প্রয়াস চালাবে। যখন নফস একটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, উদাহরণতঃ তওবা ও অনুতাপের গুণ অর্জিত হয়ে যাবে, তখন নোট-বই থেকে সেটি কেটে দিয়ে অবশিষ্ট গুণসমূহ অর্জনে প্রয়াসী হবে। কিন্তু এই পন্থা অত্যন্ত কর্মতৎপর ব্যক্তির জন্যেই উপকারী। আর যারা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে গণ্য, তাদের অধিকাংশের উচিত নোট বইয়ে বাহ্যিক গোনাহও লিখে নেয়া। যেমন, সন্দেহযুক্ত খাদ্য খাওয়া, গীবত করা, ঝগড়া করা, আত্মপ্রশংসা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বর্জন করা ইত্যাদি। কেননা, অধিকাংশ সৎকর্মপরায়ণ বলে গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এসব গোনাহ কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বাহ্যিক অঙ্গ গোনাহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর আবাদ করার কাজে মশগুল হওয়া সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক স্তরের মানুষের উপর এক ধরনের গোনাহ প্রবল থাকে। অতএব, সে স্তরের মানুষের উচিত সে ধরনের গোনাহ দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া এবং তারা যে সকল গোনাহের প্রান্তে অবস্থান করে, সেগুলোর জন্যে চিন্তাভাবনা না করা। উদাহরণতঃ পরহেযগার আলেম প্রায়ই নিজের ইলম যাহির করার প্রয়াস পায় এবং মানুষের মধ্যে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি কামনা করে— শিক্ষকতার মাধ্যমে হোক অথবা ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, তারা এমন একটি ফেতনায় পতিত হয়, যা থেকে সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ নাজাত পায় না। অর্থাৎ, এ ধরনের আলেমের কথাবার্তা যদি জনপ্রিয়তা লাভ করে, তবে সে আলেম আত্মপ্রীতি, অহংকার ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকে না। কেউ তার কথা অমান্য করলে সে মনে মনে ভীষণ ব্যথা অনুভব

করে; অথচ এই অমান্যকারী ব্যক্তি অন্য কোন আলেমের কথা অমান্য করলে তাতে সে ক্ষুব্ধ হয় না। কেবল নিজের কথা অমান্য করলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। শয়তানের প্ররোচনাই এর কারণ।

মোটকথা, আলেমের ফেতনা অনেক বড়। সে হয় বাদশাহ, না হয় বরবাদ। অতএব, যে আলেম নিজের মধ্যে উপরোক্ত মন্দ স্বভাব অনুভব করবে, তার জন্যে নির্জনবাস, একাকীত্ব, অজ্ঞাত জীবন যাপন ও ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরামের যমানায় অনেক সাহাবী মসজিদে থাকতেন। তারা সবাই আলেম ও মুফতীর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ফতোয়া দেয়া থেকে তারা গা বাঁচিয়ে চলতেন। কেউ ফতোয়া দিলেও এটা চাইতেন, অন্য কেউ ফতোয়া দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিক।

নির্জনবাসের সময়ও শয়তানকে ভয় করা উচিত। কারণ, তখন শয়তান এসে বলে— তুমি নির্জনবাস অবলম্বন করো না। কেননা, যদি সবাই এমন করে, তবে মানুষের মধ্য থেকে ইলম বিদায় নেবে। এর জওয়াবে বলা উচিত— ইসলামে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার পূর্বেও ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল এবং পরেও থাকবে। আমার মৃত্যুতে দ্বীনের কোন স্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়ে যাবে না। কিন্তু আমার অবস্থা এই যে, আমি আমার অন্তরের সংশোধন থেকে বেপরওয়া নই। আমি বসে থাকলে ইলম বিদায় নেবে— একথা নিছক খামখেয়ালী এবং মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা, যদি সমস্ত মানুষকে জেলখানায় পুরে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয় এবং ইলম অন্বেষণ করলে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি প্রদর্শন করা হয়, তবু বড়ত্ব ও জাঁকজমকের মহব্বত তাদেরকে বেড়ী ছিন্ন করে, জেলের প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে বাধ্য করবে এবং ইলমের অন্বেষণে নিয়োজিত করবে। অতএব, শয়তান যতদিন মানুষের মনে জাঁকজমক ও নেতৃত্বের মহব্বত জাগ্রত রাখবে, ততদিন ইলম বিদায় নিতে পারবে না। বলা বাহুল্য, শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত নিজের কারসাজিতে শৈথিল্য করবে না। ফলে, কিয়ামত পর্যন্ত ইলমও অবশিষ্ট থাকবে। বরং দ্বীনের ইলম এমন লোকদের দ্বারা প্রসার লাভ করবে, যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان الله يويد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم وان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ এমন লোকদের দ্বারা এই দ্বীনকে শক্তি যোগাবেন, যাদের পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা পাপাসক্ত ব্যক্তি দ্বারা এই দ্বীনকে দৃঢ়তা দান করবেন।

সুতরাং শয়তানের এ ধরনের প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে মানুষের সাথে মেলামেশায় মশগুল হওয়া এবং পার্থিব জাঁকজমক, প্রশংসা ও সম্মানের মহব্বতকে লালন করা আলেমের জন্যে মঙ্গলজনক নয়। হাদীসে আছে— জাঁকজমক ও ধন-সম্পদের মহব্বত কপটতা উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক উৎপন্ন করে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ماذئبان ضاربان ارسلافى زربة غنم باكثر فسادا فيها من
حب الجاه والمال فى دين المرء المسلم -

অর্থাৎ, দু'টি রক্তপিপাসু বাঘকে ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা এত বেশী ক্ষতি করতে পারে না, জাঁকজমক ও ধনের মহব্বত মুসলমানের দ্বীনের যত বেশী ক্ষতি করে।

জাঁকজমকের মহব্বত নির্জনবাস ও একাকীত্ব অবলম্বন করা ছাড়া অন্তর থেকে উৎপাটিত হয় না। সুতরাং আলেমের উচিত অন্তর থেকে এধরনের গোপন মহব্বতকে খুঁজে বের করা এবং তা দূরীকরণের চিন্তা করা। মুত্তাকী আলেমের জন্যে হল এই চিন্তা-ভাবনা। আর আমাদের মত লোকদের তো সেসব বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, যা দ্বারা আমাদের ঈমান কিয়ামতের দিন শক্তিশালী হয়। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ আমাদেরকে দেখলে নিশ্চিতরূপেই বলবেন এরা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। কারণ, যারা জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস করে, আমাদের আমল তাদের আমলের মত নয়। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে ভয় করে, সে সেই বস্তু থেকে পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাংখা করে, সে সেই বস্তু অন্বেষণ করে। আমরা আরও জানি, দোযখ থেকে পলায়ন হারাম কর্ম ও গোনাহ্ বর্জনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অথচ আমরা এগুলোতে আকণ্ঠ ডুবে থাকি। আমাদের আরও জানা আছে যে, জান্নাতের অন্বেষণ অধিক পরিমাণে নফল এবাদতের মাধ্যমে হয়। আমরা এতেও ক্রুটি করি; বরং আমাদের ফরয এবাদতও ঠিকমত আদায় হয় না। সুতরাং আমরা আমাদের ইলমের ফল এই

পেয়েছি যে, দুনিয়ালোভী হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ আমাদের অনুসরণ করবে এবং বলবে, যদি দুনিয়ার লোভ খারাপ হত, তবে আলেমগণ আমাদের তুলনায় এ থেকে অধিক বেঁচে থাকত। আমরা এখন ভাবছি, আমরা (আলেমরা) যে ফেতনার সম্মুখীন, তা খুবই গুরুতর। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের অবস্থা সংশোধন করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে তওবার তাওফীক দেন। তিনি করুণাময় ও নেয়ামতদাতা।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ বান্দা তার গুণাবলী ও হাল সম্পর্কে চিন্তাভাবনার আলোচনা এতটুকুই যথেষ্ট। এতেই চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও কাজকর্ম সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ স্তর হল আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা। কিন্তু এধরনের চিন্তা নিষিদ্ধ। কেননা, শরীয়তে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে ফিকর কর— তাঁর সত্তা সম্পর্কে নয়। এর কারণ, তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায় এবং কোন কূল-কিনারা পায় না। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এদিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। তারাও সর্বক্ষণ তাঁকে দেখার সাধ্য রাখে না। সাধারণ মানুষ যেমন সূর্যের দিকে দেখতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; বেশীক্ষণ দেখলে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার দিকে দেখা হতবুদ্ধিতার কারণ। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পথ বর্ণনা না করাই সমীচীন। অধিকাংশ মানুষ এটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। কোন কোন আলেম অবশ্য এ বিষয়ে স্বল্প পরিমাণে বর্ণনা করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা স্থান, পার্শ্ব ও দিক থেকে পবিত্র। তিনি না জগতের অভ্যন্তরে, না বাইরে। তিনি জগতের সাথে মিলিতও নন, পৃথকও নন। এই অল্প-বিস্তর বর্ণনা থেকেই কিছু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যাতে তারা একে অস্বীকারই করে বসেছে। বরং কিছুসংখ্যক লোক তো আরো কম বর্ণনাও বরদাশত করতে পারেনি। তাদের কাছে যখন বলা হল যে, আল্লাহ তাআলা মাথা, হাত, পা, চক্ষু ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে মুক্ত, তখন তারা তা মেনে নিল না এবং ধারণা করল যে, এই সংজ্ঞা আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপে ক্রটির কারণ। তাদের মতে মাহাত্ম্য

ও প্রতাপ এ সকল অঙ্গের মধ্যে সীমিত। কেননা, মানুষ কেবল নিজেকেই জানে ও চিনে। কাজেই যে, বস্তু গুণে মানুষের সমান নয়, কোন মাহাত্ম্যও সে বুঝে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা জনৈক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠান যে, আমার বান্দাদের কাছে আমার গুণাবলী বর্ণনা করো না। করলে তারা আমাকে মানবে না। বরং আমার অবস্থা এমন ভাষায় বর্ণনা কর, যা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা নিষিদ্ধ বিধায় আমরা এ বিষয়টি ছেড়ে অন্য বিষয়ের প্রতি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছি। তা হল, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়াকর্ম ও সিফাতের রহস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। কেননা, এসবের মধ্যে তাঁর প্রতাপ, মাহাত্ম্য, পবিত্রতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা পাওয়া যায়। অতএব সিফাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সিফাতের ফলাফল দ্বারাই করা উচিত। তাঁর সিফাতের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সাধ্য যখন আমাদের নেই, তখন সিফাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই উচিত। যেমন, সূর্য যখন চমকিতে থাকে, তখন আমরা তার দিকে তাকাতে পারি না; বরং ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাতে পারি এবং এর মাধ্যমেই চন্দ্র ও তারকার আলোর তুলনায় সূর্যকিরণের গুরুত্ব বুঝতে পারি। কারণ, ভূপৃষ্ঠের আলোকিত হওয়া সূর্যকিরণেরই ফল। দুনিয়াতে যা কিছু বিদ্যমান সমস্তই খোদায়ী কুদরতের ফল এবং আল্লাহর সত্তার নূরসমূহের একটি নূর।

সূর্যগ্রহণের সময় আমরা পাত্রে পানি রেখে তাতে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য অবলোকন করি, যাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি না হয়। সুতরাং সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যে পানি একটি উপায়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজকর্মও তাঁর গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার উপায়। এই উপায়ে গুণাবলী প্রত্যক্ষ করলে জ্ঞান-বুদ্ধির হতবাক হওয়ার আশংকা থাকে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

تفكروا فى خلق الله ولاتتفكروا فى ذات الله -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর এবং তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না।

সুতরাং এখন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার নিয়ম-পদ্ধতি জানা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছু বিদ্যমান, তা তাঁরই কর্ম ও তাঁরই সৃষ্টি। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অসংখ্য বৈচিত্র্য ও রহস্য রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, প্রতাপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ আমরা কিছু বৈচিত্র্য ও রহস্যের উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তা'আলার সৃজিত অনেক বিদ্যমান বস্তু আমাদের জানার বাইরে রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যায় না। আমাদের অজানা বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন— وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, তিনি এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। আবার এমনও অনেক বস্তু রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জানি— বিস্তারিত নয়। এরূপ বস্তুসমূহকে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্যে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। এরূপ বস্তুর কতক চোখে দেখা যায় এবং কতক দেখা যায় না। যেগুলো চোখে দেখা যায় না, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আরশ, কুরসী ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিসর খুবই অল্প। যে সকল বস্তু দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ। আকাশে দেখা যায় তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, তাদের পরিভ্রমণ, উদয়, অস্ত ইত্যাদি। পৃথিবীতে দেখা যায় পর্বতমালা, খনি, খাল, বিল, নদী, প্রাণী ও উদ্ভিদ। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীতে দেখা যায় মেঘমালা, বৃষ্টি, বরফ, শিলা, বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝড়ঝঞ্ঝা। মোটকথা, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের হাজারো শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। এগুলোর আকার-আকৃতি ও গুণাগুণে যে পরিমাণ বিভিন্নতা দেখা যায়, সে পরিমাণে বিভক্তিও বেড়ে যায়। এগুলোর প্রত্যেকটি প্রকার নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী, আকাশ ও নক্ষত্রের প্রতিটি কণাকেই আল্লাহ তা'আলা গতিশীল করেন। এসব বস্তু আল্লাহ তা'আলার একত্ব, প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। কোরআন মজীদে এসব বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

এ ধরনের আয়াত কোরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। কোন কোন আয়াতে চিন্তাভাবনার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তা'আলার এক নিদর্শন এই যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে এবং মানুষের সর্বাধিক নিকটবর্তী হচ্ছে তার নফস। এতে আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্যের পরিচায়ক এত অধিক বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে যে, মানুষ সারা জীবন অধ্যয়ন করেও তার এক-দশমাংশও জানতে পারে না। অথচ সে এগুলো থেকে গাফেল। যে মানুষ নিজের নফস্ থেকেই গাফেল, সে অন্যের মারেফত লাভ করার আশা কিরূপে করতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে মানুষকে তার নিজের নফস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে—

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ, স্বয়ং তোমাদের মধ্যে কি রয়েছে, তা কি তোমরা দেখ না?

আরও উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ নাপাক বীর্য দ্বারা সৃজিত। এরশাদ হয়েছে—

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ

فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ -

অর্থাৎ, মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন? বীর্য থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার বিকাশ সাধন করেছেন। এরপর তার পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তাকে সমাহিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ -

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হল এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى -

অর্থাৎ, মানুষ কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর হয়েছে রক্তপিণ্ড। এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দিয়েছেন ও সুঠাম করেছেন।

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ فَجَعَلْنَاهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ إِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ, মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতর্ককারী।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর আমি তাকে বীর্যরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। এরপর আমি বীর্যকে পরিণত করি জমাট রক্তে। অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে। অতঃপর আমি অস্থিপিঞ্জরকে পরিয়ে দেই মাংস।

অতএব কোরআন মজীদে বারবার বীর্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বীর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বলা। উদাহরণতঃ এভাবে যে, এটি একটি অপবিত্র পানির ফোঁটা, যা কিছুক্ষণ বায়ু লাগা অবস্থায় রেখে দিলে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। রব্বুল আলামীন এই নাপাক বস্তুটিকে নরের মেরুদণ্ড এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে কিরূপে বের করেছেন! নর ও নারীর কিরূপে মিলন ঘটিয়েছেন! নর ও নারীর অন্তরে পারস্পরিক প্রেম ও ভালবাসা স্থাপন করে তাদেরকে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। অতঃপর সহবাসের মাধ্যমে নর থেকে বীর্য বের করে নারীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করেছেন। এরপর ঋতুর নাপাক রক্ত কোন কোন শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে টেনে গর্ভাশয়ে একত্রিত করেছেন এবং বীর্য থেকে ভ্রূণ তৈরী করে তাকে ঋতুর রক্ত খাইয়ে খাইয়ে লালন-পালন করেছেন। শুভ্র উজ্জ্বল বীর্যকে তিনি কিরূপে লাল জমাট রক্তে পরিণত করেছেন, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছেন। যে বীর্যের সকল অংশ একইরূপ ছিল তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এক অংশকে অস্থি, এক অংশকে শিরা-উপশিরা এবং এক অংশকে মাংসে পরিণত করেছেন। এরপর মাংস ও শিরা দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ কিরূপে তৈরী করেছেন। মাথা গোলাকার করেছেন, কান, চক্ষু, নাক ও মুখমণ্ডলকে প্রশস্ত করেছেন এবং হাত-পা-কে লম্বা বানিয়েছেন। এগুলোর মাথায় অঙ্গুলি সংযুক্ত করেছেন। এরপর অভ্যন্তরীণ অঙ্গ অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, গর্ভাশয়, মূত্রাশয় ও অন্ত্র কিরূপে তৈরী করেছেন। প্রত্যেকটির আকার, পরিমাণ ও কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

চক্ষুকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক স্তরের গুণাগুণ ভিন্ন এবং আকারও ভিন্ন। যদি একটি স্তর বিফল হয়ে যায় অথবা কোন গুণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাবে।

এখন অস্থি সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, নরম ও তরল বীর্য থেকে কেমন শক্ত ও সুঠাম অস্থি নির্মিত হয়েছে! এই অস্থির সাহায্যেই দেহ সোজা থাকে। ছোট-বড়, লম্বা, বেঁটে, গোল ও প্রশস্ত ইত্যাদি অনেক প্রকারের অস্থি নির্মিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজন ছিল সকল অঙ্গ দিয়ে নড়াচড়া করার এবং বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ অঙ্গ নাড়া দেয়ার। তাই অস্থি একটি নয়— অনেক নির্মাণ করে সেগুলোর মধ্যে জোড়া ও গ্রন্থি স্থাপন করা হয়েছে, যাতে নড়াচড়া সহজ হয়।

এরপর মস্তকের গঠন প্রণালী লক্ষ্য করা উচিত। এখানে পঞ্চান্নটি

আলাদা আলাদা আকার-আকৃতির অস্থিকে কিরূপে একত্রিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টি অস্থি বিশেষভাবে মস্তকের উপরিভাগের, চৌদ্দটি উপরকার চোয়ালের, বারটি নীচের চোয়ালের এবং অবশিষ্টগুলো দাঁত। দাঁতের মধ্যে কতক প্রশস্ত ও চর্বণ ক্ষমতাসম্পন্ন, কতক তীক্ষ্ণ, কর্তন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কতক চোখা। এরপর গ্রীবাকে মস্তকের বাহন করে তাকে পৃষ্ঠদেশের উপর স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর নিতম্বের অস্থি পর্যন্ত চব্বিশটি আংটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। নিতম্বের অস্থি তিনটি। বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। অতঃপর পিঠের অস্থিসমূহকে বুকের অস্থি, কাঁধ, হাত, নাভির নিম্ন ও নিতম্বের অস্থিসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরপর রয়েছে, উরু, পায়ের গোছা ও পায়ের অঙ্গুলিসমূহের অস্থি। সমস্ত দেহে মোট দু'শত আটচল্লিশটি অস্থি রয়েছে। এতে সেসব ক্ষুদ্র অস্থিসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়, যেগুলো দ্বারা গ্রন্থির গর্ত ভরাট করা হয়েছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে এক নরম ও তরল শুক্রবিন্দু থেকে কেমন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অস্থির আকার-আকৃতি রেখেছেন। আলাদা আলাদা এবং সংখ্যা রেখেছেন নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে একটি বেড়ে গেলে যেমন অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায়, তেমনি একটি কম হলেও তা পূরণ করার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে অস্থি সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করা হয়, তার উদ্দেশ্য থাকে অস্থি চিকিৎসায় দক্ষতা সৃষ্টি করা। আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব উভয় চিন্তার মধ্যে বিরাট তফাত।

মোটকথা, মানুষের সমগ্র দেহ চিন্তাভাবনার বিচরণক্ষেত্র। এরপর যদি মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে তার ফলশ্রুতিতেও অনেক আশ্চর্য বিষয় ও অনন্য কারিগরী আমাদের সামনে আসে। আল্লাহ্ পাকের এসব কারিগরী একবিন্দু নাপাক পানিতে নিহিত।

এখন চিন্তা করা দরকার, যিনি এক ফোঁটা পানিতে এতসব শিল্পকর্ম করেন, তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সৃষ্টিতে না জানি কত কিছু করে থাকবেন! গঠন প্রণালীর দিক দিয়ে সৌরজগত অত্যন্ত দৃঢ়, অটল ও ঘন এবং কারিগরীর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত। মানবদেহের তুলনায় এতে অধিক অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের সমাবেশ ঘটেছে। বরং সৌরজগতের আশ্চর্য বিষয়াদির সাথে সমগ্র ভূপৃষ্ঠের আশ্চর্য বিষয়াদির কোন তুলনাই হয় না। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا -

অর্থাৎ, তোমাদের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের? তিনি সেটা নির্মাণ করেছেন। তিনি একে উচ্চ ও বিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক।

আমরা প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত কোন চিত্রকরের সুনিপূণ হাতে তৈরী সুন্দর ও নিখুঁত চিত্র দেখে চিত্রকরকে বাহবা দেই এবং তার শিল্পকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। অন্তরে তাকে একজন মহান শিল্পী বলে বিশ্বাস করতে থাকি। অথচ আমরা জানি, এ চিত্র কেবল রঙ, তুলি, সুনিপুণ হাত, প্রাচীর ও ইচ্ছাশক্তি সমন্বয়ে গঠিত। এগুলোর কোনটিই চিত্রকরের সৃষ্ট নয়; বরং এগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। চিত্রকর শুধু রঙকে এক বিশেষ ক্রম অনুসারে প্রাচীরগাত্রে সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতেই আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অপরপক্ষে স্বয়ং মানব সৃষ্টি দেখে আমরা কখনও বিস্মিত হই না যে, সৃষ্টিকর্তা এক ফোঁটা নাপাক বীর্যকে কিরূপ পৃষ্ঠদেশে ও বক্ষে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেখান থেকে বের করে তার সুসমঞ্জস আকৃতি তৈরী করেছেন। এর অংশসমূহ একই আকারের ছিল। সেগুলোকে আলাদা আলাদা অঙ্গে পরিণত করেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করে সেই শুক্রবিন্দুকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, বোধশক্তিসম্পন্ন ও বাকশক্তিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার এ অনুগ্রহ সত্যিই বিস্ময়কর যে, জন্মগ্রহণের পর শিশু যখন নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না, তখন পিতা-মাতা উভয়েই আল্লাহ প্রদত্ত স্নেহের কারণে তার সেবা-যত্ন করে। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এ স্নেহ সৃষ্টি না করতেন, তবে শিশুর চেয়ে অধিক অক্ষম এ পৃথিবীতে কেউ হত না। এরপর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েত দান করেছেন। এরপর শিশু সবল ও সুঠাম হয়ে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ, আনুগত্যশীল অথবা নাফরমান, ঈমানদার অথবা কাফের হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا
- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا - اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -

অর্থাৎ, মানুষের উপর দিয়ে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।

উপরে মানবদেহের কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর বিষয় উল্লেখ করা হল। যদিও সবগুলো লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কেউ চিন্তা করতে চাইলে এতটুকু বিষয় চিন্তা দৌড়ানোর জন্যে পর্যাপ্ত এবং এগুলো স্রষ্টার মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মানুষ এগুলো থেকে গাফেল হয়ে পেট ও পিঠের ধান্দায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত রয়েছে। সে এ ছাড়া কিছুই করতে পারে না যে, ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নিল এবং যখন উদর তৃপ্ত হয়ে গেল ঘুমিয়ে পড়ল। কাম-বাসনা উত্তেজিত হলে সহবাস করে নিল এবং ক্রোধ হলে লড়ে নিল। অথচ এসব কাজে চতুষ্পদ জন্তু এবং হিংস্র প্রাণীরাও তার সাথে শরীক। যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে চতুষ্পদ জন্তুরা বঞ্চিত, তা হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্য এবং জান ও জাহানের অত্যাশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানা। কেননা, এর মাধ্যমেই মানুষ নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের দলে প্রবেশাধিকার পায় এবং পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের তালিকাভুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকটে চলে যায়। চতুষ্পদ জন্তুরা এ স্তর লাভ করতে পারে না এবং সে মানুষও পারে না, যে দুনিয়াতে কেবল চতুষ্পদ জন্তুদের কামভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তাই এরূপ মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। কারণ, তাদের মধ্যে মূলতই খোদায়ী মারেফত লাভের ক্ষমতা নেই। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

আত্মচিন্তার পদ্ধতি জানার পর, এখন মানুষের আবাসস্থল পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পালা। পৃথিবীতেও অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। আল্লাহ

তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে শয্যা করেছেন। এতে পথ ও সড়ক নির্মাণ করে একে চলাফেরার উপযোগী করেছেন। এতে পর্বতমালার পেরেক লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে নড়াচড়া না করে। এরপর একে এত বিস্তীর্ণ করেছেন, যাতে কেউ সারা জীবন পরিভ্রমণ করেও এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে পারে না। সেমতে আল্লাহ্ পাক এসব বিষয় বর্ণনা করে বলেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ –

অর্থাৎ, আমি আকাশ নির্মাণ করেছি, আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দর বিছানাকারী।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا –

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা এর আনাচে-কানাচে বিচরণ কর।

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا –

অর্থাৎ, যিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন শয্যা।

এমনিভাবে কালামে মজীদে পৃথিবীর উল্লেখ বহু জায়গায় হয়েছে, যাতে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর উপরিভাগকে জীবন্ত মানুষের বসবাসের জায়গা করেছেন এবং অভ্যন্তর ভাগকে করেছেন মৃতদের নিদ্রাস্থল। তাই এরশাদ হয়েছে—

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا –

অর্থাৎ, আমি কি পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতদের জন্যে ধরিত্রীরূপে সৃষ্টি করিনি? যে ভূমিকে নিষ্প্রাণ দেখা যায়, বৃষ্টির পানি বর্ষিত হলে তাই সজীব হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং রঙ-বেরঙের শাক-সব্জি গজাতে থাকে। এতে নানা রকমের প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। আরও লক্ষণীয় যে,

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রান্তে উঁচু উঁচু অটল পাহাড় দিয়ে একে কিরূপে মযবুত করা হয়েছে এবং পাহাড়ের নীচে কিরূপে পানির ভান্ডার স্থাপন করা হয়েছে, যা নির্ঝরিণী ও নদী-নালার আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে! এরপর এ পানির সাহায্যেই রকমারি বৃক্ষ, শস্য, আঙ্গুর, যয়তুন, খোরমা এবং বিভিন্ন আকার, রঙ, স্বাদ ও গন্ধের অসংখ্য ফলমূল উৎপন্ন করা হয়। এসব ফলমূল স্বাদে একটির চেয়ে অপরটি সেরা। অথচ এগুলো একই পানি দিয়ে সিঞ্চিত ও একই মাটি থেকে উৎপন্ন। এরপর চিন্তা করা দরকার আল্লাহ্ তা'আলা এসব ফলমূল ও উদ্ভিদের মধ্যে কত বিচিত্র উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। উদাহরণতঃ কোনটি খাদ্যের কাজ করে, কোনটি বলকারক, কোনটি জীবন রক্ষাকারী, কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি পাকস্থলীতে পৌঁছে শিরা-উপশিরার ভেতর থেকে পিত্ত দূর করে, কোনটি স্বয়ং পিত্ত হয়ে যায়, কোনটি শ্লেষ্মানাশক, কোনটি শ্লেষ্মাবর্ধক, কোনটি রক্ত পরিষ্কারক এবং কোনটি শ্রম নিবারক।

রকম রকম জন্তু-জানোয়ারও অন্যতম নিদর্শন। এগুলোর মধ্যে কতক উড়ে, কতক ভূমিতে চলে। যারা চলে, তাদের মধ্যে কতক দু'পায়ে, কতক চার পায়ে, কতক দশ পায়ে এবং কতক একশ' পায়ে চলে। কোন কোন কীট-পতঙ্গের মধ্যে এমনটা দেখা যায়। এরপর পশু-পক্ষী, বন্য ও গৃহপালিত জীব-জন্তুর মধ্যে এত বেশী বিস্ময়কর বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যায় না। মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি ও মাকড়সার মত ছোট প্রাণীর অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি বর্ণনা করতে চাইলেও তা কারও পক্ষে নিঃশেষে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ মাকড়সা নদীর তীরে নিজের ঘর নির্মাণ করে। প্রথমতঃ সে এমন দু'টি জায়গা তালাশ করে, তার মাঝে এক হাত অথবা তদপেক্ষা কম-বেশী ব্যবধান থাকে, যাতে উভয় জায়গায় সে মুখনিসৃত এঁটেল তার পৌঁছাতে পারে। এরপর সে মুখনিসৃত লালা অর্থাৎ তার এক জায়গায় স্থাপন করে, যা তৎক্ষণাৎ সেই জায়গার সাথে চিমটে যায়। অতঃপর সে অপর প্রান্তে গিয়ে সেখানেও তার লাগিয়ে দেয়। এরপর সে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে এবং উপযুক্ত ব্যবধানে তার সংযোজন করতে থাকে। যখন উভয় জায়গায় তারের মাথা সংযোজিত হয়ে যায়, তখন সে প্রস্থের বুনন কাজ শুরু করে এবং দৈর্ঘ্যের তারের উপর প্রস্থের তার রাখতে থাকে। যেখানে প্রস্থের তার দৈর্ঘ্যের তারের উপর মিলিত হয়, সেখানে গিরা লাগায়।

এতেও সে জ্যামিতিক আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এভাবে সে এমন একটি জাল তৈরী করে, যাতে মশা-মাছি আটকা পড়ে যায়। সে নিজে এক কোণে ওৎ পেতে বসে থাকে। কোন শিকার জালে আটকে গেলে তড়াক করে সেটিকে লুফে নেয় এবং খেয়ে ফেলে। এভাবে শিকার করে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কোন প্রাচীরের কোণ তালাশ করে তার দু'প্রান্তে তার লাগিয়ে দেয়। এরপর আরও তারে সে নিজে ঝুলতে থাকে। ঝুলন্ত অবস্থায় সে মশা-মাছি ইত্যাদির অপেক্ষা করতে থাকে। কোন মাছি সেখানে এলে সে তাকে ধরে পায়ে তার জড়িয়ে দেয়। এরপর হযম করে ফেলে।

এখন প্রশ্ন হল, ক্ষুদ্র মাকড়সা এ নৈপুণ্য নিজে নিজেই আয়ত্ত করেছে, না কোন মানুষ তাকে বলে দিয়েছে অথবা শিখিয়েছে? না, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। এমতাবস্থায় সেই কি তার স্রষ্টা। একি প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য দেয় না? বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে স্রষ্টার মহিমা, কুদরত ও প্রজ্ঞা দেখতে পায়। বৃহদাকার জন্তু-জানোয়ারের কথা না-ই বললাম। এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী অসংখ্য ও অগণিত। এগুলো দেখে আমাদের বিস্ময় না লাগার কারণ হচ্ছে, হরহামেশা প্রচুর পরিমাণে দেখা। দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, যদি নতুন কোন জন্তু ও পোকা দেখি, তবে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলি ঃ সোবহানাল্লাহ, কি অদ্ভুত প্রাণী!

পৃথিবীর স্থলভাগের যৎকিঞ্চিৎ আশ্চর্য বস্তু দেখার পর এখন জলভাগের বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। জলভাগের বিস্তৃতি স্থলভাগের তুলনায় অনেক বেশী বিধায় এর আশ্চর্য বস্তুসমূহ স্থলভাগের আশ্চর্য বস্তুর চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেশী। সমুদ্রের কোন কোন জন্তু এত বিশালাকার যে, সেগুলোকে পানির উপরিভাগে দেখলে দ্বীপ বলেই ভ্রম হবে। ইতিহাসে এমনও প্রমাণ আছে যে, সমুদ্রে ভ্রমণকারীরা তিমি মাছের পিঠকে দ্বীপ মনে করে সেখানে নেমে পড়ে। এরপর আগুনের উত্তাপে তিমি যখন নড়াচড়া করতে থাকে, তখন বুঝতে পারে এটি একটি সামুদ্রিক জন্তু।

জীবজন্তুর যত প্রকার স্থলভাগে রয়েছে যেমন— গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি, তার চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এমনকি আরও অনেক বেশী প্রকার জলভাগে বিদ্যমান। এছাড়া সমুদ্রে কোন কোন প্রাণী এমনও আছে, যার নযীর স্থলভাগে পাওয়া যায় না। যারা সামুদ্রিক ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের লিখিত বই-পুস্তকে এসব প্রাণীর আকার-আকৃতি দেখা যায়।

মোটকথা, সমুদ্রবক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার এত বেশী অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য কারিগরী রয়েছে যে, সেগুলো বৃহদাকারে কয়েকটি খণ্ডে বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও প্রকাশ্যতম বস্তু হচ্ছে পানি। এটা বহমান, স্বচ্ছ, সংযুক্ত অংশবিশিষ্ট একটি শারীরিক বস্তু। এর গঠন অত্যন্ত নাযুক। দৃশ্যত এক বস্তু হলেও পৃথকীকরণকে এত দ্রুত গ্রহণ করে যেন আলাদাই। স্থলভাগের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন এরই উপর নির্ভরশীল। যদি কোন মানুষ এক ঢোক পানির মুখাপেক্ষী হয় এবং তা তাকে পান করতে না দেয়া হয়, তবে তার মালিকানায় পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থাকলে সে তা ব্যয় করেও এক ঢোক পানি সংগ্রহ করবে। পান করার পর যদি প্রস্রাবের পথে তা বের করতে নিষেধ করা হয়, তবে তার জন্যেও সে পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডার দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্ তা'আলার এমন নেয়ামত সম্পর্কেও মানুষ চিন্তাভাবনা করে না। অথচ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার বিস্তর অবকাশ রয়েছে।

পানির পর আরও একটি চিন্তাভাবনার বিষয় হচ্ছে বায়ু। এই সূক্ষ্ম বস্তুটির অবস্থান নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে। চলাফেরার সময় দেহে লাগলে এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু চোখে দেখা যায় না। জলজ প্রাণী পানিতে হাত-পা নেড়ে যেমন সাঁতার কাটে, তেমনি পাখিরাও শূন্য মণ্ডলে পাখার সাহায্যে বায়ুকে চিরে সামনে এগিয়ে যায়। ঝড়ো হাওয়ার কারণে সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠে, তেমনি ঝঞ্ঝাবাত্যার কারণে বায়ুর সমুদ্রে ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে গতিশীল করলে সে চলমান বায়ু হয়ে যায়। এরপর ইচ্ছা করলে তিনি একে বৃষ্টির সুসংবাদদাতা করে দেন। এরশাদ হয়েছে—

وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ

অর্থাৎ, আমি পানিভর্তি বায়ু পাঠাই। আবার ইচ্ছা করলে তিনি একে অবাধ্য মানুষদের জন্যে আযাবে পরিণত করে দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ -

অর্থাৎ, আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝাবায়ু, এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে। সেটা মানুষকে এমনভাবে উৎখাত করেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর কাণ্ড।

বায়ু নাযুক ও সূক্ষ্ম। এতদসত্ত্বেও তার শক্তি ও বল এভাবে অনুমান করা যায় যে, বায়ুভর্তি কোন মশক যদি কেউ পানিতে ডুবিয়ে দিতে চায়, তবে তা সম্ভব হয় না। একারণেই ভারী জাহাজ ও নৌকা পানির উপর ভেসে থাকে— নিমজ্জিত হয় না। অতএব পবিত্র সে সত্তা, যিনি ভারী জাহাজকে কোনরূপ বন্ধন ছাড়াই পানির উপর আটকে রাখেন।

এছাড়া শূন্যমণ্ডলে আরও রয়েছে মেঘমালা, বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বরফ, অগ্নিপিণ্ড ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণতঃ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়োজিত মেঘমালা।

অন্যান্য আয়াতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিরও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে আমাদের অংশ যদি এতটুকুই থেকে থাকে যে, বৃষ্টিকে চোখে দেখে নিলাম এবং বজ্রকে কানে শুনে নিলাম, তবে এতে চতুষ্পদ জন্তুও তো আমাদের সাথে শরীক। অথচ আমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু-জানায়ারের অধঃজগত থেকে উন্নতি করে ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের সাথে শামিল হতে হবে। অর্থাৎ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো দেখে নেয়ার পর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এগুলোর অভ্যন্তরীণ বিস্ময়কর বিষয়সমূহ অবলোকন করা দরকার। এক্ষেত্রেও চিন্তাভাবনা অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে যদিও কিনারা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়।

চিন্তাভাবনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আকাশ ও তারকারাজির রহস্যাবলী। যদি কারও সকল বিষয় জানা হয়ে যায় এবং নভোমণ্ডলের রহস্যাবলী জানা না যায়, তবে বাস্তবে তার কিছুই জানা হল না। কারণ আকাশ ছাড়া পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, বায়ু ইত্যাদি যত কিছু রয়েছে, আকাশসমূহের তুলনায় সবগুলো যেন সাগরের তুলনায় এক ফোঁটা পানি; বরং এর চেয়েও ক্ষুদ্র। চিন্তার বিষয়, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও তারকারাজির বিষয়টিকে কোরআন মজীদে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন

কোন সূরা নেই, যাতে এগুলোর বিরাটত্বের বিষয় উল্লিখিত হয়নি। কয়েক জায়গায় তো এগুলোর কসমও করা হয়েছে। যেমন—

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

অর্থাৎ, কসম রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের।

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ

অর্থাৎ কসম আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

অর্থাৎ, কসম তরঙ্গায়িত আকাশের।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا

অর্থাৎ, কসম আকাশের ও তার নির্মাণের।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا

অর্থাৎ, কসম সূর্যের ও তার কিরণের। কসম চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবিভূত হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

অর্থাৎ, আমি কসম করি ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى

অর্থাৎ কসম নক্ষত্রের, যখন অস্তমিত হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ, আমি কসম করি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা কসম যদি তোমরা জানতে।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেছেন, তাতে যে কি পরিমাণ বিস্ময়কর বিষয়াদি রয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি রিযিকও আকাশে আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এরশাদ হয়েছে—

وَفِى السَّمَاۤءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

তিনি আকাশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকারীদের প্রশংসায় বলেন—

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, এবং তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ويل لمن قرأ هذه الاية ثم مسح بها سبته

অর্থাৎ, দুর্ভোগ সে ব্যক্তির, যে এ আয়াত পাঠ করে, অতঃপর গোঁফে

তা দেয়।

অর্থাৎ, চিন্তাভাবনা না করেই এগিয়ে যায়। যারা সব নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের নিন্দা প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاۤءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ مُعْرِضُوْنَ

অর্থাৎ, আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

এছাড়া পৃথিবীস্থ সবকিছু দ্রুত বদলে যায়; কিন্তু আকাশ শক্ত-অটল ও অপরিবর্তনশীল। নির্ধারিত সময় এলেই কেবল এতে পরিবর্তন হবে। এরশাদ হয়েছে—

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মাথার উপর সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি।

অতএব, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, যাতে ঊর্ধ্বজগতের আশ্চর্য বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠে। মনে রেখ, ঊর্ধ্বজগত দেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে, চোখ তুলে আকাশের নীলাভ রঙ এবং তারকারাজির কিরণ দেখে নিলাম। এরূপ দেখার মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুও আমাদের সাথে শরীক। এমন দেখাই উদ্দেশ্য হলে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত আয়াতে কেন বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য।

অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কে খুব চিন্তাভাবনা করতে থাক। এতে করে হয়তো তোমার জন্যে আকাশসমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি নিজের অন্তর দ্বারা চারপাশে পায়চারি করতে পারবে। অবশেষে তোমার অন্তর আল্লাহ্র আরশের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন আশা করা যায় তুমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর মর্তবায় পৌছে যাবে, যিনি এরশাদ করেন— আমার অন্তর আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছে।

মোটকথা, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেকটি তারকার সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক হেকমত রেখেছেন। এর আকারে, বর্ণে, আকাশ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থানে এবং বিষুবরেখা ও পার্শ্ববর্তী তারকা থেকে দূরে বা কাছে থাকার মধ্যে অসংখ্য হেকমত রয়েছে। একথা সবাই জানে যে, এ সুবিশাল পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যের বিস্তৃতি এই পৃথিবীর তুলনায় একশ' ষাট গুণেরও বেশী। হাদীস থেকেও সূর্যের বিশালত্ব বুঝা যায়। যে তারকাকে আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হয়, সেগুলোর ক্ষুদ্রতম তারকাটিও পৃথিবীর চেয়ে আটগুণ বড়। আর বৃহত্তমটির তো কথাই নেই। এ থেকে তারকাসমূহের পৃথিবী থেকে ব্যবধান ও উচ্চতা অনুমান করা যায়। আল্লাহ তা'আলা এ দূরত্বের প্রতি

এভাবেই ইঙ্গিত করেছেন— رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا অর্থাৎ, তিনি আকাশকে উঁচু ও বিন্যস্ত করেছেন। হাদীসে আছে, প্রত্যেক আকাশ থেকে অপর আকাশের ব্যবধান পাঁচশ' বছরের পথ।

অতএব, আকাশ ও তারকারাজির স্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যে, তিনি কিভাবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন! কেমন করে খুঁটি ও বন্ধন ছাড়াই এগুলোকে স্থিতিশীল রেখেছেন। সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রহ সদৃশ, যার ছাদ হল আকাশ। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা যখন কোন বিত্তবান ব্যক্তির বাসভবনে যাই এবং তাকে বিচিত্র রঙের আসবাবপত্র ও সোনালী তৈজসপত্র দ্বারা সুসজ্জিত দেখি, তখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ি।

কিন্তু বিশ্বরূপী এ বিশাল বাসভবনের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কখনও বিস্মিত হই না। এ বিশাল বাসভবনটি আমরা সর্বক্ষণ দেখি। এর ভূমি, আলো, বাতাস, নীলাভ ছাদ, বিরল জীব-জানোয়ার, বিচিত্র নকশা ইত্যাদি প্রত্যহ দেখেও অন্তর দিয়ে সেদিকে মনোনিবেশ করি না। আমরা বিত্তবান ব্যক্তির যে ঘরের প্রশংসা করি, আল্লাহর ঘর কি তার চেয়ে কোন অংশে কম? বরং সেটা তো এ আলীশান ঘরেরই একটি সামান্য অংশ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা এ সুবিশাল ঘরের দিকে তাকাই না। কারণ, আমরা আমাদের পালনকর্তা, তাঁর নির্মিত ঘর ও অন্যান্য সবকিছুকে ভুলে কেবল পেট ও পিঠের ধান্দায় আপাদমস্তক ডুবে রয়েছি।

এ পর্যন্ত চিন্তাভাবনার কয়েকটি পথ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনা এসব পথেই বিচরণ করে। এতে স্রষ্টার সত্তা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বর্ণনা নেই। তবে সৃষ্টি সম্পর্কে যথাযথ চিন্তা করলে স্রষ্টার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও কুদরতের পরিচয় অবশ্যই অর্জিত হয়ে যায়। সৃষ্টির মারেফত তথা পরিচয় যত বেশী হয়, স্রষ্টার মারেফত ততই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আমরা যদি কোন কবির কবিতা পাঠ করে তাকে বড় বলে বিশ্বাস করি, তবে তার ফল এই হবে যে, যখনই তার কোন রচনা ও কবিতা আমরা পাঠ করব, তখনই তার মারেফত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাকে সম্মানও বেশী করব। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার অবস্থাও তদ্রূপ।

আল্লাহ তা'আলা নিজের রহমত ও কৃপায় আমাদেরকে চিন্তাশক্তি দান করুন এবং মূর্খদের পদস্খলন থেকে রক্ষা করুন! আমীন!

দশম অধ্যায়

মৃত্যু ও মৃত্যুর পর

যার বিচ্ছেদ মুহূর্ত মৃত্যু, যার নিদ্রাস্থল মাটির শয্যা, যার প্রিয় সঙ্গী সরীসৃপ, যার সহচর মুনকার-নকীর, যার বাসস্থান কবর, যার বিশ্রামাগার ভূগর্ভ, যার প্রতিশ্রুত স্থান কিয়ামত এবং বেহেশত অথবা দোযখ যার অবতরণস্থল, তার জন্যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করা, অন্য কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কোন কিছুর প্রস্তুতি নেয়া এবং অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা করা মোটেই শোভনীয় নয়। তার উচিত নিজেকে মৃত ও কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করা। কেননা, যা আসন্ন তা খুবই নিকটবর্তী। দূরে তা-ই, যা কখনও আসবে না। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—বিজ্ঞ সেই, যে নিজের নফসকে দাবিয়ে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে আমল করে। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত কোন বিষয় মনে বার বার স্মরণ না হয়, সে পর্যন্ত সে বিষয়ের প্রস্তুতি হতে পারে না। মনে বার বার স্মরণ তখন হয়, যখন এমন বিষয়বস্তু অব্যাহতভাবে শুনতে থাকে, যা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা মৃত্যু, তার পরবর্তী বিষয়াদি তথা আখেরাত, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে বান্দা প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত হয়। কারণ সফরের সময় আসন্ন এবং মানুষ অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে নিমজ্জিত ও উদ্‌ভ্রান্ত, তার অন্তর মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন। ফলে, সে মৃত্যুকে স্মরণ করে না। কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সে বিরক্তিবোধ করে এবং মৃত্যুর স্মরণকে ঘৃণা করে। এধরনের লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ

اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ হে রসূল, বলে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

মানুষ তিন প্রকার ঃ (১) দুনিয়ায় নিমজ্জিত, (২) তওবাকারী ও (৩) সিদ্ধি লাভকারী সাধক। প্রথম প্রকার মানুষ মৃত্যুকে স্মরণ করে না। করলেও দুনিয়ার বিষয়ে পরিতাপের কারণে করে। তখন সে মৃত্যুর নিন্দা করতে শুরু করে। মৃত্যুর স্মরণ এ ধরনের লোককে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তওবাকারী ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে, যাতে তার মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং তওবা পূর্ণতা লাভ করে। মাঝে মাঝে সে মৃত্যুকে খারাপ মনে করে এ আশংকায় যে, না জানি তওবা পূর্ণ হওয়া ও উপযুক্ত পাথেয় সংগৃহীত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু এসে পড়ে। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকে খারাপ মনে করার ব্যাপারে ক্ষমার্হ। সে এই হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় من كره لقاء الموت كره الله لقائه (যে মৃত্যুর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।)কারণ, সে মৃত্যুকে এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না। বরং এর পরিচয় নিজের ত্রুটির কারণে ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত নসীব না হয়। এর পরিচয় এই যে, সে সর্বক্ষণ পাথেয় সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকবে। এ ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। অন্যথায় সে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সিদ্ধি লাভকারী সাধক সর্বক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করে। কেননা, মৃত্যুর উপরই প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের ওয়াদা কখনও ভুলে না। এরূপ ব্যক্তি দ্রুত মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়, তার আগমনে খুশী হয় এবং মৃত্যুকে প্রিয় জ্ঞান করে, যাতে গোনাহগারদের স্থান থেকে রেহাই পেয়ে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতে পারে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ প্রিয়জন প্রয়োজনের সময় এসেছে। যে অনুতপ্ত হয়, তার যেন সফলতা নসীব না হয়। ইলাহী, তুমি জান, প্রাচুর্যের তুলনায় আমি দারিদ্র্যকে পছন্দ করি, সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতা এবং জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে অধিক ভালবাসি। অতএব, আমার জন্যে মৃত্যুকে সহজ কর, যাতে আমি তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

তওবাকারী মৃত্যুকে খারাপ জ্ঞান করার ব্যাপারে ক্ষমাযোগ্য, আর সাধক মৃত্যুকে ভাল জানা ও তার বাসনা করার ব্যাপারে ক্ষমাযোগ্য। তবে তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম সে ব্যক্তি, যে ভাল ও মন্দ জানার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সমর্পণ করে। তার কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে তাই অধিক প্রিয়, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়। এরূপ ব্যক্তি মহব্বত ও এশকের আতিশয্যে 'তাসলীম' ও রেযা' (আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি)-এর স্তরে পৌঁছে যায়।

মোটকথা, মৃত্যুকে স্মরণ করার মাঝেও সওয়াব রয়েছে। কেননা, দুনিয়াতে নিমজ্জিত ব্যক্তিও মৃত্যুকে স্মরণ করে লাভবান হয়। অর্থাৎ, সে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যুর স্মরণ তার সুখ ও আরামকে মলিন এবং আয়েশকে তিক্ত করে দেয়। যেসব বিষয়ে মানুষের আনন্দ ও খাহেশ তিক্ত হয়, সেগুলোই নাজাতের কারণ।

মৃত্যুকে স্মরণ করার ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اكثروا من ذكر هاذم اللذات

অর্থাৎ, তোমরা আনন্দ-উল্লাস ছিন্নকারীকে অধিক স্মরণ কর।

এর মর্ম মৃত্যুকে স্মরণ করে নিজের আনন্দ-উল্লাসকে বিমলিন কর, যাতে এর প্রতি তোমাদের আগ্রহ না থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হও। তিনি আরও বলেন— যদি গৃহপালিত পশু জানত, যা তোমরা জান, তবে তারা কখনও মোটা-তাজা হত না। অর্থাৎ, ক্ষীণ ও কৃশ হয়ে যেত। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে প্রশ্ন করলেন— শহীদদের সাথে কি কেউ উত্থিত হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, যে মৃত্যুকে দিবারাত্রি বিশ বার স্মরণ করে। এসব ফযীলতের কারণ, মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও আখেরাতের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার উপায়। এক হাদীসে আছে–

تحفة المؤمنين الموت

অর্থাৎ, মৃত্যু মুমিনদের উপঢৌকন।

কেনন, দুনিয়া ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জেলখানা। সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট এবং নফস ও শয়তানের তরফ থেকে বিপদে পতিত থাকে। মৃত্যুর

ফলস্বরূপ সে এ আযাব থেকে নিষ্কৃতি পায়। এই নিষ্কৃতি তার জন্যে উপঢৌকন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

الموت كفارة لكل مسلم

অর্থাৎ, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের কাফফারা।

এখানে সাচ্চা মুসলমান ও পাকা ঈমানদার বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে ঈমানদারের চরিত্র বিদ্যমান এবং যে সগীরা গোনাহ ও ছোটখাটো বিচ্যুতি ছাড়া কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় না। সে যদি ফরয কর্মের উপর কায়েম থাকে, তবে তার ছোট ছোট গোনাহের জন্যে মৃত্যু কাফফারা হয়ে যায়।

আতা খোরাসানী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক মসলিসের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। মজলিস থেকে অট্টহাসির শব্দ তাঁর কানে এলে তিনি বললেন ঃ তোমরা মজলিসে আনন্দ মলিনকারীর আলোচনাও শামিল করে নাও। লোকেরা আরয করল ঃ আনন্দ মলিনকারী কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যু। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন—

اكثروا من ذكر الموت فانه يمحو الذنوب ويزهدفى الدنيا

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। এটা গোনাহকে মিটিয়ে দেয় এবং দুনিয়া বিমুখ করে।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এসে কিছু লোককে হাসতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ কর। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠল। লোকেরা তার খুব প্রশংসা গাইল। তিনি বললেনঃ তোমাদের সে সহচর মৃত্যুকে কেমন স্মরণ করত? তারা বলল ঃ আমরা তাকে মৃত্যুকে স্মরণ করতে কখনও শুনিনি। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে সেই মর্তবার নয়, যে মর্তবার তোমরা তাকে মনে করছ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ লোকদের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ ও মহৎ কে? তিনি বললেন ঃ যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে। এর জন্যে অধিক প্রস্তুতি নেয়।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যু দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছে এবং বুদ্ধিমানের জন্যে খুশীর নাম-গন্ধ রাখেনি। রবী' ইবনে খায়ছাম (রহঃ) বলেন ঃ ঈমানদার যদি কোন কিছুর অপেক্ষা করে, তবে মৃত্যুর চেয়ে উত্তম তার জন্যে আর কিছু নেই। তিনি বলতেন ঃ আমি মরে গেলে কাউকে খবর দিয়ো না। আস্তে আমাকে মাবুদের দিকে সরিয়ে দেবে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) প্রত্যহ রাত্রিবেলায় আলেমগণকে একত্রিত করতেন, যাতে তারা মৃত্যু, আখেরাত ও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তাঁর মনে হত যেন, সামনে জানাযা নিয়ে বসে আছেন। ইবরাহীম তায়মী (রহঃ) বলেন ঃ দু'টি বস্তু আমার নিকট থেকে দুনিয়ার আনন্দকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে— একটি মৃত্যুর স্মরণ; অপরটি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর চিন্তা। আশআছ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা হাসান বসরীর কাছে গেলে কেবল দোযখ ও আখেরাতের ব্যাপার এবং মৃত্যুর আলোচনা পেতাম। হযরত সফিয়্যা (রাঃ) বলেন ঃ জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে এসে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ কর। তোমার মন নম্র হয়ে যাবে। সে তাই করল এবং দিল নরম হয়ে গেল। এরপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত আয়েশার কাছে আগমন করল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এক আলেমকে বললেন ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ শাসকদের মধ্যে আপনিই প্রথমে মৃত্যুবরণ করবেন না। অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আরও অনেক শাসক মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ আরও বলুন। আলেম বললেন ঃ আদম (আঃ) পর্যন্ত আপনার কোন পিতৃপুরুষ এমন নেই, যে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেনি। এখন আপনার পালা। হযরত ওমর একথা শুনে কেঁদে ফেললেন।

রবী' ইবনে খায়ছাম ঘরে একটি কবর খুদে রেখেছিলেন। প্রত্যহ কয়েকবার সে কবরে শয়ন করে তিনি মৃত্যুর স্মৃতিকে অম্লান রাখতেন। তিনি বলতেন— যদি এক মুহূর্তও মৃত্যুর স্মরণ আমার মন থেকে উধাও হয়ে যায়, তবে মন খারাপ হয়ে যাবে। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মৃত্যু সুখী মানুষদের সুখে ফাটল ধরিয়ে দেয়। অতএব, এমন সুখ অন্বেষণ কর, যা ধ্বংস হয় না।

মৃত্যু এক ভয়াবহ আশংকা সত্ত্বেও মানুষ এ থেকে উদাসীন। এর কারণ, তারা এর চিন্তা কম করে এবং একে স্মরণ করে না। কেউ স্মরণ

করলেও মুক্ত মনে করে না; বরং নানা কামনা-বাসনায় তাদের মন ভর্তি থাকে। ফলে, মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মৃত্যুকে স্মরণ করার পদ্ধতি এই যে, অন্তরকে মৃত্যুর স্মরণ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত করে নিবে; যেমন কোন মুসাফির জাহাজ যোগে সমুদ্র ভ্রমণ করতে চাইলে সে ভ্রমণ ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করে না। এভাবে মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রভাব হওয়া বিচিত্র নয়।

এ ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী পন্থা হল, সমকক্ষ ও সমসাময়িক মৃত ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করা অথবা তাদের মৃত্যু ও বিচ্ছেদকে মনে মনে কল্পনা করা। এভাবে চিন্তা করা যে, এখন তাদের সুন্দর দেহ মাটিতে মিশে গেছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা কিভাবে স্ত্রীদেরকে বিধবা এবং সন্তানদেরকে এতীম করে চলে গেছে! তাদের বৈঠকসমূহ কিভাবে উজাড় হয়ে গেছে। এভাবে এক এক জনকে আলাদা আলাদাভাবে স্মরণ করবে। আরও ধ্যান করবে, তারা কিভাবে চলাফেরা করত! এখন তাদের পদযুগল ও দেহের সকল গ্রন্থি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তারা কিভাবে কথা বলত এবং হাসত! এখন কীট-পতঙ্গ তাদের জিহ্বা খেয়ে ফেলেছে। মাটি তাদের দাঁত খেয়ে ফেলেছে। তারা নিজেদের জন্যে এমন কৌশল অবলম্বন করত, যা বিশ বছর পর্যন্ত তাদের অভাব মোচন করে দিতে পারে। অথচ তাদের মরণের মাত্র এক মাসই অবশিষ্ট থাকত। হঠাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত এবং কর্ণকুহরে বেহেশত অথবা দোযখের পয়গাম পৌছে দিত। এরূপ চিন্তা করার পর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবে— আমিও তো তাদের মতই একজন। তারা যেমন গাফেল ছিল, আমিও তেমনি গাফেল। তাদের যে পরিণতি হয়েছে, আমারও তাই হবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি মৃতদেরকে স্মরণ করবে, তখন নিজেকে তাদেরই মত গণ্য করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সে ব্যক্তিই সৎ, যে অপরের কাছ থেকে উপদেশপ্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ অপরের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

মোটকথা, সর্বদা এ ধরনের চিন্তা করা, কবরস্তানে যাওয়া এবং অসুস্থ লোকদেরকে দেখার মাধ্যমে মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে সজীব হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এমন প্রবল হয় যে, সদা সর্বদা চোখের সামনে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ

করে। শুধু মৌখিক স্মরণে উপকার কমই হয়। দুনিয়ার কোন বস্তু পেয়ে যখন মানুষের মন পুলকিত হয়ে উঠে, তখনই স্মরণ করা দরকার যে, এ বস্তুটি অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে। ইবনে মুতী একদিন নিজের ঘরের দিকে তাকালেন। ঘরের সৌন্দর্য তাঁর মনকে আকৃষ্ট করল। তিনি তৎক্ষণাৎ কেঁদে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি মৃত্যু না হত, তবে আমি তোকে দেখে প্রফুল্ল হতাম।

আশা সংক্ষিপ্ত করা ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে এরশাদ করেছেন— যখন তোমার ভোর হয়, তখন নিজেকে বিকেলের আলোচনা শুনিয়ো না এবং বিকেল হলে সকালের আলোচনা করো না। জীবন থেকে মৃত্যুর জন্যে কিছু নিয়ে নাও এবং সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্যে। হে আবদুল্লাহ, তোমার জানা নেই আগামী কাল তোমার কি নাম হবে— জীবিত না মৃত? হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্যে দু'টি অভ্যাসের আশংকা বেশী করি— একটি খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ও অপরটি দীর্ঘ আশা। খেয়াল-খুশীর অনুসরণ মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আর দীর্ঘ আশা হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। খবরদার, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া তাকেও দেন যাকে মহব্বত করেন এবং তাকেও দেন যাকে অপছন্দ করেন। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে ঈমান দেন। মনে রেখো, কিছু লোক দ্বীনের যোগ্য এবং কিছু লোক দুনিয়ার যোগ্য। তোমরা দুনিয়াদার না হয়ে দ্বীনদার হয়ে যাও। দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে গত হয়ে গেছে এবং আখেরাত এগিয়ে আসছে। খবরদার, তোমরা আমল করার দিনে আছ, যাতে হিসাব-নিকাশ নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা হিসাব-নিকাশের দিনে থাকবে। তখন আমল হবে না।

উম্মে মুনযির বলেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সন্ধ্যায় লোকজনের কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কি লজ্জা-শরম নেই? তারা আরয করল ঃ হুযুর, এ কি কথা। তিনি বললেন ঃ তোমরা এমন সামগ্রী সংগ্রহ কর, যা খাও না। এমন সব আশা কর, যা পাও না। এমন ঘর নির্মাণ কর, যাতে বসবাস কর না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ উসামা ইবনে যায়েদ একশ' দীনারের বিনিময়ে এক মাসের বাকীতে একটি বাঁদী খরিদ করলেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনলাম— তোমরা কি বিস্মিত

হও না যে, উসামা এক মাসের ওয়াদায় বাঁদী খরিদ করেছে? নিঃসন্দেহে সে দীর্ঘ আশা করে। কসম সে সত্তার, যার কবযায় আমার প্রাণ, আমি আমার দুচোখ কখনও এই বিশ্বাস না নিয়ে খুলি না যে, বন্ধ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ কবয করে নেবেন। আমি এরূপ বিশ্বাস নিয়েও লোকমা মুখে দেই না যে,মৃত্যুর পূর্বেই তা গলাধঃকরণ করে ফেলব। হে আদম সন্তান, তোমরা জ্ঞানী হলে নিজেদেরকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাবের জন্যে যেতেন। প্রস্রাব করে তিনি মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে নিতেন। আমি আরয করতাম— হুযুর, পানি তো আপনার কাছেই রয়েছে। তিনি বলতেন— পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব— এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তিনটি কাঠি নিলেন। একটি নিজের সামনে গাড়লেন, অপরটি তাঁর কাছে এবং তৃতীয়টি দূরে গাড়লেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান এগুলো কি? উত্তরে আরয করা হলো ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আমার সামনের কাঠিটি মানুষ। এর নিকটস্থ কাঠিটি তার মৃত্যু। আর দূরের কাঠিটি হচ্ছে মানুষের আশা। মানুষ এর সাথে সম্পর্ক রাখে, কিন্তু মৃত্যু সে পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। মাঝপথেই জীবনের অবসান ঘটে। এক হাদীসে আছে, মানুষের আশেপাশে নিরানব্বইটি মৃত্যু রয়েছে। সে এগুলো থেকে বেঁচে গেলেও বার্ধক্যের কবলে পড়ে যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এটা মানুষ, আর তার চারপাশে এগুলো তার মৃত্যু। তার দিকে ফণা তুলে রয়েছে। যার প্রতি হুকুম হয়, সেই মানুষকে ধরে বসে। যদি মানুষ এসব মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়, তবে বার্ধক্য এসে তার জীবনাবসান ঘটায়। যার আশায় সে কেবল অপেক্ষাই করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রেওয়ায়েত করেন— রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে একটি চতুর্ভুজ-রেখা আঁকলেন। অতঃপর তার মাঝখানে একটি রেখা টেনে আশেপাশে আরও কয়েকটি রেখা টানলেন। চতুর্ভুজের বাইরেও একটি রেখা টেনে বললেন ঃ তোমরা জান এগুলো কি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি মাঝখানের রেখাকে মানুষ বললেন এবং চতুর্ভুজকে মৃত্যু বললেন, যা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আশেপাশের রেখাগুলোকে তিনি বিপদাপদ বলে আখ্যায়িত করলেন, যা মানুষকে আঁচড়াতে থাকে। একটি

আঁচড়ানো ভুলে গেলে অপরটি আঁচড়িয়ে নেয়। আর বাইরের রেখাটিকে তিনি নাম দিলেন আশা।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

يهرم ابن ادم ويبقى معه اثنتان الحرص والامل

অর্থাৎ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায় এবং তার সাথে দু'টি জিনিস অবশিষ্ট থাকে— লালসা ও আশা।

এক রেওয়ায়েতে আছে—

وتشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر -

অর্থাৎ, আর যুবক হয় তার সাথে দুটি জিনিস— অর্থের লালসা ও জীবনের লালসা।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এক জায়গায় বসে ছিলেন। কাছেই এক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন— ইলাহী, এব্যক্তি থেকে আশা দূর করে দাও। বৃদ্ধ কোদাল ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং এক ঘন্টা পড়ে রইল। হযরত ঈসা (আঃ) আবার দোয়া করলেন— ইলাহী, তার আশা তাকে ফিরিয়ে দাও। বৃদ্ধ উঠে কাজ করতে লাগল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পূর্বে কেন শুয়ে রইলে এবং এখন কেন কাজ শুরু করেছ?

সে বলল ঃ কাজ করতে করতে আমার নফস আমাকে বলল, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। এখন কাজ করছ কেন? তাই আমি কোদাল ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার নফস আমাকে বলল, যে পর্যন্ত জীবিত আছ, দিনাতিপাতের চিন্তা করতেই হবে। তাই উঠে কাজ শুরু করেছি।

হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সবাই কি জান্নাতে যাওয়া পছন্দ কর? উত্তর হল ঃ জী হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তাহলে জীবনের লালসা কম কর এবং মৃত্যুকে চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে নাও। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرُ الْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرُ الْعَمَلِ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন দুনিয়া থেকে, যা আখেরাতের কল্যাণ লাভে বাধা হয়, এমন জীবন থেকে, যা মৃত্যুর কল্যাণ থেকে বিরত রাখে এবং এমন আশা থেকে, যা আমলের কল্যাণলাভে প্রতিবন্ধক হয়।

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি কবে মরব তা যদি জানা থাকত, তবে আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীনতা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এ উদাসীনতা না থাকলে জীবন যাপন ভালরূপে হত না এবং বাজারও জমত না।

হযরত হাসান বলেন ঃ ভুলে যাওয়া এবং আশা— এ দুটি মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। এ দুটি না থাকলে মুসলমান পথে বের হতে পারত না।

হযরত ছওরী বলেন ঃ সংসারের প্রতি উদাসীনতাই হচ্ছে আশা খাটো করা— মোটা খাওয়া ও কম্বল পরিধান করা নয়।

কথিত আছে, শকীক বলখী (রহঃ) নিজের ওস্তাদ আবু হাশেম রোমানীর কাছে আগমন করলেন। তাঁর চাদরের কোণে কিছু বাঁধা ছিল। ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার চাদরের কোণে ওটা কি? তিনি বললেন ঃ আমার এক ভাই কিছু বাদাম দিয়ে বলেছে এর দ্বারা ইফতার করলে সে খুশী হবে। ওস্তাদ বললেন ঃ শকীক তুমি মনে মনে একথা বল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকবে! তোমার সাথে আমার কোন কথা নেই, যাও। শকীক বলেন ঃ ওস্তাদ একথা বলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে রইলেন।

আশার কারণ ও প্রতিকার ঃ দীর্ঘ আশার কারণ হল দুনিয়ার মহব্বত। মানুষ যখন দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত হয়, তখন তার মনে দুনিয়ার বিচ্ছেদ খুব কষ্টকর হয়। সে তখন মৃত্যুকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ যাকে ঘৃণা করে, তাকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে

জড়িয়ে রাখে। ফলে, তার মন সে আশার ভেতরেই আবদ্ধ থাকে, মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকে না। যদি কোন কারণে মৃত্যু ও তার প্রস্তুতির কথা মনে উদয় হয়, তবে তার নফস তাকে বলে— এখনও অনেক দিন বাকী রয়েছে। বড় হয়ে তওবা করে নিয়ো। যখন মানুষ বড় হয়, তখন নফস বলে বুড়ো হয়ে তওবা করে নিয়ো। যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন নফস বলে— এ ঘর নির্মাণ শেষ করে অথবা এ সফর থেকে ফিরে এসে অথবা পুত্র-কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেলে তওবা করে নিয়ো।

মোটকথা, এমনিভাবে নফস মৃত্যুর প্রস্তুতিকে বিলম্বিত করতে থাকে। অথচ যে কাজ শুরু করে, তা পূর্ণ করতে আরও দশ কাজ বের হয়ে আসে। এভাবে একের পর এক দিন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু প্রস্তুতি হয়ে উঠে না। অবশেষে মৃত্যু এমন সময় এসে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে যার ধারণাও সে করে না। তখন অনুতাপ ও আফসোস ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। বেচারী মানুষ জানে না, যে কারণে আজ বিলম্বিত করে, তা কালও থাকবে; বরং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা আরও মযবুত হয়ে যাবে। মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্যে কোন না কোন সময় অবসর পাওয়া যাবে—এরূপ ধারণা করা খামখেয়ালী বৈ কিছু নয়। তবে যে আশা খাটো করে, সে-ই অবসর পায়।

মানুষ প্রায়শ নিজের যৌবনের উপর ভরসা করে এবং যৌবনে মৃত্যু আসাকে অবান্তর মনে করে। সে চিন্তা করে না যে, তার এলাকার বুড়োদেরকে গণনা করলে দশ-পাঁচ জনের বেশী হবে না। তাদের সংখ্যা কম হওয়ার একমাত্র কারণ যৌবন অবস্থায় মৃত্যু বেশী হওয়া। যতদিনে একজন বুড়ো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, ততদিনে হাজারো যুবক ও শিশু মারা যায়।

মানুষ কখনও নিজের সুস্বাস্থ্যের কারণে মৃত্যুকে অবান্তর জ্ঞান করে এবং হঠাৎ মৃত্যুর আগমনকে কঠিন মনে করে। সে জানে না, সহসা মৃত্যু হওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। রোগ-ব্যাধি তো সহসাই হয়ে থাকে। রোগী হয়ে গেলে মৃত্যু আর কত দূরে থাকে! যদি গাফেল মানুষ চিন্তা করে যে, মৃত্যুর জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই— যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে যেকোন সময় মৃত্যু আসতে পারে, এর জন্যে কোন ঋতুও নির্দিষ্ট নেই— শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্তে আসতে পারে এবং দিবারাত্রিও নির্দিষ্ট নেই, তবে অবশ্যই সে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সে তো মূর্খতা ও

দুনিয়ার মোহে পড়ে দীর্ঘ আশার হাতে গ্রেফতার হয়ে সর্বদা একথাই মনে করে যে, মৃত্যু তার সামনেই হবে। তার ধারণা, সে জানাযার সাথে চলবে; কিন্তু তার জানাযার সাথেও যে মানুষ চলবে তা কল্পনা করে না। এর প্রতিকার হল নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তার জানাযাও উঠবে এবং তাকেও কবরে দাফন করা হবে— যেমন অন্যকে করা হয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর প্রস্তুতি বিলম্বিত করা নিরেট মূর্খতা।

অতএব, বিলম্বিত করার প্রতিকার হল মূর্খতার অবসান এবং দুনিয়ার মোহ বর্জন। মূর্খতা এভাবে দূর করবে যে, উপস্থিত মন নিয়ে সাফ চিন্তা করবে এবং পূর্ণ জ্ঞানের কথাবার্তা সৎলোকদের কাছ থেকে শ্রবণ করবে। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা অবশ্য কঠিন কাজ। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এর চিকিৎসায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এর চিকিৎসা এটাই যে, আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং আখেরাতে যে মহা আযাব ও উৎকৃষ্টতম সওয়াব পাওয়া যাবে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাসের ফলে অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ কেটে যাবে। কেননা, বড় বিষয়ের মহব্বত অন্তর থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ের মহব্বতকে অপসারিত করে দেয়। অতএব, যখন দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও আখেরাতের উৎকৃষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে, তখন দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেও খারাপ মনে করবে। কেননা, প্রত্যেক মানুষ যে সামান্য দুনিয়া পায়, তাও মালিন্য ও বিস্বাদমুক্ত থাকে না। সুতরাং আখেরাতে বিশ্বাস থাকলে দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ না করারই কথা। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দুনিয়াকে আমাদের দৃষ্টিতে এমন করে দেন, যেমন তাঁর নেক বান্দাদের দৃষ্টিতে করে রেখেছেন।

আশার ক্ষেত্রে মানুষের স্তরভেদ ঃ আশার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ চিরকাল বেঁচে থাকার আশা করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ, তাদের কেউ এক হাজার বছর বয়স হওয়াকে পছন্দ করে।

কেউ বুড়ো হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়। অর্থাৎ, অন্যান্য লোকের যতটুকু বয়স ও জীবন দেখে, ততটুকুরই প্রত্যাশা করে। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াকে অত্যধিক মহব্বত করে। হাদীস শরীফে আছে— বৃদ্ধ ব্যক্তি

দুনিয়ার অন্বেষণে যুবক হয়ে যায়– যদিও বার্ধক্যের কারণে তার হাঁসুলী বাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু পরহেযগারদের কথা ভিন্ন। আর তাদের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন ব্যক্তি এক বছর বাঁচতে চায় এবং এর বেশী দিনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে না। আগামী বছর তাদের অস্তিত্ব থাকবে বলে তারা মনে করে না। তবে গ্রীষ্মকালে শীতের জন্যে এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের জন্যে উপকরণ যোগাড় করে। সারা বছরের আসবাবপত্র যোগাড় হলে তারা এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। কতক লোক শুধু গ্রীষ্ম অথবা শীত মওসুমেই বেঁচে থাকার আশা করে। এ কারণে তারা গ্রীষ্মে শীতের উপকরণ এবং শীতে গ্রীষ্মের উপকরণ সংগ্রহ করে না। কিছু লোকের আশা কেবল একদিন ও একরাত পর্যন্ত সীমিত থাকে। ফলে, তারা সারা দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে— আগামীকালের চিন্তা করে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ আগামীকালের রুযীর জন্যে যত্নবান হয়ো না। কেননা, তুমি আগামীকালের সময় পেলে, সময় ও রিযিক উভয়টিই পাবে। আর যদি আগামীকাল সময় না পাও, তবে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ এক মুহূর্তের আশা করে মাত্র। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে আবদুল্লাহ, যখন তোমার ভোর হয়, তখন বিকালের চিন্তা করো না। আর যখন বিকাল হয় তখন সকালের চিন্তাকে মনে স্থান দিয়ো না। কেউ কেউ এক মুহূর্ত বেঁচে থাকারও বিশ্বাস রাখে না। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অদূরে পানি থাকা সত্ত্বেও এস্তেঞ্জার পর মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নিতেন এ আশংকায় যে, যদি পানি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই জীবন শেষ হয়ে যায়। আবার কিছু লোক এমনও রয়েছে মৃত্যু যেন তাদের চোখের সামনেই রয়েছে এবং তাদেরকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। এধরনের লোক মৃত্যুর অপেক্ষায়ই থাকে। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর অবস্থা তা-ই ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরয করলেন ঃ আমি পা ফেলার সময় এরূপ ধারণা অবশ্যই রাখি যে, এরপর হয়তো আর দ্বিতীয় পা ফেলতে পারব না। আসওয়াদ হাবশী রাতের বেলায় নামায পড়তেন এবং ডানে-বামে তাকাতেন। কেউ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমি মালাকুল মওতকে দেখি সে কোন্ দিক দিয়ে আমার কাছে আসে। এগুলো হচ্ছে আশার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৃথক পৃথক মর্যাদা রয়েছে। তবে যার আশা এক মাস, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম,

যার আশা এক মাস একদিন। অর্থাৎ, উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কণা পরিমাণও বে-ইনসাফী করেন না। তিনি বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

অর্থাৎ, যে কণা পরিমাণও সৎ কাজ করবে, সে তা দেখবে।

আশা খাটো হওয়ার প্রভাব আমলের প্রতি অগ্রগামী হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যে দাবী করে যে, তার আশা খাটো, তার দাবীর সত্যতা আমল দ্বারা বুঝা যাবে। যদি সে এমন সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে, যার প্রয়োজন বছরের মধ্যে পড়ে না, তবে বুঝতে হবে তার আশা দীর্ঘ। তাওফীকের আলামত হচ্ছে মৃত্যু চোখের সামনে থাকা, তা থেকে এক মুহূর্তও গাফেল না হওয়া এবং এমনভাবে প্রস্তুত থাকা, যেন এখনি এসে পড়বে। এরপর যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে যায়, তবে আল্লাহর শোকর করবে যে, আল্লাহ্ তার দ্বারা আনুগত্য করিয়েছেন এবং দিনটি বিফলে যায়নি। এরপর ভোর বেলায় এমনিভাবে প্রস্তুতি নেবে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাই করবে। এটা তার জন্যেই সহজ হয়, যে আগামীকালের চিন্তা করে না। এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে সৌভাগ্য লাভ করবে এবং জীবিত থাকলে উত্তম প্রস্তুতি ও মোনাজাতের আনন্দে উৎফুল্ল থাকবে।

দ্রুত আমল করা ও বিলম্ব থেকে বেঁচে থাকা ঃ যে ব্যক্তির দু'ভাই বিদেশে অবস্থান করে এবং একজনের আগামীকাল ফিরে আসার ও অপরজনের এক বছর পর ফিরে আসার কথা থাকে, সে সেই ভাইয়ের আগমনেরই প্রস্তুতি নেবে, যে আগামী কাল আসবে। এক বছর পর যে ভাই আসবে, তার জন্যে প্রস্তুতি নেবে না। এ থেকে বুঝা যায়, নিকটতম সময়ে যার অপেক্ষা করা হয়, প্রস্তুতি তার জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এক বছর পর মৃত্যুর আগমনের অপেক্ষা করে, তার অন্তর সে মেয়াদের সাথেই সংযুক্ত থাকে। সে অন্তর্বর্তী দিনগুলোতে মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করে না। সে প্রত্যহ সকালে মনে করে এখনও পূর্ণ এক বছর সামনে আছে। সে সেদিনকেই বছরের শুরু মনে করে, যে দিনে সে বিদ্যমান। দিন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু এক বছর এক বছরই থেকে যায়–হ্রাস পায় না। এ মনোবৃত্তি তাকে দ্রুত আমল করতে দেয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর—

যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে রুগ্নাবস্থার পূর্বে, প্রাচুর্যকে দারিদ্রের পূর্বে, অবসর মুহূর্তকে কর্মব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

অর্থাৎ, দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ লোকসানে পতিত— একটি সুস্থতা এবং অপরটি অবসর। অর্থাৎ, মানুষ এ দু'টি নেয়ামতকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে না। কিন্তু যখন এগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন এর কদর বুঝে। এক হাদীসে আছে— যে ভয় করে, সে রাতের শুরু ভাগেই রওয়ানা হয়ে যায়। আর যে শুরু ভাগে রওয়ানা হয়, সে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনরূপ উদাসীনতা অথবা ভ্রান্তি লক্ষ্য করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—

اتتكم الموت راتبة لازمة امابشقاوة وامابسعادة

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে মৃত্যু এসেছে অপরিহার্য হয়ে দুর্ভাগ্য নিয়ে অথবা সৌভাগ্য নিয়ে। কোরআনের আয়াত—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا -

অর্থাৎ, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কার আমল সুন্দর, তা দেখার জন্য।

সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে, তার প্রস্তুতি ভালরূপে নেয় এবং তাকে বেশী ভয় করে।

সহীম বলেন ঃ আমি আমের ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ কেন এসেছ বলে ফেল। আমি একজনের অপেক্ষা করছি। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কার অপেক্ষায় আছেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, আমি মালাকুল মওতের

অপেক্ষায় আছি। একথা শুনে আমি সেখান থেকে প্রস্থান করলাম এবং তিনি নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন।

হযরত দাউদ তাঈ পথ চলছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে যেতে দাও। আমি আমার প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সবকিছুতে বিলম্ব করা ভাল— আখেরাতের আমল ছাড়া।

হযরত হাসান (রহঃ) ওয়ায প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমল করার জন্যে তাড়াহুড়া কর। কেননা, জীবন কয়েকটি নিঃশ্বাস মাত্র। যদি আটকে যায়, তবে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আমল করতে পারবে না। আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে নিজের চিন্তা করে এবং গোনাহের জন্যে কাঁদে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

অর্থাৎ, আমি তো মানুষের গণনা পূর্ণ করি। অর্থাৎ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গণনা করি। গণনা শেষে মানুষের প্রাণ নির্গত হয়।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি এত পরিশ্রম করবেন না। নিজের প্রতি নম্রতা করুন। তিনি বললেন ঃ ঘোড়দৌড়ে ঘোড়া যখন দৌড়াতে দৌড়াতে লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি চলে যায়, তখন দৌড়ের যতটুকু ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে, সেটুকু নিঃশেষে তখনই ব্যয় করে। আমার মৃত্যুর যে সময় অবশিষ্ট আছে, সেটা এর চেয়েও কম। তিনি অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এমনিভাবে আমল করেছেন। তিনি নিজের স্ত্রীকে বলতেন ঃ বাহন কষে নাও। জান্নাতে অবতরণের কোন কিছু নেই। অর্থাৎ আমলই জান্নাতে অবতরণের বস্তু। অতএব এতে খুব চেষ্টা কর।

মৃত্যু ও সে সময়কার মোস্তাহাব আমল ঃ হযরত লোকমান নিজের পুত্রকে বলেন ঃ বৎস, মৃত্যু কখন আসবে, তা তোমার জানা নেই। সুতরাং অকস্মাৎ মৃত্যু আসার পূর্বে তুমি তার প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ আনন্দ-কোলাহলে মত্ত থাকা অবস্থায় যদি কল্পনা করে যে, এখনি এক সিপাহী এসে লাঠির উপর লাঠি মারতে থাকবে, তবে তার সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হয়ে যাবে। মানুষ জানে, মালাকুল মওত অকস্মাৎ মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু এতে তার আরাম-আয়েশ এতটুকুও মলিন হয় না। এর কারণ মূর্খতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রূহ কবয করার সময় যে অসহনীয় যন্ত্রণা ও কষ্ট হয়, তার স্বরূপ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। যে ব্যক্তি এই কষ্ট আস্বাদন করে না, সে তা দুই উপায়ে জানতে পারে। এক, অন্যান্য ব্যথা, যা সে ভোগ করেছে, তার সাথে অনুমান করে এবং দুই, অন্যের মৃত্যুকষ্ট স্বচক্ষে দেখে। অনুমান এভাবে হবে যে, মানুষের যে অঙ্গে প্রাণ থাকে না, তাতে ব্যথা অনুভূত হয় না। ব্যথা তখনই হয়, যখন সে অঙ্গে প্রাণ তথা রূহ থাকে। অতএব, যে বস্তু দ্বারা ব্যথা জানা যায়, তা হচ্ছে রূহ। কোন অঙ্গে ক্ষত অথবা জ্বালা হলে তার প্রভাব রূহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং যে পরিমাণ প্রভাব পৌঁছে, সে পরিমাণই ব্যথা হয়। ব্যথা যেহেতু মাংস, রক্ত ইত্যাদিতে সরে যায়, তাই রূহ সামান্যই ব্যথা পায়। আর যদি ব্যথা বিশেষভাবে রূহেই হয়, অন্য অঙ্গে না হয়, তবে এ ব্যথা যে একান্তই অসহনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। মৃত্যু-যন্ত্রণার অর্থ এটাই। এই যন্ত্রণা বিশেষভাবে রূহেই হয়ে থাকে এবং সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে ছড়িয়ে থাকা রূহের কোন অংশই এ ব্যথা থেকে বাদ পড়ে না। উদাহরণতঃ মানুষের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে যে ব্যথা অনুভূত হয়, তা শুধু রূহের সে অংশেই থাকে, যা দেহের সেই অংশে বিদ্যমান। কিন্তু কোন অঙ্গ আগুনে পুড়ে গেলে তার জ্বালা সমগ্র দেহে অনুভূত হয়। কেননা, আগুনের সকল অংশ দেহের সমগ্র অংশে অনুপ্রবেশ করে। কোন অংশ আগুন থেকে বাদ থাকে না। ফলে, রূহেরও কোন অংশ ব্যথা থেকে বাদ পড়ে না। মৃত্যু কষ্টও আগুনের জ্বালার অনুরূপ। রূহকে প্রতিটি শিরা-উপশিরা থেকে টেনে টেনে বের করা হয়। একারণেই বলা হয়, মৃত্যু তরবারির আঘাত, করাত দিয়ে চিরা এবং কাঁচি দিয়ে কাটার তুলনায় অধিকতর কষ্টকর। তবে তরবারির আঘাতে মানুষ চিৎকার করে; কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিৎকার করে না। এর কারণ মৃত্যু-যন্ত্রণা মানুষের অন্তর, জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গের শক্তি নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এবং চিৎকারের ক্ষমতা থাকে না। তরবারির আঘাতে এমন হয় না।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে মরতে থাকে। প্রথমে পদ যুগল শীতল হয়, এরপর গোছা, এরপর উরু, এরপর মৃত্যু কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কণ্ঠে দম আটকে যাওয়ার শব্দ না হওয়া পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল হয়। কোরআনের আয়াত—

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ -

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তওবা নেই, যারা গোনাহ করতে থাকে, অবশেষে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এখন তওবা করলাম। হযরত মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন— উদ্দেশ্য সে সময়, যখন মালাকুল মওত ও ফেরেশতাগণ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মোটকথা, অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর তিক্ততা ও কঠোরতা বর্ণনাযোগ্য নয়। একারণেই রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করেছেন—

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ, এলাহী, মোহাম্মদের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করুন।

মানুষ এবিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না। কারণ, তারা এ কষ্ট অনুমানই করতে পারে না। পয়গম্বর ও ওলীগণ খোদায়ী নূরের সাহায্যে এটা অনুমান করতে পারেন। তাই তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে খুব ভয় পান। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ! আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর, যাতে তিনি আমার উপর মৃত্যুর কঠোরতা সহজ করে দেন। কারণ, আমার মধ্যে মৃত্যুর ভয় এত বেশী যে, মরার আগেই মরে যাওয়ার দশা। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের কিছু লোক এক কবরস্তানের কাছ দিয়ে গমন করছিল। তারা পরস্পরে বলল ঃ এস দোয়া করি, যাতে এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। অতঃপর সকলেই দোয়া করলে এক কবর থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এল। তার দুচোখের মাঝখানে সেজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল ঃ লোক সকল, আমার কাছে তোমাদের কি প্রয়োজন? পঞ্চাশ বছর হয় আমি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর তিক্ততা মুখ থেকে দূর হয়নি।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যুর ব্যথা ও গলায় আটকে যাওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছেন— এর কষ্ট তরবারির তিনশ' আঘাতের সমান।

হযরত আলী (রাঃ) মানুষকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করে বলতেন, যদি তোমরা যুদ্ধে নিহত না হও, তবু মরবে। সেই সত্তার কসম, যার কবযায়

আমার প্রাণ, হাজার তরবারির আঘাত আমার কাছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করার তুলনায় সহজ।

শাদ্দাদ ইবনে আওস বলেন ঃ ঈমানদারের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে কোন ভয় মৃত্যুর চেয়ে বেশী নেই। মৃত্যু যন্ত্রণা করাত দিয়ে চিরা, কাঁচি দিয়ে কাটা এবং পাতিলে সিদ্ধ হওয়ার তুলনায় বেশী। যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে কোন মৃত জীবিত হয়ে দুনিয়াবাসীকে মৃত্যুর কষ্ট শুনিয়ে দেয়, তবে তারা নিজের জীবন দ্বারা কোন উপকার গ্রহণ করবে না এবং নিদ্রায়ও সুখ পাবে না।

জনৈক বুযুর্গ প্রায়ই রোগীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, মৃত্যু তোমার কাছে কেমন? যখন তিনি নিজে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ মৃত্যু আপনার কাছে কেমন মনে হয়? তিনি বললেন ঃ মনে হয় যেন আকাশ এসে পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে, আর আমার আত্মা সূঁচের ছিদ্র পথে বের হয়ে আসছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

موت الفجاة راحة للمؤمن واسف على الفاجر -

অর্থাৎ, আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্যে সুখ এবং পাপাচারির জন্যে পরিতাপ।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন ওফাত পেলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে আমার খলীল, তুমি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছ? তিনি বললেন ঃ যেমন উত্তপ্ত শিক ভিজা তুলার মধ্যে রেখে টেনে নেয়া হয়। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমার উপর মৃত্যুকে সহজ করেছি।

সহীহ্ রেওয়ায়েতে আছে— ওফাতের সময় রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি পেয়ালায় পানি রাখা হয়েছিল। তিনি সে পানিতে হাত ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে বুলাতেন এবং বলতেন—

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَىَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর।

হযরত ফাতেমা বলতেন, আব্বাজান, আপনার কি কষ্ট! তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ আজকের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।

হযরত ওমর (রাঃ) কা'বে আহবার (রাঃ)-কে বললেন ঃ মৃত্যুর কিছু

অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ মৃত্যু এমন, যেমন কোন কাঁটাদার শাখা কোন মানুষের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং প্রত্যেকটি কাঁটা তার সমস্ত শিরা-উপশিরায় বিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর কোন সবল ও সুঠাম ব্যক্তি শাখাটি ধরে সজোরে টান দেয়। ফলে যা আসে, তা আসে এবং যা থাকে, তা থেকে যায়।

মৃত্যুর এ কঠোরতা আল্লাহ্ তা'আলার ওলী ও দোস্তগণের প্রতি। আমরা তো গোনাহে নিমজ্জিত। আমাদের কি অবস্থা হবে? মৃত্যু-যন্ত্রণা ছাড়া আমাদের উপর আরও বিপদ আপতিত হবে। মালাকুল মওতের চেহারা দেখা একটি বড় বিপদ। মালাকুল মওত যে চেহারা নিয়ে গোনাহগারদের রূহ কবয করে, তা সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিরও দেখার সাধ্য নেই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) একবার মালাকুল মওতকে বললেন ঃ যদি সম্ভব হয় তুমি আমাকে সে আকৃতি দেখাও, যা ধারণ করে তুমি গোনাহগারের রূহ কবয কর। মালাকুল মওত আরয করল ঃ আমি দেখাতে পারি; কিন্তু আপনি সহ্য করতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ কেন সহ্য করতে পারব না? মালাকুল মওত বলল ঃ মুখ ফেরান। তিনি মুখ ফিরিয়ে পুনরায় তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, একজন কৃষ্ণকায়, কেশ খাড়া দুর্গন্ধযুক্ত কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়ানো। তার মুখ ও নাকের ছিদ্র দিয়ে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন মালাকুল মওত পূর্বের আকৃতিতে বিরাজমান ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ যদি গোনাহগার ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তোমার চেহারা দেখা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট না হয়, তবে এটাই তার কষ্টের জন্যে যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা মালাকুল মওতকে অত্যন্ত সুশ্রী ও সুগঠিত দেখতে পায়। হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বিশেষ এবাদত কক্ষ ছিল। তিনি বাইরে যাওয়ার সময় সেটি বন্ধ করে যেতেন। একদিন ফিরে এসে কক্ষের ভেতরে এক ব্যক্তিকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে আমার কক্ষে কে দাখিল করল? লোকটি বলল ঃ কক্ষের মালিক। তিনি বললেন ঃ কক্ষ তো আমার। সে বলল ঃ আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, যিনি আপনার ও আমার চেয়ে বেশী মালিক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ ফেরেশতা? সে আরয্ করল, আমি মালাকুল মওত। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ তুমি যে আকৃতি ধারণ করে মুমিনের রূহ কবয কর, তা আমাকে দেখাতে পার কি? সে আরয করল ঃ হাঁ, একটু মুখ

ফেরান। তিনি মুখ ফিরানোর পর পুনরায় তাকাতেই দেখলেন একজন সুশ্রী যুবক দাঁড়ানো। বর্ণনাকারী তার সৌন্দর্য, পোশাকের জাঁকজমক ও সুগন্ধি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ হে মালাকুল মওত, যদি মুমিন কেবল তোমারই দীদার লাভ করে এবং অন্য কোন সওয়াব না পায়, তবু তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

দু'জন লেখক ফেরেশতাকে দেখাও এরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমরা এ খবর পেয়েছি যে, মৃতের সামনে দু'জন আমল লেখক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করে। মৃতব্যক্তি আনুগত্যশীল হলে তারা বলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অনেক সৎ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ এবং অনেক সৎ কাজে হাযির করেছ। আর মৃতব্যক্তি গোনাহগার হলে তারা বলে ঃ আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান না করুন। অনেক মন্দ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ এবং অনেক মন্দ কাজে হাযির করেছ। মন্দ কথা শুনিয়েছ। এটা তখন হয়, যখন মৃতের দৃষ্টি তাদের উপর পতিত হয়।

তৃতীয় বিপদ হচ্ছে দোযখে গোনাহগারদের ঠিকানা দেখতে পাওয়া। তারা তা দেখার পূর্বেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, অন্তিম মুহূর্তে তাদের দৈহিক শক্তিগুলো শিথিল হয়ে যায় এবং আত্মা বের হওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা মালাকুল মওতের একটি বাক্য না শুনা পর্যন্ত বের হয় না। এক বাক্য গোনাহগারের জন্যে এই ঃ হে আল্লাহর দুশমন! দোযখের সুসংবাদ শুন। অপর বাক্য মুমিনের জন্যে এই ঃ হে আল্লাহর ওলী! বেহেশতের খবর শুন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— তোমাদের কেউ দুনিয়া থেকে কখনও বের হবে না, যে পর্যন্ত জান্নাতে অথবা দোযখে নিজের ঠিকানা ও বৈঠক না দেখে নেবে। এক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে ঃ

من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاءه كره الله لقاءه -

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমরা তো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন ঃ এটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের বিপদকে সহজ করে দেয়া হলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন।

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন বলেন— হে মালাকুল মওত! আমার অমুক বান্দার কাছে যাও এবং তার রূহকে আমার কাছে আন, যাতে তাকে সুখী করি। তার আমল দ্বারা আমি কেবল তাকে পরীক্ষা করছি। আমি যেমন চেয়েছিলাম, তাকে তেমনি পেয়েছি। অতঃপর মালাকুল মওত পাঁচশ' ফেরেশতা সমভিব্যাহারে সে বান্দার কাছে যায়। ফেরেশতাদের হাতে থাকে ফুলের ছড়ি, জাফরানের শাখা। প্রত্যেক ফেরেশতা তাকে নতুন সুসংবাদ শুনায়। তার রূহের জন্যে ফেরেশতারা দু'সারিতে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শয়তান তাদেরকে দেখে মাথায় হাত রেখে চিৎকার করে এবং রাগে দাঁত কটমট করতে থাকে। তার বাহিনী তাকে জিজ্ঞেস করে— তোমার কি হল? এমন করছ কেন? সে বলে— তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, এই বান্দা এত মর্তবা লাভ করল, তোমরা কোথায় ছিলে? তার খবর নাওনি কেন? বাহিনী বলে— আমরা অনেক হাত-পা মেরেছি; কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হযরত হাসান বলেন ঃ মু'মিনের সুখ আল্লাহ তা'আলার দীদারেই নিহিত। মৃত্যুর দিন তার জন্যে উল্লাস, খুশী ও ইযযতের দিন হয়ে থাকে।

জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ)-কে কেউ মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি চান? তিনি বললেন ঃ হাসান বসরীকে দেখতে চাই। হযরত হাসান বসরী তাঁর কাছে গেলে বলা হল ঃ হাসান বসরী উপস্থিত হয়েছেন। হযরত জাবের তাঁর দিকে চোখ তুলে বললেন ঃ নাও ভাই, এখন আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জান্নাত অথবা দোযখের দিকে চললাম।

মৃত্যুর সময় মানুষের উত্তম অবস্থা হচ্ছে স্থির থাকা, মুখে কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা থাকা। আকার-আকৃতি কিরূপ হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির জন্যে তিনটি বিষয় আশাব্যঞ্জক— কপালে ঘাম থাকা, চক্ষু অশ্রুসজল থাকা এবং ঠোঁট শুকনো থাকা। এগুলো আল্লাহ তা'আলার রহমতের লক্ষণ, যা তার উপর নাযিল হয়। কণ্ঠে নাক ডাকার শব্দ এবং

লোহিত বর্ণ ও ঠোঁট মেটে রঙের হওয়া আযাবের লক্ষণ। মুখ দিয়ে কালেমায়ে শাহাদত বের হওয়া কল্যাণের লক্ষণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لقنوا اموتكم لااله الاالله

অর্থাৎ, তোমরা মরণোন্মুখ ব্যক্তিদেরকে কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার উপদেশ দাও।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরপর আছে,

فانها تهدم ماقبلها من الخطايا -

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী সকল গোনাহ্ মিটিয়ে দেয়।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা মরণোন্মুখদের কাছে যাও, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং কালেমা তাইয়েবার তালকীন কর। কেননা, তারা দেখে। যে কালেমার তালকীন করবে, তার উচিত পীড়াপীড়ি না করা; বরং নম্রতা সহকারে বলা। কেননা, রোগীর জিহ্বা কোন সময় বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন তার কাছে পীড়াপীড়ি অসহনীয় মনে হয়। ফলে, কালেমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে খাতেমা অশুভ হওয়ার আশংকা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সুধারণা রাখার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াছেলা ইবনে আসকা কোন এক রোগীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ কর? সে বলল ঃ আমার গোনাহ্ আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমি আমার পালনকর্তার রহমত আশা করি। একথা শুনে ওয়াছেলা "আল্লাহু আকবার" বললেন। তার সাথে উপস্থিত সবাই "আল্লাহু আকবার" বলল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে একটি হাদীসে কুদসী শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন— আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটবর্তী থাকি। সে যা ইচ্ছা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জনৈক যুবকের কাছে মরণাপন্ন অবস্থায় গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নিজেকে কেমন মনে কর? সে আরয

করল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী এবং নিজের গোনাহের জন্যে ভীতু। তিনি বললেন ঃ এই অবস্থায় এ দু'টি বিষয় যার অন্তরে একত্রিত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা-ই দেন— যা সে আশা করে। তাকে ভয় থেকে নিরাপদ রাখেন।

মৃত্যুর সময় বান্দার সামনে তার আমলের সৌন্দর্য আলোচনা করা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মতে মুস্তাহাব, যাতে সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সুধারণা করে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যখন কোন প্রাণ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং কোন প্রাণ পশ্চিম প্রান্তে থাকে অথবা কোন জায়গায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় অথবা দুই বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তুমি কি কর? মালাকুল মওত বলল ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে আত্মাসমূহকে ডাক দেই। তারা আমার এই দু'অঙ্গুলির মধ্যে এসে যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ পৃথিবী মালাকুল মওতের সামনে বড় থালার মত বিস্তৃত থাকে। সে তা থেকে যাকে ইচ্ছা নিয়ে নেয়।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ এক বাদশাহ্ কোথাও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সে প্রথমে পোশাক আনতে বলল। পোশাক ভাল মনে হল না। অন্য পোশাক আনতে বলল। এভাবে সে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র জোড়াটি পরিধান করল। এমনিভাবে সে সওয়ারীসমূহের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম ছিল, সেটিতে আরোহণ করল। এরপর শয়তান এসে তার নাকের ছিদ্র পথে ফুঁ মেরে তাকে গর্ব ও অহংকারে পূর্ণ করে দিল। বাদশাহ্ লশকর সমভিব্যাহারে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হল। গর্ব ও অহংকারের আতিশয্যে কারও প্রতি তার দৃষ্টি পড়ত না। ইতিমধ্যে তার কাছে সেকেলে গোছের এক ব্যক্তি এসে সালাম করল। বাদশাহ্ সালামের জওয়াব দিল না। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল। বাদশাহ্ বলল ঃ লাগাম ছেড়ে দে। তুই চরম ধৃষ্টতা করেছিস। লোকটি বলল ঃ তোমার সাথে আমার কাজ আছে। বাদশাহ্ বলল ঃ আচ্ছা, বল কি বলবি। লোকটি বলল ঃ গোপন কথা বলব ঃ বাদশাহ্ মাথা নত করলে সে তার কানে আস্তে বলল ঃ আমি মালাকুল মওত। বাদশাহের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে কম্পিত স্বরে বলল ঃ আমাকে সময় দাও, যাতে আমি ঘরে ফিরে প্রয়োজন সেরে নিতে পারি এবং পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে পারি। সে বলল ঃ এখন সময় নেই। আপন ঘর

ও পরিবার-পরিজনকে দেখা তোমার আর ভাগ্য হবে না। এরপর মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল। সে কাঠের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেল।

এরপর মালাকুল মওত সামনে এগিয়ে গিয়ে এক ঈমানদারের সাথে মিলিত হল। তাকে সালাম করলে সে সালামের জওয়াব দিল। মালাকুল মওত বলল ঃ আমাকে তোমার কানে কানে কিছু কথা বলতে হবে। সে বলল ঃ খুব ভাল। সে আস্তে কানে বলে দিল। আমি মালাকুল মওত। মুমিন বলল ঃ চমৎকার। আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আমি ততটুকু আগ্রহান্বিত, যতটুকু আপনার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আগ্রহান্বিত। মালাকুল মওত বলল ঃ যে প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বের হয়েছ, তা পূর্ণ করে নাও। সে বলল, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের চেয়ে বেশী আমার অন্য কোন প্রিয় কাজ নেই। মালাকুল মওত বলল ঃ রূহ কবয করার জন্যে তুমি নিজের কোন অবস্থা পছন্দ করে নাও। সে বলল ঃ আমাকে উযু করে নামায পড়ার সময় দিন। যখন আমি সেজদায় থাকি, তখন আমার রূহ কবয করবেন। মালাকুল মওত তাই করল।

আবু বকর আব্দুল্লাহ মুযনী (রহঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি অগাধ ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে তার পুত্রদেরকে বলল ঃ তোমরা আমাকে আমার সব রকম ধন-সম্পদ দেখাও। সেমতে তার সামনে ঘোড়া, উট, গোলাম, বাঁদী ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী উপস্থিত করা হল। সে এ সমস্ত ধন-সম্পদ দেখে পরিতাপ ও ক্রন্দন করল। মালাকুল মওত তাকে ক্রন্দন করতে দেখে বলল ঃ কাঁদছ কেন? সেই সত্তার কসম, যিনি তোমাকে এই ধনরাশি দান করেছেন, তোমার দেহ থেকে তোমার আত্মা বিচ্ছিন্ন না করে আমি এ ঘর থেকে বের হব না। সে বলল ঃ আমাকে এ ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মত সময় দাও। মালাকুল মওত বলল ঃ তা হবে না। এখন আর সময় দেয়া হবে না। এর আগে দান করলে না কেন? একথা বলে মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল।

আমাশ খায়ছামা (রহঃ) রেওয়ায়েত করেন— মালাকুল মওত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর জনৈক সভাসদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বাইরে চলে আসার পর সভাসদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ সে মালাকুল

মওত। সভাসদ বলল ঃ সে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে আমার প্রাণ কেড়ে নেবে। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন ঃ এখন তোমার ইচ্ছা কি বল। সে বলল ঃ আমি চাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং বায়ুকে আদেশ করুন, যেন সে আমাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। সোলায়মান (আঃ) বায়ুকে আদেশ করলেন। বায়ু তাই করল। কিছুদিন পর মালাকুল মওত পুনরায় দরবারে আগমন করলে সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুমি আমার অমুক মুসাহিবের প্রতি বারবার তাকিয়েছিলে। এর কারণ কি? মালাকুল মওত বলল ঃ হ্যাঁ, আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছিল, আমি অমুক সময়ে পৃথিবীর অমুক প্রান্তে তার রূহ কবয করব। এমতাবস্থায় তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানেই পেয়েছি।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই ছিলেন বুযুর্গতম ব্যক্তি। মহত্ত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কেননা, তিনিই ছিলেন একাধারে তাঁর খলীল, হাবীব, মনোনীত রসূল, নবী ও পয়গম্বর। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর জীবনকাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ওফাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না; বরং অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে মনোনীত ফেরেশতাগণকে পাঠালেন, যারা অত্যন্ত দ্রুততা সহকারে তাঁর পবিত্র আত্মাকে পবিত্র দেহপিঞ্জর থেকে অপসারিত করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দিলেন। এরপরও রূহ কবয করার সময় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। মুখ দিয়ে "আহ" নির্গত হয়। উপর্যুপরি অস্থিরতা দেখা দেয়। রঙ বদলে যায় এবং কপাল ঘর্মাক্ত হয়। তাঁর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই মর্মবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নবুওয়তের পদমর্যাদা এখানে তাকদীরকে টলাতে পারেনি এবং তাঁর পরিবারের ব্যথা ও বেদনার প্রতি লক্ষ্য করেনি। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে "মকামে মাহমুদ" ও হাউযে কাওছারের অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন এবং তিনিই কিয়ামতের মাঠে অপরাধীদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে মুখ খুলবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, আমরা সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন ও হাবীবে রাব্বিল আলামীনের ওফাতদশা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করি না এবং যে অবস্থা আমাদের হবে, তা বিশ্বাস করি না; বরং আমরা

কামনা-বাসনা ও পাপাচারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকি। সম্ভবত আমরা মনে করি, আমরা চিরকাল এখানে থাকব অথবা কুকর্ম সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা বড়। কিন্তু তা সত্য নয়। আমরা বরং নিশ্চিতরূপে জানি, সবাই দোযখে নিপতিত হব। তবে যারা পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণ, তারাই কেবল দোযখ থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا -

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই দোযখ অতিক্রম করবে। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালমেদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

অতএব, প্রত্যেকের উচিত নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা, সে যালেমদের নিকটবর্তী, না পরহেযগারদের নিকটবর্তী?

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের জীবন চরিতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা সদা সর্বদা ভীত থাকতেন। রসূলে করীম (সাঃ)ও নিজের ওফাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় কি কষ্টই না তিনি পেয়েছেন! হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ঘরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলাম। তিনি অশ্রুসজল নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা এসেছ? খুব ভাল হয়েছে! আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখুন, আশ্রয় দিন এবং সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়ত করছি। তোমরা আমার পক্ষ থেকে নিজেকে এবং তোমাদের পরে যারা এই দ্বীনে দাখিল হবে, তাদেরকে সালাম বলো।

বর্ণিত আছে, ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার পর আমার উম্মতের কাণ্ডারী কে হবে? আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের কাছে ওহী পাঠালেন— আমার হাবীবকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, উম্মতের ব্যাপারে আমি তাকে লাঞ্ছিত করব না। যারা কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমার হাবীব হবে প্রথম। সবাই সমবেত

হলে সে-ই হবে তাদের নেতা। তাঁর উম্মত জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য উম্মতের জান্নাতে যাওয়া হারাম হবে। এই সুসংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এবার আমার চোখ জুড়িয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ সাতটি কূপ থেকে সাত মশক পানি আনিয়ে আমাকে গোসল করাও। আমরা তাই করলাম। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। এরপর তিনি নামায পড়লেন, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন এবং আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করলেন হে মুহাজিরগণ! তোমরা সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছ। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা আর বাড়বে না। তারা আমার বিশেষ আপন। আমি তাদের মধ্যে এসে জায়গা নিয়েছি। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের সম্মান করো আর কুকর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করো। এরপর বললেন ঃ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটস্থ বস্তুর মধ্য থেকে যেকোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর নিকটস্থ বস্তুকেই পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) কাঁদলেন এবং বুঝে নিলেন যে, তিনি নিজের অবস্থাই বর্ণনা করছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শান্ত করার জন্যে বললেন ঃ আবুবকর! শক্ত হও, ঘাবড়িয়ো না। যে সব দরজা মসজিদের দিকে খুলে, সেগুলো সব বন্ধ করে দিয়ো; কিন্তু আবুবকরের দরজা বন্ধ করো না। আমি আবুবকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাউকে জানি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র রূহ আমারই ঘরে আমারই পালার দিনে এবং আমারই কোলে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে উর্ধ্বজগতের দিকে উড্ডয়ন করে। ওফাতের সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত করে দেন। আমার ভাই আবদুর রহমান তখন একটি মেসওয়াক হাতে নিয়ে আমার কাছে হাযির হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মেসওয়াকটির দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম, এটি তার খুব ভাল লাগছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম ঃ মেসওয়াকটি আপনাকে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করলে আমি সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি মুখে দিতেই তিক্ততা অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ নরম করে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় বললেন ঃ হ্যাঁ। সেমতে আমি সেটি চিবিয়ে নরম করে

দিলাম। এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একটি পেয়ালায় পানি রাখা ছিল। তিনি পানিতে হাত রাখতেন এবং বলতেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'— মৃত্যু বড় কঠিন। অতঃপর তিনি হাত উপরে তুলে বললেন ঃ রফীকে আ'লা, রফীকে আ'লা। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, এখন তিনি আমাদেরকে অপছন্দ করবেন।

সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন— আনসাররা যখন দেখল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে, তখন তারা মসজিদে নববীর আশেপাশে জমায়েত হল। হযরত আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং আরয করলেন ঃ লোকজন সমবেত হয়েছে। তারা ভয় করছে! এরপর হযরত ফযল গেলেন এবং একই কথা বললেন। হযরত আলীও সেখানে পৌঁছে একই কথা আরয করলেন। তিনি বাহু প্রসারিত করে বললেন ঃ ধর আমার হাত। তাঁরা হাত ধরলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি বলাবলি করছে? তাঁরা আরয করলেন ঃ লোকেরা আপনার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে। পুরুষরা আপনার কাছে জমায়েত হয়েছে দেখে মহিলারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। রসূলে করীম (সাঃ) উঠলেন এবং হযরত আলী ও হযরত ফযলের সাহায্যে বাইরে এলেন। হযরত আব্বাস আগে আগে ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে পা ফেলছিলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরের নীচের সোপানে বসে গেলেন। জনতা তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও প্রশংসার পর এরশাদ করলেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমি শুনেছি তোমরা আমার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ। মনে হয় তোমরা মৃত্যুকে ঘৃণা করছ। আমি কি এর আগে আমার মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদেরকে খবর দেইনি? আমার পূর্বে যে সকল পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের কেউ মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেছেন কি? না তোমাদের মধ্যে কেউ অমর হয়েছে? শুন, আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হব। তোমরাও তাঁর সাথে মিলিত হবে। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, যারা পূর্বে হিজরত করে এখানে এসেছে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আমি মুহাজিরদেরকে পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রেখে চলার ওসিয়ত করছি। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থাৎ, মহাকালের কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পরস্পরকে সত্য ও সবরের উপদেশ প্রদান করে।

সকল কাজই আল্লাহর আদেশে হয়। কাজেই কোন ব্যাপারে বিলম্বের কারণে তোমরা তাতে জায়েয হওয়ার আবেদন করো না। কেননা, কারও তাড়াহুড়ার কারণে আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যে আল্লাহর উপর প্রবল হতে চাইবে, আল্লাহ তাকে পরাভূত করবেন। তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ -

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আনসারদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সদাচরণের ওসিয়ত করছি। কারণ, তারা তোমাদের পূর্বে মদীনায় বসবাস ও খাঁটি ঈমান অর্জন করেছে। তারা নিজেদের অর্ধেক ফসল তোমাদেরকে দান করেছে। নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মনে রেখ, যদি তোমাদের কেউ দু'ব্যক্তির উপরও শাসনক্ষমতা লাভ করে, তবে তাদের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি যা দেয়, তা যেন সে কবুল করে এবং কেউ অন্যায় করলে তাকে যেন মার্জনা করে। তাদের উপর নিজেকে যেন অগ্রাধিকার না দেয়। জেনে রেখ, তোমাদের সাক্ষী আমি। তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। সাবধান! তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হাউযে কাওছার। আমার এই হাউয সিরিয়া, বসরা ও ইয়ামনের চেয়েও প্রশস্ত। এর একটি প্রণালীর পানি দুধের চেয়েও সাদা, ফেনার চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। কেউ একবার এই পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হবে না। এর কংকর মোতি ও মৃত্তিকা মেশ্‌ক। কিয়ামতে কেউ এ থেকে বঞ্চিত

—১৮

থাকলে সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। শুন, যে ব্যক্তি কাল আমার কাছে এই হাউযে মিলিত হতে চায়, সে যেন নিজের জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখে এবং এগুলোকে যোগ্য কাজেই ব্যবহার করে। এরপর হযরত আব্বাস আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কোরায়শদের সম্পর্কে মুসলমানদের কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কোরায়শকে খেলাফতের ওসিয়ত করছি। মানুষ কোরায়শদের অনুগামী। সৎব্যক্তি তাদের সৎব্যক্তির অনুগামী এবং অসৎ লোক তাদের অসৎ লোকের অনুগামী। সুতরাং হে কোরায়শগণ! মানুষকে কল্যাণের কথা বলতে থাকবে। গোনাহ নেয়ামতকে পাল্টে দেয় এবং চরিত্রকে ধ্বংস করে। যখন জনগণ সৎকর্ম করবে, তখন তাদের শাসকও সৎকর্ম করবে। আর জনগণ কুকর্মী হলে তাদের শাসকও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, এমনিভাবে মানুষের কৃতকর্মের কারণে আমি কতক জালেমকে কতকের শাসক করে দেই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ কিছু জিজ্ঞেস করে নাও। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মৃত্যু কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, নিকটবর্তী। হযরত আবুবকর বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর নিকটস্থ বস্তু আপনার জন্যে মোবারক হোক।

আমরা যদি জানতাম আপনি কোথায় যাবেন! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর দিকে, সিদরাতুল মুনতাহার দিকে, এরপর জান্নাতে মাওয়া, জান্নাতে ফেরদাউসে আ'লা, রফীকে আ'লা, চিরন্তন জীবন ও সুমধুর আয়েশের দিকে। হযরত আবু বকর আরয করলেন ঃ আপনাকে গোসল কে দেবে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারের নিকটতম পুরুষ, এরপর যে একটু দূরের। প্রশ্ন করা হল ঃ আপনার কাফন কি হবে? তিনি বললেন ঃ আমার এসব কাপড় দিয়েই কাফন দেবে— ইয়ামনী জোড়া এবং মিসরীয় চাদর। আপনার জানাযার নামায আমরা কিভাবে পড়ব— এ প্রশ্নটি করেই হযরত আবু বকর কাঁদতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও কেঁদে বললেন ঃ ব্যস কর। আল্লাহ্ তোমাদের মাগফেরাত করুন এবং তোমাদের নবীর বিনিময়ে তোমাদেরকে উত্তম

প্রতিদান দিন। তোমরা যখন আমাকে কাফন পরিয়ে দেবে, তখন খাট আমার এ কক্ষেই আমার কবরের পার্শ্বে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা বাইরে চলে যেয়ো। সর্বপ্রথম যিনি আমার উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করবেন, তিনি হবেন, আমার পরওয়ারদেগার। তিনি এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আমার উপর নামায পড়ার অনুমতি দেবেন। সেমতে প্রথমে জিবরাঈল এসে নামায পড়বেন, এরপর মীকাঈল, এরপর ইসরাফীল, এরপর মালাকুল মওত, এরপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতা নামায পড়বে।

এরপর তোমরা ভিতরে এসে আমার জানাযা পড়বে। এক এক দল আলাদা আলাদা এসে নামায পড়বে। আমার প্রশংসা করে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। চিৎকার করো না এবং সজোরে কান্নাকাটি করো না। প্রথমে ইমাম নামায শুরু করবে আমার পরিবারের নিকটতম লোকজনকে নিয়ে। তাদের পর যারা কিছু দূরের। পুরুষদের নামাযের পর মহিলারা, এরপর কিশোরদের দল আসবে। হযরত আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন ঃ কবরে কে নামবে? উত্তর হল ঃ আমার পরিবারের কয়েকজন নিকটতম লোক অনেক ফেরেশতাদের সাথে নামবে, যাদেরকে তোমরা দেখবে না; কিন্তু তারা তোমাদেরকে দেখবে। এখন আমার কাছ থেকে প্রস্থান কর এবং আমার পরবর্তী লোকদের ধর্মের কথাবার্তা শুনাও।

আবদুল্লাহ্ ইবনে রবীআ বলেন ঃ অসুস্থতার সময় হযরত বেলাল একদিন নামায পড়ানোর জন্যে বললে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আবুবকরকে নামায পড়াতে বল। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি বাইরে এসে দরজার সামনে হযরত ওমর (রাঃ)-কে কয়েকজন লোকসহ দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে হযরত আবুবকর ছিলেন না। আমি হযরত ওমরকে বললাম ঃ আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ান। তিনি মসজিদে গমন করে নামাযের জন্যে "আল্লাহু আকবার" বললেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার 'আল্লাহু আকবার' বলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন ঃ আবুবকর কোথায়? ওমরের ইমামতি আল্লাহ্ তা'আলা মানবেন না এবং মুসলমানরাও স্বীকার করবে না। এ বাক্যটি তিনবার বলার পর তিনি বললেন ঃ আবুবকরকে বল নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আবুবকর একজন কোমলহৃদয় মানুষ। আপনার জায়গায় দণ্ডায়মান হলে তিনি কান্না সংবরণ করতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গিনী। আবুবকরকেই নামায পড়াতে বল। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন ঃ হযরত ওমরের নামায পড়ানোর পর হযরত আবুবকর নামায পড়ালেন। এরপর হযরত ওমর আমাকে বললেন ঃ হে রবীয়া তনয়! তুমি একি করলে? যদি আমার ধারণা না হত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে আমার কথা বলে থাকবেন, তবে আমি কেবল তোমার কথায় নামায পড়াতাম না। আমি বললাম ঃ তখন ইমামতির জন্যে আপনার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি।

হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমি হযরত আবুবকরের পক্ষ থেকে যে ওযর পেশ করেছিলাম, তার কারণ এই ছিল যে, তিনি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া খেলাফতে অনেক বিপদাশংকাও রয়েছে। তবে আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তার কথা ভিন্ন। আর এ আশংকাও ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই কেউ তাঁর জায়গায় নামায পড়াবে— তা হয়তো মুসলিম জনগণ পছন্দ করবে না। হযরত আবুবকর নামায পড়ালে মানুষ তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং তাকে অলক্ষুণে বলবে। কিন্তু তাই হয়, যা আল্লাহ চান। আল্লাহ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে হেফাযতে রেখেছেন এবং আমি যেসব বিষয়ের আশংকা করছিলাম, সেগুলো থেকে পরিষ্কার বাঁচিয়ে রেখেছেন। হযরত আয়েশা আরও বলেন ঃ ওফাতের দিন সকালে সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনেকটা সুস্থ দেখতে পান। এজন্যে সকলেই নিজ নিজ বাড়ি চলে গেলেন এবং খুশী খুশী কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে কেবল মহিলারা রয়ে গেল। আমি তাঁর পবিত্র মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইলাম। সেদিন আমাদের যে আশা ও আনন্দ ছিল, তা এর আগে কোন দিন ছিল না। ইতিমধ্যে তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমার কাছ থেকে বাইরে চলে যাও। এই ফেরেশতা আমার কাছে আসার অনুমতি চায়। মহিলারা বাইরে চলে গেল। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে বসলেন, তখন আমিও ঘরের এক কোণে চলে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ ধরে ফেরেশতার সাথে কানাকানি করলেন। এরপর আমাকে ডেকে নিজের মস্তক পুনরায় আমার কোলে তুলে দিলেন। মহিলাদেরকেও ভেতরে চলে আসতে বললেন। আমি আরয করলাম ঃ এই মৃদু আওয়াজ তো জিবরাঈলের ছিল না? তিনি বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ, হে আয়েশা! সে মালাকুল মওত। আমার কাছে এসে বলেছে— আল্লাহ তা'আলা আমাকে

পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বিনানুমতিতে আপনার কাছে না আসি। আপনি অনুমতি না দিলে আমি চলে যাব। অনুমতি দিলে ভেতরে আসব। আল্লাহ্ আরও নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনার কথা ছাড়া আপনার রূহ্ কবয না করি। এখন আপনি কি বল্লেন? আমি তাকে বলে দিয়েছি, জিবরাঈল না আসা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। জিবরাঈলের আসার সময় হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ তিনি বিষয়টি এমনভাবে পেশ করলেন আমাদের কাছে— যার কোন জওয়াব ছিল না। তাই আমরা চুপ করে রইলাম। এমন সময় মনে হল আমরা এক ভয়ংকর শব্দে হতবাক হয়ে গেছি। তাঁকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। বিষয়টির ভয়ঙ্করতা ও আতংকের কারণে আমাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মন-মস্তিষ্ক ভীতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিবরাঈল এসে সালাম করলেন। আমি তার মৃদু আওয়াজ চিনতে পারলাম। ঘরের সবাই বের হয়ে গেল। তিনি ভেতরে এলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম বলে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি নিজেকে কেমন অনুভব করছেন? তিনি আপনার অবস্থা আপনার চেয়ে বেশী জানেন; কিন্তু তিনি আপনার মান-সম্মান ও গৌরবকে মানুষের উপর পূর্ণাঙ্গ করতে চান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি নিজেকে বেদনাক্লিষ্ট অনুভব করছি। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্যে যে মর্তবা তৈরী করে রেখেছেন, তাতে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতে চান। তিনি এরশাদ করলেন ঃ হে জিবরাঈল, মালাকুল মওত আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। জিবরাঈল আরয করলেন ঃ হে মুহাম্মদ, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্যে ব্যাকুল। তিনি আপনার সাথে যা করতে চান, তা তো আমি বলেই দিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, মালাকুল মওত আজ পর্যন্ত কারও কাছে অনুমতি চায়নি এবং ভবিষ্যতেও কারও কাছে অনুমতি চাইবে না। কিন্তু আপনার গৌরবকে পূর্ণতা দান করা আল্লাহ্ তা'আলার লক্ষ্য এবং তিনি আপনার জন্যে অতিশয় আগ্রহী। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এখন তুমি তার আগমন পর্যন্ত এখান থেকে যাবে না। এরপর রসূলে করীম (সাঃ) মহিলাদেরকে ভেতরে ডেকে নিলেন। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমার কাছে এস। তিনি তাঁর মাথার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। যখন হযরত ফাতেমা মাথা তুললেন,

তখন তাঁর চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তোমার মাথা আমার কাছে আন। তিনি পিতার মুখের কাছে কান লাগালেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কানে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতেমার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। পরবর্তীকালে আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমবার তিনি আমাকে বললেন ঃ তিনি আজই পরলোকগমন করবেন। এতে আমি কান্না রোধ করতে পারিনি। দ্বিতীয়বার তিনি বললেন ঃ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করেছেন যাতে তাঁর পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে তাঁর সাথে মিলিত করেন এবং তাঁর সাথে রাখেন। তাই আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনি। এরপর হযরত ফাতেমা নিজের পুত্রদ্বয়কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনলেন। তিনি উভয়কে আদর করলেন। অতঃপর মালাকুল মওত এসে সালাম করল এবং অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ আমাকে আমার প্রভুর কাছে এক্ষুণি পৌঁছে দাও। মালাকুল মওত আরয করল ঃ আজই পৌঁছে দেব। আপনার প্রভু আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। অন্য কারও জন্যে তাঁর এতটুকু ব্যাকুলতা নেই। তিনি আমাকে কেবল আপনার বেলায় বিনা অনুমতিতে ভেতরে যেতে নিষেধ করেছেন— অন্য কারও বেলায় এমনটা হয়নি। কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট সময় একটু পরেই— একথা বলে মালাকুল মওত প্রস্থান করল এবং জিবরাঈল এসে আরয করল— আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা আমার পৃথিবীতে সর্বশেষ অবতরণ। এরপর কখনও অবতরণ করব না। ওহীও সমাপ্ত হল। আপনার কাছে উপস্থিতি ছাড়া পৃথিবীতে আমার কোন কাজ ছিল না। এখন আমি আমার স্থানেই থাকব।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ আল্লাহর কসম, ঘরের কারও কোন শব্দ করার সাধ্য ছিল না এবং কেউ পুরুষদেরকেও ডাকছিল না। জিবরাঈলের কথাবার্তা আমাদের সবাইকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল। এরপর আমি উঠে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মস্তক কোলে তুলে নিয়ে তাঁর বুকে হাত রেখে দিলাম। তাঁর সংজ্ঞাহীনতা শুরু হল। তাঁর কপাল থেকে এত ঘাম বের হচ্ছিল, যা আমি কোন মানুষের মধ্যে কখনও দেখিনি। আমি অঙ্গুলি দিয়ে ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি আমার জানা ছিল না।

যখনই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসত, আমি বলতাম— আপনার প্রতি আমার পিতামাতা ও বাড়ীঘর সবকিছু কুরবান হোক, আপনার কপালে এত ঘাম দিচ্ছে কেন? তিনি বললেন ঃ আয়েশা! মুমিনের প্রাণ ঘামের সাথে বের হয়, আর কাফেরের প্রাণ গাধার ন্যায় পথে নির্গত হয়। তখন আমরা ভয় পেলাম এবং নিজ নিজ ঘরে লোক পাঠালাম। সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তি আমাদের কাছে এল, সে ছিল আমার ভাই। তাকে আমার পিতা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জীবিত পায়নি। এর আগেই তিনি ঊর্ধ্বজগতে তাশরীফ নিয়ে যান। মোটকথা, কোন পুরুষ লোকের আগমনের পূর্বেই তিনি বিদায় নেন। আল্লাহ তা'আলাই সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর কাছে আসতে দেননি। কারণ, তাঁর ব্যাপারটি ছিল জিবরাঈল ও মীকাঈলের কাছে ন্যস্ত। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি একটি কথাই বলতেন— بل رفيق الاعلى এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁকে কয়েকবার এক্তিয়ার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যই বেছে নিয়েছেন। যখনই তাঁর কথা বলার শক্তি হত, তখনই বলতেন— নামায, নামায, তোমরা যতদিন জামাআতে নামায পড়বে, ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত সোমবার দিন চাশত ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছে। ফাতেমা বলেন ঃ সোমবার দিন আমার জন্যে শুভ নয়। এদিনে উম্মতের উপর বড় বড় বিপদ আসবে। কুফায় হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হলে উম্মে কুলছুমও তাই বললেন যে, এদিনটি তাঁর জন্য শুভ নয়। কেননা, এদিনেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও ওফাত পেয়েছেন, এদিনেই তাঁর স্বামী হযরত ওমর (রাঃ) শহীদ হন এবং এদিনেই তাঁর পিতা হযরত আলী শহীদ হন।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ফেরেশতারা মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দেয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর মৃত্যু অস্বীকার করলেন। কেউ কেউ বোবা হয়ে গেলেন— অনেকদিন পর্যন্ত কথা বললেন না এবং অনেকে পাগল হয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাদের মধ্যে ছিলেন, যারা মৃত্যু অস্বীকার করেছিল। তিনি বাইরে এসে বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পাননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে

ফিরিয়ে দেবেন এবং মুনাফিকদের হাত-পা কেটে দেবেন, যারা তাঁর মৃত্যু কামনা করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে যেমন চল্লিশ দিনের ওয়াদা করে নিয়ে যান, তেমনি আমাদের হুযুরকেও নিয়ে গেছেন। তিনি তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের কথা বলো না। তিনি ওফাত পাননি। আল্লাহ্র কসম, এখন থেকে যদি কাউকে একথা বলতে শুনি, তবে এই তরবারি দিয়ে তাকে আমি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব। হযরত আলী হতভম্ব হয়ে ঘরের ভেতরেই বসে রইলেন। হযরত ওসমান বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে হাতে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় যেন তিনি পথঘাটও ভুলে গিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যে অবস্থা হযরত আবুবকর ও আব্বাসের ছিল, তা আর কারও ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এ দু'জনকে তাওফীক ও দৃঢ়তা দান করেছিলেন। একা হযরত আবুবকরের সান্ত্বনাবাণীর কারণেই সবাই শান্ত ছিল। তবু হযরত আব্বাস বাইরে এসে বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, রসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি তো জীবদ্দশায় তোমাদের মধ্যে এ আয়াত পাঠ করতেন–

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পালনকর্তার সামনে বাদানুবাদ করবে।

হযরত আবুবকর বনী হারেছের কাছে অবস্থান করছিলেন। ওফাতের সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর দীদারে ধন্য হলেন। এরপর মৃতদেহের উপর ঝুঁকে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ আমার পিতা ও মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'বার মৃত্যু দেবেন না। একবারই ওফাত ছিল, যা আপনি পেয়েছেন। অতঃপর তিনি জনতার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে

মুসলমানগণ! যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূজা করত, তারা জেনে নিক তিনি ওফাত পেয়েছেন। আর যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পালনকর্তার পূজা করত, তাদের জানা উচিত তিনিই চিরঞ্জীব— কখনও মরবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا -

অর্থাৎ, মুহাম্মদ তো একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পেছন ফিরে যাবে কি? যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না।

শ্রোতাদের এমন অবস্থা হল যেন তারা এই প্রথমবার আয়াতখানি শ্রবণ করল।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) খবর পেয়ে দুরূদ পাঠ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কথায় ও কাজে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। এসেই মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করে কপালে, কপোলে চুম্বন করলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন— আমি, আমার পিতা-মাতা ও সবকিছু আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি জীবিত অবস্থায়ও চমৎকার ছিলেন এবং মরেও চমৎকার। আপনার ইন্তেকালে সে ধারা খতম হয়ে গেল, যা অন্য কোন নবীর ইন্তেকালে খতম হয়নি। তাহলো ওহীর ধারা। অতএব, আপনার মর্যাদা বর্ণনার চেয়েও বেশী এবং কান্নারও ঊর্ধ্বে। আপনার রেসালত সর্বজনীন। যদি আপনার ইন্তেকাল আপনার ইচ্ছায় না হত, তবে আপনাকে হারানোর দুঃখে আমরা জীবন উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা চোখের পানি নিঃশেষ করে দিতাম।

কিন্তু যে বিষয়টি আপনি আমাদের থেকে দূর করতে পারেন না, তা

হচ্ছে বিষাদ ও স্মৃতি। ইলাহী! আমাদের পক্ষ থেকে এটি তোমার হাবীবকে পৌছে দাও।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— যখন আবুবকর কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন ঘরময় কান্নার রোল পড়ে গেল, যা বাইরের লোকেরাও শুনতে পেল। তিনি যখন কিছু বলতেন, তখন রোল আরও বেড়ে যেত। এমতাবস্থায় জনৈক দীর্ঘদেহী সবল ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ গৃহবাসীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এরপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

বেঁচে থাকায় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন; অর্থাৎ যে চলে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বিদ্যমান থাকেন। তাঁর কাছেই আশা রাখুন এবং তাঁর উপরই ভরসা করুন। ঘরের লোকেরা আওয়াজ শুনল; কিন্তু কার আওয়াজ, তা বুঝতে পারল না। কান্না থেমে গেল। সাথে সাথে সে আওয়াজও থেমে গেল। একজন বাইরে এসে দেখল সেখানে কেউ নেই। সে ভেতরে চলে গেল এবং পুনরায় ক্রন্দন রোল উত্থিত হল। আরও একজন এসে আওয়াজ দিল এবং তাকেও কেউ চিনল না। সে বলল ঃ হে নবী পরিবার! আল্লাহকে স্মরণ করুন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর শুকরিয়া করুন। তিনিই প্রত্যেক বিপদে সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক প্রিয়জনের বিনিময়। অতএব, তাঁরই আনুগত্য করুন এবং তাঁরই হুকুম মেনে চলুন। হযরত আবুবকর বললেন ঃ এরা দু'জন হলেন খিযির ও ইলিয়াস (আঃ), তাঁরা জানাযায় এসেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— হযরত আবুবকর হযরত ওমরকে বললেন ঃ আমি শুনেছি তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত অস্বীকার কর?

তোমার কি জানা নেই যে, তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে অমুক দিন এবং অমুক দিন কথা বলেছিলেন? আল্লাহ্ তা'আলাও কোরআন পাকে বলেছেন— إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।

হযরত ওমর বললেন ঃ বিপদে মুষড়ে পড়ার কারণে আমার মনে হল যেন কোরআন মজীদের এ বিষয়বস্তু আমি অন্য কোন দিন শুনিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোরআন পাক যেমন অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি আছে এবং হাদীসও তেমনি, যেমন বলা হয়েছে। আল্লাহ্ জীবিত— কখনও মরবেন না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর সালাত ও রহমত তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরহের সওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের কাছে বসে পড়লেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দেয়ার জন্য যখন সাহাবীগণ সমবেত হলেন, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলেন ঃ আমরা জানি না, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিভাবে গোসল দেব? অন্যান্য মৃতের ন্যায় বিবস্ত্র করে, না বস্ত্রসহ গোসল? এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর নিদ্রা প্রবল করে দিলেন। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি বুকে দাঁড়ি ঠেকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। এ সময় জনৈক অজ্ঞাত বক্তা বলে উঠল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বস্ত্রসহ গোসল দাও। একথায় সকলেই চমকে উঠল এবং এই অদৃশ্য আওয়াজ অনুযায়ী গোসল দেয়া হল। গোসল শেষে কাফন পরানো হলো। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামা খুলতে চাইলে আবার আওয়াজ শুনা গেল,— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামা খুলো না। ফলে, জামা না খুলেই আমরা তাঁকে গোসল দিয়েছি। আমরা তাঁর কোন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে চাইলে তা অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যেত। আমরা ঘরের ভেতর বায়ুর শন্‌শন্ শব্দ শুনতে পেতাম।

আবু জাফর (রাঃ) বলেন, কবরে সর্বপ্রথম তাঁর বিছানা ও চাদর বিছানো হল। এরপর তাঁর পরিধেয় বস্ত্র রাখা হল। এগুলোর উপর তাঁকে কাফনসহ রাখা হল— এভাবে তাঁর বস্ত্র যা ছিল, সবই তাঁর সাথে দাফন হয়ে গেল। ওফাতের পর তাঁর কোন ধনসম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। জীবনে তিনি গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে কখনও ইটের উপর ইট রাখেননি। মোটকথা, রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত ঃ হযরত আবুবকর

সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত নিকবর্তী হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে এসে একটি কবিতা পাঠ করলেন, যার অর্থ এই ঃ যখন বুকে শ্বাসরুদ্ধ এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের কোন উপকারে আসে না। তিনি নিজের চেহারা খুলে দিয়ে বললেন ঃ কবিতা আবৃত্তি না করে এই আয়াত তেলাওয়াত কর ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ -

অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যি সত্যি আসবে। এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ।

আমার এ দু'টি বস্ত্র দেখে রাখ। এগুলো ধুয়ে আমাকে কাফন দেবে। কেননা, নতুন বস্ত্রের প্রয়োজন মৃতদের চেয়ে জীবিতদের বেশী। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার অবস্থা দেখার জন্যে আমরা চিকিৎসক ডাকব কি? তিনি বললেন ঃ আমার চিকিৎসক আমাকে দেখে বলে দিয়েছেন— - اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا اُرِيْدُ অর্থাৎ, আমি আমার ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করি।

হযরত আবু বকরকে দেখতে এসে সালমান ফারেসী বললেন ঃ হে আবু বকর! আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের জন্যে দুনিয়া জয় করাবেন। তুমি সে দুনিয়া থেকে ততটুকুই নেবে, যতটুকু তোমার দিনাতিপাতের অনুকূলে হয়। মনে রেখ, যে ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারে থাকে। অতএব, আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। করলে উপুড় অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

রোগ বৃদ্ধির দরুন হযরত আবু বকর বাইরে আসতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম অনুরোধ করলেন, আপনি একজনকে নায়েব নিযুক্ত করে দিন। সেমতে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে নায়েব নিযুক্ত করলেন। এতে কেউ কেউ আপত্তি করে বললঃ আপনি একজন কঠোর প্রকৃতির রুষ্টভাষীকে নায়েব নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর কি জওয়াব দেবেন? তিনি বললেন ঃ বলব, তোমার সৃষ্টির মধ্যে যে সর্বোত্তম ছিল, তাকেই নায়েব নিযুক্ত করেছি। এরপর হযরত ওমরকে

ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি ওসিয়ত করছি— মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলার কিছু হক দিনের বেলায় রয়েছে, যা তিনি রাতের বেলায় কবুল করেন না এবং কিছু হক রাতের বেলায় রয়েছে, যা দিনের বেলায় কবুল করেন না। ফরয এবাদত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি নফল এবাদত কবুল করেন না। সত্যের অনুসরণের কারণেই কিয়ামতের দিন সত্যাশ্রয়ীদের পাল্লা ভারী হবে। যে পাল্লায় কেবল সত্য রাখা হয়, তার ওজন বেশী হওয়াই সমীচীন। কিয়ামতের দিন হালকা পাল্লাওয়ালাদের পাল্লা একারণেই হালকা হবে যে, তারা দুনিয়াতে মিথ্যার অনুসরণ করেছে এবং পাল্লাকে হালকা মনে করেছে। যে পাল্লায় মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু রাখা হয় না, তার হালকা হওয়াই শোভনীয়। অতএব, হে ওমর! যদি তুমি আমার উপদেশ স্মরণ রাখ, তবে তোমার কাছে মৃত্যু হবে প্রিয়তম। মৃত্যুর আগমন অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তুমি যদি আমার উপদেশ অমান্য কর, মৃত্যুর চেয়ে কঠিন তোমার কাছে কোন কিছু হবে না। অথচ তুমি এ থেকে পালাতে পারবে না।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাত ঃ আমর ইবনে মায়মূন বলেন ঃ যেদিন ফজরের নামাযে হযরত ওমর ছুরিকাহত হন, সেদিন আমিও জামায়াতে দাঁড়ানো ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝখানে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন। তিনি নামাযের কাতারে কোন ত্রুটি দেখলে বলতেন ঃ কাতার সোজা করে নাও। ত্রুটি দূর হয়ে গেলে তিনি সামনে এগিয়ে যেতেন। প্রায়ই প্রথম রাকআতে সূরা ইউসুফ, নাহল অথবা এমনি অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন, যাতে অধিকসংখ্যক মুসল্লী জামায়াতে যোগ দিতে পারে। তিনি আল্লাহু আকবারই বলেছিলেন, এর পরেই আমি শুনলাম তিনি বলছেন— আমাকে কুকুরে মেরে ফেলল, খেয়ে ফেলল। দুর্বৃত্ত কাফের আবু লু'লু' তাকে আহত করার পর দুধারী ছুরি হাতে পালাতে লাগল। যাওয়ার পথে সে ডানে-বামে ছুরি চালিয়ে আরও তেরজনকে আহত করল। তাদের মধ্যে পরে নয়জন মৃত্যুবরণ করে। এক রেওয়ায়েতে সাতজন মারা যাবার কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে জনৈক মুসল্লী তার উপর নিজের চাদর ফেলে দিল। কাফের যখন দেখল, সে ধরা পড়ে গেছে, তখন নিজেই নিজেকে যবাই করে জাহান্নামে পৌঁছে গেল।

আহত হওয়ার পর হযরত ওমর আবদুর রহমান ইবনে আওফকে নামায পড়ানোর জন্যে সামনে এগিয়ে দিলেন। তখন যারা মসজিদে ছিল,

তারা তো এই ঘটনা দেখল; কিন্তু যারা মসজিদের বাইরে আশে-পাশে ছিল, তারা কিছুই জানতে পারল না। তবে হযরত ওমরের আওয়াজ থেমে গেল। তিনি সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ বলতে লাগলেন।

হযরত আবদুর রহ্মান ইবনে আওফ সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন। সালাম ফিরানোর পর হযরত ওমর হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন ঃ দেখ, আমাকে কে আহত করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ মুগীরা ইবনে শো'বার ক্রীতদাস এ কাণ্ড করেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাকে নিপাত করুক। আমি তো তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যে বলেছিলাম। আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি কোন মুসলমানের হাতে আমাকে মৃত্যু দেননি। তুমি ও তোমার পিতাই মদীনায় অনারব কাফেরদের প্রাচুর্য কামনা কর। এরূপ বলার কারণ এই যে, তখন হযরত আব্বাসের অনেক ক্রীতদাস ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস আরয করলেন ঃ আপনার মরযী হলে সবাইকে মেরে ফেলি। তিনি বললেন ঃ এখন হত্যা করলে কি হবে। এখন তো তারা তোমাদের বুলিই বলতে শুরু করেছে। তোমাদের কেবলার দিকে নামায পড়তে শুরু করেছে। তোমাদের মত হজ্জ করতে শুরু করেছে।

অতঃপর আহত খলীফাকে মসজিদ থেকে তাঁর বাসগৃহে নিয়ে আসা হল। আমরাও সঙ্গে গেলাম। জনসাধারণের অবস্থা ছিল এই যে, সেদিনের পূর্বে যেন তাদের উপর কোন মুসীবত আসেনি। তারা নিজ নিজ মন্তব্য করছিল। কেউ বলছিল ঃ আমার আশংকা, তিনি মারা যাবেন। কেউ বলছিল, কোন আশংকা নেই। ইতিমধ্যে খলীফার জন্যে আঙ্গুরের রস আনা হল। তিনি সেটা পান করতেই পেট দিয়ে বের হয়ে গেল! এরপর দুধ আনা হল। পান করার পর তাও বের হয়ে গেল। তখন সকলেই তাঁর জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেল। জনগণ এসে তার প্রশংসা করছিল। এক যুবক এসে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার জন্যে সুসংবাদ হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংসর্গ ও প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের কারণে সুউচ্চ মর্তবা অর্জিত হোক। আপনি শাসক হয়েছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি বললেন ঃ এসব বিষয়ের মাধ্যমে আমি কোন লাভ-লোকসান চাই না। যুবক যখন প্রস্থান করতে লাগল, তখন তার পায়জামা মাটি স্পর্শ করছিল। হযরত ওমর বললেন ঃ এই যুবককে আমার কাছে আন। যুবক ফিরে এলে তিনি

বললেন ঃ ভাতিজা! তোমার পায়জামা উঁচু কর। এতে ধুলাবালু ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে এবং তা তাক্ওয়ারও নিকটবর্তী।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ছেলেকে বললেন ঃ আবদুল্লাহ, দেখ আমার ঋণ কি পরিমাণ। হিসাব করে দেখা গেল ছিয়াশি হাজারের কাছাকাছি। তিনি বললেন ঃ যদি আমার পরিবারের ধন-সম্পদ দিয়ে ঋণ শোধ হয়ে যায়, তবে এ থেকেই শোধ করে দিয়ো। অন্যথায় আদী ইবনে কা'বের বংশধরের কাছ থেকে চেয়ে নিও। যদি তাতেও না কুলায়, তবে কোরায়শের কাছ থেকে নিয়ে শোধ করবে। কোরায়শ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে নেবে না। এখন তুমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে যাও এবং বল ঃ ওমর আপনাকে সালাম বলেছেন। 'আমীরুল মুমিনীন' বলবে না। কারণ, আমি আজ মুমিনদের আমীর নই। আরও বলবে— তিনি তার দু'জন সঙ্গীর সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে সালামের পর অনুমতি চাইলেন। তিনি তখন বসে কাঁদছিলেন। আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব আপনাকে সালাম বলেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবু বকরের সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। হযরত আয়েশা বললেন, আমি স্থানটি নিজের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আমি ত্যাগ স্বীকার করব এবং ওমরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেব। আবদুল্লাহ পিতার কাছে ফিরে এলে লোকেরা হযরত ওমরকে বলল ঃ আবদুল্লাহ হযরত আয়েশার কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে উঠাও। এক ব্যক্তি তাকে বসিয়ে দিলে তিনি পুত্রকে বললেন ঃ কি জওয়াব এনেছ বল। আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ আপনার প্রার্থনা হযরত আয়েশা মনযুর করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ, এর চেয়ে জরুরী আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার জানাযা নিয়ে হযরত আয়েশার দরজায় যাবে। সালাম করার পর বলবে— ওমর অনুমতি চায়। অনুমতি দিলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আর যদি অনুমতি না হয়, তবে মুসলমানদের কবরস্তানে নিয়ে দাফন করে দেবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এলেন। তাঁকে দেখে আমরা সরে গেলাম। তিনি হযরত ওমরের কাছে এসে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর তিনি অন্দরে চলে গেলেন।

অন্দর থেকে তার কান্নার আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। এরপর লোকেরা আরয করল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদেরকে কিছু ওসিয়ত করুন এবং আপনি খলীফা নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি বললেন ঃ খেলাফতের জন্যে আমি যাদেরকে যোগ্য মনে করি, তারা হলেন হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবায়র, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। আমার পুত্র আবদুল্লাহও তোমাদের কাছে যাবে। কিন্তু খেলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সা'দ যদি খলীফা হতে পারে, তবে ভাল। নতুবা যে-ই খলীফা হয়, সে যেন সা'দের সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন করে। কেননা, আমি তাকে কোনরূপ অক্ষমতা ও অসাধুতার কারণে পদচ্যুত করিনি। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসিয়ত করছি যে, যারা প্রথমে হিজরত করে মদীনায় এসেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হবে এবং তাদের সম্মান ও ইযযত অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আরও ওসিয়ত করছি যে, আনসার ভাইদের সাথে কল্যাণমূলক ব্যবহার করতে হবে। তারা মদীনায় সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে এবং সবার আগে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের দুষ্কর্মীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আরও ওসিয়ত করছি যে, পার্শ্ববর্তী শহরবাসীদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে যা অতিরিক্ত হবে অথবা তারা মনের খুশীতে দেবে, কেবল তাই নেবে। আরবদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করে তাদেরই দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করে দেবে। যিম্মিদের সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং তাদের রক্ষার জন্যে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদেরকে দেবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন আমরা জানাযা নিয়ে রওয়ানা হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আয়েশার খেদমতে গিয়ে সালাম করলেন এবং বললেন ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চান। হযরত আয়েশা বললেন ঃ ভেতরে নিয়ে এস। অতঃপর ভিতরে নিয়ে তাঁর উভয় সহচরের পাশে দাফন করা হল।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে—জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছেন— ওমরের মৃত্যুতে ইসলাম কাঁদবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন ওমরের লাশ খাটে রাখা হল, তখন জনতা এসে জানাযাকে থামিয়ে দিল। তারা জানাযা উঠার পূর্বেই দোয়া করছিল ও নামায পড়ছিল। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমার উভয় কাঁধ ধরে আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। আমি পেছন ফিরে হযরত আলীকে দেখতে

পেলাম। তিনি হযরত ওমরের জন্যে রহমতের দোয়া উচ্চারণ করলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর! তুমি নিজের পরে এমন কাউকে রেখে যাওনি, যার মত আমল করে মৃত্যুবরণ করাকে আমি পছন্দ করতে পারি। তোমার মত আমল করেই আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া আমার পছন্দনীয়। আল্লাহর কসম, আমার প্রবল ধারণা ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তোমার দুই সহচরের সাথেই রাখবেন। কারণ আমি অধিকাংশ সময় রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনতাম— আমি, আবু বকর ও ওমর গেলাম, আমি, আবুবকর ও ওমর বের হলাম, আবুবকর ও ওমর ভিতরে এল ইত্যাদি। প্রত্যেক বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এভাবে বলতে দেখে আমার মনে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই তিনজনকে একত্রে রাখবেন।

হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর ওফাত ঃ হযরত ওসমানের শাহাদতের ঘটনা সুবিদিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ওসমান যখন অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন আমি তাঁকে সালাম করতে এলাম এবং ভিতরে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন ঃ ভাই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আজ রাতে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ওসমান! শত্রুরা তোমাকে ঘেরাও করেছে? আমি আরয করলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমাকে তৃষ্ণার্ত রেখেছে? আমি আরয করলাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি একটি পানিভর্তি বালতি ঝুলিয়ে দিলেন। আমি পেট ভরে পানি পান করলাম। তার শীতলতা আমি বুকে ও কাঁধে এখনও অনুভব করছি। তিনি আরও বললেন ঃ যদি চাও সাহায্য লাভ করে তাদের উপর বিজয়ী হতে পার অথবা আমার কাছে এসে ইফতার কর। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইফতার করাকে পছন্দ করেছি। সেমতে সেদিনেই হযরত ওসমান শাহাদত বরণ করেন।

যারা হযরত ওসমানকে আহত হওয়ার পর রক্তের উপর গড়াগড়ি দিতে দেখেছিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রক্তের উপর গড়াগড়ি দেয়ার সময় হযরত ওসমান কি বলেছিলেন? লোকেরা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি— ইলাহী! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে একতা দান করুন। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দোয়া করতেন যে, তাদের মধ্যে যেন একতা না হয়, তবে কোন সময়ই তাদের মধ্যে একতা হত না।

ছামামা ইবনে হাযন কায়শরী বলেন ঃ যখন হযরত ওসমান ঘরের ছাদ থেকে নীচে জনতার দিকে দেখেছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে দু'ব্যক্তি আপনাদেরকে এখানে সমবেত করেছে, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। তাদেরকে ডাকা হল। তারা এমনভাবে এল, যেমন দু'টি গাধা অথবা দু'টি উট আসে। হযরত ওসমান জনতার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ও ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা জান যে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন, তখন রওমা কূপ ছাড়া মদীনায় কোথাও মিঠা পানির অস্তিত্ব ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কেউ আছ কি, যে এই কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে দেবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতে উত্তম প্রতিদান পাবে। তখন আমি আমার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে এই কূপটি ক্রয় করেছিলাম। কিন্তু তোমরা আজ আমাকে এই কূপের পানি পান করতে দিচ্ছ না। দরিয়ার পানিও দিচ্ছ না। জনতা বলল ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তিনি আরও বললেন ঃ তোমরা জান, আমি নিঃস্ব ও নিরস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলাম? জনতা বলল, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান, মসজিদে নামাযীদের স্থান সংকুলান হত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন— অমুকের জমি ক্রয় করে মসজিদটি সম্প্রসারিত করবে— এমন কেউ আছ কি? তখন আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে সেই জমি ক্রয় করেছি। কিন্তু আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়তে দিচ্ছ না। জনতা বলল ঃ এ ঘটনাও সত্য।

হযরত ওসমান আরও বললেন ঃ তোমরা জান, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় ছাবীর পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও আমি। এমন সময় পাহাড় নড়তে লাগল, যার ফলে কয়েক খণ্ড পাথরও নীচে খসে পড়ল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাহাড়ের গায়ে লাথি মেরে বললেন— থেমে যা হে ছাবীর! তোর উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছে। জনতা বলল ঃ আপনার বর্ণনা সত্য। তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! কা'বার পালনকর্তার কসম, এই জনতা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি নিঃসন্দেহে শহীদ।

জনৈক শায়খ বর্ণনা করেন— হযরত ওসমান আহত হওয়ার পর তাঁর

শ্মশ্রু মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তখন তাঁর মুখে ছিল এই দোয়া—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

হযরত আলী (রাঃ)-এর ওফাত ঃ ইছবাগ হানযাল বলেন ঃ যে রাতের ভোরে হযরত আলী (রাঃ) ঘাতকের হাতে আহত হন, সে রাতে তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ইবনে তাইয়াহ ফজরের সময় তাঁর কাছে এসে নামাযের কথা বলে। তিনি বিলম্ব করলেন এবং শুয়ে রইলেন। ইবনে তাইয়াহ পুনরায় এল। এবারও তিনি গাত্রোত্থানে বিলম্ব করলেন। তৃতীয় বার নামাযের কথা বলার পর তিনি শয্যা ত্যাগ করে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি ছোট দরজার কাছে পৌঁছলেন, তখন নরাধম ইবনে মুলজেম তাঁর উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

হযরত আলীর কন্যা উম্মে কুলছুম বাইরে এসে বলতে লাগলেন ঃ ফজরের নামাযের কি হল যে, আমার স্বামী হযরত ওমরও এ নামাযেই শহীদ হয়েছেন এবং আমার পিতাও এ নামাযেই শাহাদত লাভ করলেন!

এক বৃদ্ধ কোরায়শ বর্ণনা করেন ঃ অভিশপ্ত ইবনে মুলজেম হযরত আলী (রাঃ)-কে আহত করলে তিনি বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

মোহাম্মদ ইবনে আলী বলেন ঃ আমার পিতা আহত হওয়ার পর নিজের পুত্রদেরকে ওসিয়ত করলেন। এরপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু বলেননি।

জীবন সায়াহ্নে খলীফা ও আমীরগণের উক্তি ঃ হযরত আমীর মোয়াবিয়ার (রাঃ) মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিল। তিনি তাসবীহ ও যিকির শুরু করলেন। অতঃপর কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ হে মোয়াবিয়া! বার্ধক্য ও ভগ্নদশায় বুঝি আল্লাহ তা'আলার যিকিরের কথা মনে পড়েছে? এর সময় তো তখন ছিল, যখন যৌবনের শাখা সজীব ছিল। একথা বলে তিনি প্রচুর কাঁদলেন। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে তিনি বললেন ঃ ইলাহী! এই কঠোরপ্রাণ বৃদ্ধের প্রতি রহম কর। এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর। নিজের সহনশীলতার মাধ্যমে এই ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে নাও, যে তোমাকে ছাড়া কারও কাছে আশা করে না এবং কারও উপর ভরসা করে না।

বর্ণিত আছে, আমীর মোয়াবিয়ার সর্বশেষ খোতবা ছিল এই ঃ লোক সকল! মানুষ যে ফসল বপন করে, তাই কাটে। আমি তোমাদের শাসক

ছিলাম। আমার পরে যে শাসক আসবে, সে আমার চেয়ে খারাপই হবে; যেমন আমার পূর্ববর্তী শাসক আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। হে এয়াযীদ! আমার মৃত্যু হয়ে গেলে কোন বুদ্ধিমান ও সুধী ব্যক্তি দ্বারা আমার গোসল দেবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। তাকে বলবে যেন উত্তমরূপে গোসল দেয় এবং আল্লাহু আকবার সজোরে বলে। এরপর ধনভাণ্ডারে দেখবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কিছু বস্ত্র এবং তাঁর কেশ ও নখের কিছু কিছু ক্ষুদ্রাংশ একটি রোমালে বাঁধা আছে। ক্ষুদ্রাংশগুলো নিয়ে আমার নাকে, মুখে, কানে ও চোখে স্থাপন করবে। আর বস্ত্রকে কাফনের ভেতরে আমার উপর রেখে দেবে। কাফন পরিয়ে কবরে রেখে দেয়ার পর তোমরা মোয়াবিয়া ও আরহামুর রাহিমীনকে একাকী ছেড়ে দিয়ো।

মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর বলেন, অন্তিম মুহূর্তে আমীর মোয়াবিয়া বলতে লাগলেন ঃ চমৎকার হত যদি আমি কোরায়শের একজন অভুক্ত ব্যক্তি হতাম এবং খেলাফতের কোন কিছুর অধিকারী না হতাম।

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ওফাত নিকটবর্তী হলে সে জনৈক ধোপাকে দামেশকের আশে-পাশে কাঠে পিটিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতে দেখল। আবদুল মালেক বলল ঃ কি চমৎকার হত যদি আমি ধোপা হতাম! প্রত্যহ নিজের হাতের কামাই খেতাম! দরবেশ আবু হাযেম এ কথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হাজার শোকর, তিনি এই শাসকবর্গকে এমন বানিয়েছেন যে, মৃত্যুর সময় তারা আমাদের দরিদ্রাবস্থা কামনা করেন। কিন্তু আমাদের যখন মৃত্যু আসে, তখন আমরা তাদের অবস্থা কামনা করি না।

মৃত্যুর পূর্বে কেউ আবদুল মালেককে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ এমন পাচ্ছি, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছে এসেছ এক এক করে, যেমন আমি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি যে আসবাবপত্র দিয়েছিলাম, তা তোমরা পেছনে ছেড়ে এসেছ।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল

মালেক বলেন ঃ ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় দোয়া করতেন— ইলাহী! আমার মৃত্যুকে মানুষের কাছে প্রকাশ করো না তা এক মূহূর্তের জন্য হলেও । সেমতে যেদিন তাঁর ওফাত হয়, সেদিন আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলাম। তাঁর মধ্যে ও আমার মধ্যে একটি দরজার ব্যবধান ছিল। আমি শুনলাম, তিনি এ আয়াতখানি পাঠ করছেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ, সে পরকালীন গৃহ আমি তাদেরকে দেব, যা পৃথিবীতে আগ্রাসন চায় না এবং গোলযোগও চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যে।

এরপর তিনি চুপ করলেন। আমি কোন আওয়াজ ও সাড়া-শব্দ না পেয়ে এক গোলামকে পাঠালাম— দেখ, ঘুমাচ্ছেন কি না। সে কাছে গিয়েই চিৎকার করে উঠল। আমি দ্রুত ধাবিত হলাম। তিনি তখন আর বেঁচে নেই। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। ফলে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু প্রকাশ পেল না।

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ওফাতের পূর্বে কেউ তাঁর কাছে প্রার্থনা করল— আমীরুল মুমিনীন! কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার বর্তমান এ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করছি। একদিন তোমারও এ অবস্থাই হবে।

বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আযীয যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর জন্যে একজন চিকিৎসক ডাকা হল। সে অবস্থা দেখে বলল ঃ আপনাকে বিষ দেয়া হয়েছে। আপনি বিষের ক্রিয়া অনুভব করছেন কি? তিনি বললেন ঃ যখন বিষ আমার পেটে পড়েছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। চিকিৎসক বলল ঃ তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় আপনার প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ প্রাণ তো পরওয়ারদেগারের কাছেই যাবে। তাই যাওয়ার শ্রেষ্ঠতম জায়গা। আল্লাহ্র কসম, যদি আমি জানতে পারি যে, আমার রোগের প্রতিকার আমার কানের লতির কাছেই রয়েছে, তবু আমি হাত কান পর্যন্ত তুলে তা

গ্রহণ করব না। ইলাহী! ওমরের জন্যে তোমার সাক্ষাতে কল্যাণ রাখ। এর অল্প দিন পরেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

বর্ণিত আছে— ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি কাঁদলেন। এক ব্যক্তি আরয করল— আমীরুল মুমিনীন! কান্নার কারণ কি? আপনার জন্যে সুসংবাদ— আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়ে অনেক সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কেঁদে কেঁদেই বললেন ঃ আমাকে কি হাশরের ময়দানে দাঁড় করানো হবে না? জনগণের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না? আল্লাহর কসম, যদি আমি কেবল ন্যায়বিচারই করতাম, তবু আল্লাহ্ তা'আলার শিখিয়ে দেয়া ছাড়া তাঁর সামনে আমার যুক্তি সম্পন্ন করতে পারতাম না। আর যে ক্ষেত্রে অনেক ন্যায়বিচার বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে ভয় না করে উপায় আছে কি? একথা বলে তিনি অনেক কাঁদলেন এবং এরপর অল্প দিনই জীবিত থাকেন।

বর্ণিত আছে— অন্তিম সময়ে তিনি বললেন ঃ আমাকে বসিয়ে দাও। বসিয়ে দেয়ার পর তিনি বললেন ঃ ইলাহী! তুমি আদেশ করেছ, আমি তা পালনে ক্রুটি করেছি। তুমি নিষেধ করেছ, আমি মান্য করিনি। একথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন ঃ কিন্তু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, তাওহীদে আমি কোন ক্রুটি করিনি। অতঃপর তিনি মাথা তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন ঃ আমি কিছু লোককে উপস্থিত দেখছি। তারা না মানুষ, না জিন। এরপরই তাঁর ওফাত হয়ে গেল।

খলীফা হারুনুর রশীদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মৃত্যুর সময় নিজের কাফন নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। সে কাফনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন—

مَاۤ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ -

অর্থাৎ, আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসেনি। আমার সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে গেছে।

মু'তাসিম বিল্লাহ্ মৃত্যুর সময় বললেন— যদি আমি জানতাম, আমার জীবন সামান্য, তবে যা করেছি তা করতাম না।

মুনতাসির মৃত্যুর সময় খুবই অস্থির ছিলেন। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ আপনার কোন ভয় নেই। পেরেশান হবেন না। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার এতটুকুই যে, দুনিয়া গত হয়েছে এবং আখেরাত এসে গেছে।

আমর ইবনে আছেরের কাছে ধন-সম্পদের কয়েকটি সিন্দুক ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি এগুলো দেখে পুত্রদেরকে বললেন ঃ এগুলো কে নেবে? হায়, এগুলোতে যদি ছাগলের বিষ্ঠা থাকত!

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মৃত্যুর সময় বলল ঃ ইলাহী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। লোকেরা বলে তুমি নাকি ক্ষমা করবে না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয হাজ্জাজের বক্তৃতায় মুগ্ধ হতেন এবং তার প্রতি ঈর্ষা করতেন। হযরত হাসান বসরীকে হাজ্জাজের এই দোয়ার কথা বলা হলে তিনি বললেন ঃ হাজ্জাজ এ কথাটি সরলভাবেই বলেছিল কি? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করলে আশ্চর্যের কিছু হবে না।

হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ ইলাহী! আমি তোমাকে ভয় করি এবং তোমার কাছে আশা করি। ইলাহী, তুমি জান আমি খাল খনন ও বৃক্ষ রোপণের জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাকে পছন্দ করতাম না; বরং গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসার্ত থাকা, কালের বিপদাপদ সহ্য করা এবং যিকিরের মজলিসে নতজানু হয়ে বসার জন্যে পছন্দ করতাম। তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে যখনই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত, তিনি চোখ খুলে বলতেন— ইলাহী! তুমি যত ইচ্ছা আমার গলা চেপে ধর। তোমার ইযযতের কসম, আমার অন্তর তোমাকে মহব্বত করে।

মৃত্যুর পূর্বে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি দুনিয়ার মহব্বতে অস্থির হয়ে কাঁদছি না; বরং আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, দুনিয়াতে আমাদের পাথেয় ততটুকুই হওয়া উচিত, যতটুকু মুসাফিরের হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যখন ওফাত হল, তখন তিনি যা কিছু ছেড়ে যান, তার মূল্য দশ দেরহামের কিছু বেশী। অর্থাৎ, চার টাকার কাছাকাছি ছিল।

হযরত বেলালের কানে যখন মৃত্যুর আযান পৌঁছল, তখন তাঁর স্ত্রী ব্যথিত স্বরে বলল ঃ হায়, কি দুঃখ! তিনি বললেন ঃ না বরং কি আনন্দ! কেননা, আগামী কাল আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর দলের সাথে মিলিত হব।

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রহঃ) মৃত্যুর সময় চোখ খুলে হেসে উঠেন এবং বলেন ঃ

لمثل هذا فليعمل العاملون -

অর্থাৎ, এরই জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত।

হযরত ইবরাহীম নখঈ মৃত্যু নিকটবর্তী হলে কাঁদতে থাকেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার দূতের অপেক্ষায় আছি। দেখি, সে আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, না দোযখের?

আমর ইবনে আবদুল কায়েস ওফাতের পূর্বে এমনি প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ আমি না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদি, না দুনিয়ার লোভে কাঁদি; বরং দুপুরের পিপাসা এবং শীতের রাতের জাগরণ ফওত হয়ে যাবে বলে কাঁদছি।

হযরত ফুযায়ল (রহঃ) ওফাতের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর চক্ষু খুলে বললেন ঃ আফসোস, এত দীর্ঘ সফর আর এত অল্প পাথেয়!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি গোলাম নসরকে বললেন ঃ আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। নসর কাঁদতে লাগল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ আমার মনে পড়ছে। এখন আপনি ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন! তিনি বললেন ঃ চুপ কর। আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলাম তিনি যেন আমাকে বিত্তবানদের মত জীবন দেন এবং ফকীর ও নিঃস্বদের মত মরণ দেন। আমার সামনে কালেমা পাঠ করবে। যে পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে অন্য কথা বের না হয়, দ্বিতীয় বার কালেমা পড়বে না।

জারীরী বলেন ঃ হযরত জুনায়দের মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার ও নববর্ষ। তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন এবং তদবস্থায়ই কোরআন খতম করে নেন। আমি আরয করলাম ঃ এই সংকট মুহূর্তে আপনি কোরআন খতম করলেন? তিনি বললেন ঃ আমার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার অধিকার আমারই বেশী। এখন আমার আমলনামা বন্ধ হওয়ার সময়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ নমশাদ দাইনুরীর খেদমতে ছিলাম। এমন সময় এক ফকীর এসে আসসালামু আলাইকুম বলে জিজ্ঞেস করল ঃ এখানে কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা আছে কি? যেখানে মানুষ মরতে পারে? লোকেরা তাকে পানির কাছাকাছি একটি জায়গা দেখিয়ে দিল। ফকীর

নতুন উযু করে কয়েক রাকআত নামায পড়ল। অতঃপর সে জায়গায় গেল এবং পা ছড়িয়ে মরে গেল।

হযরত জুনায়দকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলা হল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি বললেন ঃ আমি কি এটা ভুলে গেছি যে, স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

জাফর ইবনে নাসির হযরত শিবলী (রহঃ)-এর খাদেম বকরান দাইনুরীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মৃত্যুর সময় তুমি হযরত শিবলীর অবস্থা কেমন দেখেছ? বকরান বলল ঃ হযরত শিবলী আমাকে বললেন, আমার কাছে এক ব্যক্তির এক দেরহাম পাওনা ছিল, যা অন্যায়ভাবে আমার কাছে এসেছিল। যদিও আামি সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজারো দেরহাম দান করেছি, কিন্তু আমার অন্তরে এর চেয়ে বড় কোন বোঝা নেই। এরপর তিনি বললেন ঃ নামাযের জন্যে আমাকে উযু করিয়ে দাও। আমি উযু করালাম; কিন্তু দাড়িতে খেলাল করা ভুলে গেলাম। তখন তাঁর যবান বন্ধ ছিল। তিনি আমার হাত ধরে আপন দাড়িতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর ওফাত হয়ে গেল। বকরানের এ বর্ণনা শুনে জা'ফর কেঁদে বললেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল, জীবনের শেষ মুহূর্তেও যার একটি মোস্তাহাব কাযা হয়নি?

এগুলো হচ্ছে সাধক ও ওলীগণের অন্তিমকালীন অবস্থা ও উক্তি। তাঁদের অবস্থা যেমন বিভিন্ন ছিল, তেমনি উক্তিও বিভিন্ন। কারও উপর ভয় প্রবল ছিল এবং কারও উপর আশা। আবার কারও উপর প্রবল ছিল অনুরাগ ও মহব্বত। প্রত্যেকেই নিজের হাল অনুযায়ী কথাবার্তা বলেছেন। সুতরাং সকলের উক্তিই সঠিক ও যথার্থ।

জানাযা ও কবরস্তানে সাধকগণের উক্তি ঃ বুদ্ধিমানের জন্যে জানাযার মধ্যেও শিক্ষা ও হুশিয়ারি লাভ করার অনেক অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফেল, জানাযা দেখে তাদের অন্তরের কঠোরতা ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি পায় না। কারণ, তাদের ধারণা থাকে যে, তারা সর্বদা অন্যদের জানাযাই দেখবে। তারা একথা ভাবে না যে, তাদেরকেও একদিন খাটে বহন করা হবে। এটা তাদের নিছক একটি কুসংস্কার। তাদের চিন্তা করা উচিত, যত মানুষকে খাটে বহন করা হয়, তাদের সবাই এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তাদের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।

অতএব প্রত্যেকের উচিত, যখন জানাযা দেখে, তখন নিজেকে তার মধ্যে ধরে নেয়া। কেননা, অচিরেই তা হবে, হয় দ্বিতীয় দিন অথবা তৃতীয় দিন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন জানাযা দেখতেন, তখন বলতেন— চল, আমরাও তোমার পেছনে আসছি। মকহুল দামেশকী জানাযা দেখে বলতেন— তুমি সকালে যাচ্ছ, আমরা বিকালে যাব। ওসায়দ ইবনে হুযায়র বলেন— আমি যখনই কোন জানাযায় উপস্থিত হয়েছি, আমার মনে সর্বক্ষণ এ চিন্তাই ঘুরাফেরা করেছে যে, এ মৃতের সাথে কি আচরণ হবে এবং এর কি পরিণতি হবে?

মালেক ইবনে দীনারের ভাইয়ের ইন্তেকাল হলে তিনি জানাযার সাথে বের হয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন— আল্লাহর কসম, তোমার পরিণাম না জানা পর্যন্ত আমার চোখ ঠাণ্ডা হবে না। অবশ্য, একথা সারা জীবনেও জানা যাবে না।

আমাল বলেন ঃ আমরা জানাযায় উপস্থিত হতাম; কিন্তু একথা জানার উপায় থাকত না যে, সমবেদনা কার কাছে প্রকাশ করব। কেননা, সকলেই সমান দুঃখিত থাকত। ছাবেত বানানী বলেন ঃ আমরা জানাযায় উপস্থিত হয়ে মুখ ঢেকে ক্রন্দনকারীদের ছাড়া কাউকে দেখতাম না। মোটকথা, পূর্ববর্তীরা মৃত্যুকে এভাবে ভয় করত। কিন্তু আজকাল ব্যাপার উল্টে গেছে। এখন যারা জানাযার সাথে থাকে, তাদের অধিকাংশই হাসে, কৌতুক করে এবং মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তিরই কথাবার্তা বলে। মৃতের আত্মীয়রাও ভাবে, কিভাবে সম্পত্তির কিছু অংশ তারাও পাবে। কেউ চিন্তা করে না, তার জানাযা যখন বের হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কি হবে? তার দশা কি হবে? এই উদাসীনতার একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের কঠোরতা। অধিক গোনাহ করতে করতে আমাদের মন কঠোর হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহকে, কিয়ামতের দিনকে এবং আখেরাতের ভয়কে আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেন।

জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে মৃতের জন্যে কান্নাকাটি করা। কিন্তু জ্ঞানী হলে নিজের অবস্থার জন্যেও কাঁদা উচিত। কেননা, মৃতের জন্যে কান্নাকাটির তুলনায় নিজের অবস্থার জন্যে কান্নাকাটি করা অধিক সমীচীন। যয়তুন ব্যবসায়ী ইবরাহীম কিছু লোককে মৃতের

জন্যে কাঁদতে দেখে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ অবস্থার জন্যে কাঁদাকাটি কর, তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। কেননা, মৃত ব্যক্তি তিনটি ভয় অতিক্রম করে চলে গেছে। এক, সে মালাকুল মওতের আকৃতি দেখে নিয়েছে। দুই, সে মৃত্যুর তিক্ততা আস্বাদন করেছে। তিন, খাতেমার আশংকা থেকেও সে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এসব ভয় এখনও তোমাদের সম্মুখে রয়ে গেছে।

জানাযায় অংশগ্রহণের শিষ্টাচার ঃ জানযায় অংশ গ্রহণের শিষ্টাচার হচ্ছে হচ্ছে চিন্তা করা, গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া এবং বিনম্রভাবে জানাযার সামনে চলা। জানাযার আরও একটি শিষ্টাচার হচ্ছে মৃতের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, যদিও সে পাপাচারী ও ফাসেক হয়ে থাকে এবং নিজের প্রতি কুধারণা রাখা যদিও বাহ্যত সাধু হয়। কেননা, খাতেমার অবস্থা বিপদসংকুল। তার স্বরূপ কারও জানা নেই। এ কারণেই আমর ইবনে যর থেকে বর্ণিত আছে যে, তার জনৈক পাপাচারী প্রতিবেশী মারা গেলে অনেকেই তার জানাযায় যেতে রাযী হল না। কিন্তু আমর ইবনে যর গেলেন এবং জানাযার নামায পড়লেন। মৃতকে কবরে নামানো হলে তিনি কবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে অমুক! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি সারা জীবন তাওহীদের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং নিজের মাথা সেজদায় ভূলুণ্ঠিত করেছ। যারা বলে, তুমি গোনাহগার ও পাপাচারী, তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, আমাদের মধ্যে কে গোনাহগার ও পাপাচারী নয়?

বর্ণিত আছে, বসরার আশপাশে জনৈক নামকরা দুষ্কৃতকারী মারা গেলে তার স্ত্রী জানাযায় সাহায্য করার জন্যে কাউকে খুঁজে পেল না। কারণ, অধিক কুকর্মের কারণে কেউ তার ধারে-কাছে আসতে সম্মত হল না। সে মজুরী দিয়ে কিছু লোক এনে জানাযার ব্যবস্থা করল এবং নামাযের জায়গায় নিয়ে গেল। কিন্তু কেউ তার জানাযার নামায পড়ল না। অগত্যা সে মৃতকে দাফন করার জন্যে জঙ্গলে নিয়ে গেল। সেখান থেকে কাছেই এক পাহাড়ে একজন বড় দরবেশ বাস করতেন। মৃতের স্ত্রী দরবেশকে দেখল, যেন তিনি জানাযার অপেক্ষায়ই রয়েছেন। জানাযা পৌছে গেলে দরবেশ নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নামাযের জন্যে দরবেশ পাহাড় থেকে নেমেছেন - এ সংবাদ দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরবাসীরাও চলে এল এবং দরবেশের সাথে নামাযে শরীক হল। কিন্তু সবাই বিস্মিত

ছিল যে, দরবেশ কিরূপে এ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন! এ মর্মে দরবেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ আমাকে স্বপ্নে কেউ বলল, পাহাড় থেকে নেমে অমুক জায়গায় যাও। সেখানে তুমি একটি জানাযা পাবে, যার সাথে মৃতের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তার জানাযার নামায পড়। কারণ, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। এতে লোকদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। দরবেশ মৃতের স্ত্রীকে ডেকে এনে সেই ব্যক্তির অবস্থা ও অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বলল ঃ তার অভ্যাস ও চরিত্র সবারই জানা। সারাদিন পানশালায় পড়ে থেকে মদ্যপান করত। দরবেশ বললেন ঃ চিন্তা করে বল, তার কোন সৎকর্মও তোমার মনে পড়ে কি না। সে বলল ঃ হ্যাঁ, তিনটি বিষয় ছিল। এক, প্রত্যহ সকালে যখন নেশার ঘোর কেটে যেত, তখন পোশাক বদলিয়ে উযু করত এবং ফজরের নামায জামাআতে আদায় করত। এরপর পানশালায় পৌছে কুকর্মে লিপ্ত হত। দুই, কখনও তার ঘর এতীম-শূন্য থাকত না; দু'একজন এতীম সর্বদাই থাকত। তাদের সাথে সে আপন সন্তানের চেয়েও বেশী সদ্ব্যবহার করত। তাদের খোঁজখবর নিত। তিন, রাতে যখন তার নেশা কিছুটা প্রশমিত হত, তখন অন্ধকার রাতে কান্নাকাটি করে বলত ঃ ইলাহী, তুমি তোমার দোযখের কোন্ অংশটি এই নাপাক অধম দ্বারা পূর্ণ করতে চাও? একথা শুনে দরবেশের সন্দেহ দূর হল এবং তিনি আপন নিবাসে ফিরে গেলেন।

কবরের অবস্থা সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি ঃ যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ সর্বাধিক দরবেশ (দুনিয়াত্যাগী) কে? তিনি বললেন ঃ যে কবরকে এবং নিজের গলে যাওয়াকে বিস্মৃত হয় না। অধিক পার্থিব সাজসজ্জা বর্জন করে। অক্ষয় বস্তুকে ধ্বংসশীল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়। আগামী কালকে নিজের জীবনের মধ্যে গণ্য করে না। নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণনা করে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কবরস্তানে বসে থাকেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কবরবাসীদেরকে উত্তম প্রতিবেশী পেয়েছি এবং আমি তাদেরকে প্রতিবেশী বলে বিশ্বাস করি। কারণ, তারা মুখ বন্ধ রাখে এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مارأيت منظرا الا والقبراقطع منه

অর্থাৎ, আমি কবরের মত এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমরা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে কবরস্তানে গেলাম। তিনি একটি কবরের কাছে বসে কাঁদলেন। আমি অন্যদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। আমিও তাঁর দেখাদেখি কাঁদতে লাগলাম। অন্যরাও কাঁদল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা আরয করলাম ঃ আপনার কান্নার কারণে আমরা কাঁদছি। তিনি বললেন ঃ এ কবরটি আমার মা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর তাঁর মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করার অনুমতি চাইলে তা নামনযুর করা হল। মায়ের জন্যে সন্তানের মন যেমন নরম হয়, আমার মনও তেমনি নরম হয়েছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন কান্নার আতিশয্যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— কবর আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল। মৃত ব্যক্তি এ মনযিলটি নিরাপদে পার হয়ে গেলে অন্যান্য মনযিল তার জন্যে সহজ হয়। পক্ষান্তরে এখানে নাজাত না পেলে অন্যান্য মনযিল আরও সুকঠিন হয়ে যায়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, আমর ইবনুল আস (রাঃ) চলার পথে একটি কবরস্তান দেখে নেমে পড়লেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। সহচররা বলল ঃ আজ আপনি এমন করলেন, যা এর আগে কখনও করেননি। এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি কবরবাসীদেরকে এবং তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে অন্তরায়ের বিষয়টিকে মনে করে দু'রাকআত নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ উত্তম মনে করেছি।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায়ই কবরস্তানে বসে থাকতেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ঃ আমি এমন লোকদের মধ্যে বসি, যারা আমাকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে গেলে আমার গীবত করে না।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) রাতের বেলায় কবরস্তানে যেতেন এবং কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ হে কবরবাসীগণ, তোমাদের কি হল যে, আমি ডাকলে তোমরা সাড়া দাও না? এরপর বলতেন ঃ হ্যাঁ, তাদের সাড়া দেয়ার পথে একটি অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমিও যেন তাদেরই মত একজন। এরপর তিনি নামাযে মনোনিবেশ করতেন এবং ফজর পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) জনৈক সহচরকে বললেন ঃ আমি রাত জেগে কবর ও কবরবাসীদের অবস্থা চিন্তা করেছি। তুমি যদি মৃত্যুর তিন দিন পর মৃতের অবস্থা দেখ, তবে তার কাছেই থাকবে না যদিও পূর্বে তার সাথে তোমার অসাধারণ প্রেম ও ভালবাসা থাকে। কারণ, তুমি কবরে দেখবে অসংখ্য কীট দৌড়াদৌড়ি করছে, পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, মৃতের বর্ণ ও গন্ধ বিগড়ে গেছে, কীটেরা কিলবিল করে দেহকে খেয়ে যাচ্ছে এবং কাফন মলিন হয়ে গেছে। একথা বলে তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

হাতেম আসাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরস্তানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের অবস্থা চিন্তা করে না এবং মৃতদের জন্যে দোয়া করে না, সে নিজের এবং মৃতদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রবী' ইবনে খায়ছাম নিজের ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন। তিনি যখনই অন্তরের কঠোরতা অনুভব করতেন, তখনই কবরে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন। এরপর বলতেন—

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ -

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে কিছু ভাল কাজ করতে পারি।

এ আয়াতটি কয়েক বার আবৃত্তি করতেন। অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন - হে রবী', এখন তো তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার আমল কর।

মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন ঃ আমি একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে কবরস্তানে গেলাম। তিনি কবরগুলোকে দেখে কাঁদলেন। অতঃপর আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে মায়মুন, এগুলো আমার বাপ-দাদা অর্থাৎ উমাইয়া বংশীয় শাসকগণের কবর। তারা যেন দুনিয়াবাসীদের সাথে তাদের আনন্দ-উল্লাসে কখনও শরীকই ছিলেন না। দেখ, কেমন বিচ্ছিন্ন পড়ে আছেন । তাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের দেহে সরীসৃপ বাসা নির্মাণ করেছে। অতঃপর তিনি কেঁদে বললেন ঃ আমার মনে হয়, তাদের কেউ আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পায়নি।

ছাবেত বানানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার এক কবরস্তানে গেলাম। যখন সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলাম, তখন কাউকে বলতে শুনলাম

ঃ হে ছাবেত, কবরবাসীদের নীরবতা দেখে ধোকা খেয়ো না । তাদের মধ্যে অনেকেই শোকার্ত।

আবু মূসা তামীমী (রহঃ) বলেন ঃ কবি ফারাযদাকের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জানাযার সাথে বসরার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি রওয়ানা হলেন। তাদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)ও ছিলেন। তিনি ফারাযদাককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি সে দিনের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছেন? সে বলল ঃ ষাট বছর ধরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তা সেদিনের জন্যেই।

সন্তান-সন্ততির ওফাত সম্পর্কে কথিত উক্তি ঃ যার পুত্র মারা যায়, সে একে মনে করবে, সে এবং তার পুত্র উভয়েই সফরে ছিল। তাদের গন্তব্যস্থল ছিল একটি শহর, যা সকলেরই প্রকৃত বাসস্থান। কিন্তু পুত্র সে বাসস্থানে প্রথমে চলে গেছে এবং সে-ও অচিরেই তার সাথে মিলিত হবে। এরূপ চিন্তা করলে বেশী অনুতাপ হবে না। কারণ, সে জানতে পারবে সে-ও কিছুদিনের মধ্যেই পুত্রের সাথে মিলিত হবে। এতে দুঃখ ও বেদনা কম হবে; বিশেষত তখন, যখন পুত্রের মৃত্যুর কারণে অপরিসীম ছওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— যদি আমি গর্ভপাতের সন্তান আগে পাঠিয়ে দেই, তবে সেটা আমার জন্যে একশ' অশ্বারোহী পিছনে ছেড়ে যাওয়ার চাইতে উত্তম, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে। নিম্নস্তর ও উচ্চস্তর বুঝানোর জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্ভপাতের সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় সওয়াব সে পরিমাণেই হয়, সন্তানের প্রতি অন্তরে যে পরিমাণ টান থাকে। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ হযরত দাঊদ (আঃ)-এর এক পুত্র মারা গেলে তিনি তার জন্যে অত্যধিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, পুত্রের কদর আপনার কাছে কতটুকু ছিল? তিনি বললেন ঃ ভূ-পৃষ্ঠের সমান। অতঃপর তাকে বলা হল ঃ আখেরাতে আপনি ছওয়াবও এতটুকুই পাবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যদি কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে তাদের জন্যে সবর করে ছওয়াব প্রার্থী হয়, তবে সন্তানরা তার জন্যে দোযখ থেকে রক্ষার ঢাল হয়ে যাবে। কোন এক মহিলা আরয করল ঃ দু'জন মারা গেলেও কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দু'সন্তান মারা গেলেও।

পিতার উচিত মৃত্যুর সময় সন্তানের জন্যে দোয়া করা। কেননা, তার দোয়া অধিক আশাপ্রদ এবং কবুল হওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান নিজের পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে এরূপ দোয়া করেন— ইলাহী, আজ আমি তোমার কাছে তার জন্যে কল্যাণ আশা করি এবং তার

সম্পর্কে তোমাকে ভয় করি। অতএব, আমার আশা পূর্ণ কর এবং ভয় দূর কর।

আবু সিনান (রহঃ) তাঁর পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে এরূপ দোয়া করেন— এলাহী, আমার যে হক তার উপর ছিল, তা আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতএব, তোমার যে হক তার উপর ওয়াজেব ছিল, তা তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমি সর্বাধিক দাতা ও দয়ালু।

এক বেদুঈন তার পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইলাহী, সে আমার সাথে সদ্ব্যবহারে যে সকল ত্রুটি করেছে, তা আমি তাকে ক্ষমা করলাম। এখন তোমার আনুগত্যে সে যে সকল ত্রুটি করেছে, সেগুলো তুমি মার্জনা কর।

যুর ইবনে ওমরের ওফাত হলে তার পিতা ওমর পুত্রকে কবরে রাখার পর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে যুর, তোমার ব্যাপারে আমি এত বেশী শংকিত যে, তোমার জন্যে দুঃখ করাও ভুলে গেছি। জানি না, তোমাকে কি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তুমি কি জওয়াব দিয়েছ। অতঃপর বললেন ঃ ইলাহী, এ আমার পুত্র যুর। যতদিন তুমি ইচ্ছা করেছ, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছ। এখন তার আয়ু ও রূযী সমাপ্ত হয়েছে এবং তুমি তার প্রতি যুলুম করনি। ইলাহী, তুমি তার উপর তোমার ও আমার আনুগত্য অপরিহার্য করেছিলে। এ বিপদে সবর করার যে ছওয়াব তুমি আমাকে দিয়েছ, তা আমি তাকে দান করলাম। অতএব, তুমি তার আযাব আমাকে দিয়ে ফেল। তাকে আযাব দিয়ো না। একথা শুনে সকলেই কেঁদে ফেলল।

এক ব্যক্তি বসরায় এক মহিলাকে দেখে বলল ঃ এমন সজীবতা আমি কখনও দেখিনি। এর কারণ মনে হয়, তার দুঃখ কম। মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমি এমন দুঃখে জর্জরিত যাতে আমার কোন অংশীদার নেই। লোকটি বলল ঃ কিভাবে? মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী কোরবানীর ঈদের দিন একটি ছাগল যবেহ করেছিলেন। আমার ফুটফুটে ছেলে দু'টি অদূরেই খেলা করছিল। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বলল ঃ তুমি কি দেখতে চাও আমাদের পিতা কিভাবে ছাগল যবেহ করেছেন? সে বলল ঃ হাঁ। এরপর বড় ছেলে ছোট ছেলেকে ধরে যবেহ করে ফেলল। আমরা যখন খবর পেলাম, তখন ছেলে রক্তের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে বড় ছেলে দৌড়ে এক পাহাড়ে আত্মগোপন করতে চাইল। সেখানে ছিল এক বাঘ। সে ছেলেকে খেয়ে ফেলল। তার পিতা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে ভীষণ গরমে পিপাসায় কাতর হয়ে মারা গেল। এখন কালচক্র আমাকে একাই রেখে দিয়েছে।

মোটকথা, সন্তান মারা যাওয়ার সময় এ ধরনের বিপদাপদ স্মরণ করলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কেননা, এমন কোন বিপদ নেই, যার চেয়ে বড় বিপদ কল্পনা করা যায় না এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় যা দূর করেন না। অতএব হা-হুতাশ করা কিছুতেই উচিত নয়।

কবর যিয়ারত ঃ মৃত্যুকে স্মরণ ও শিক্ষা অর্জনের জন্যে যে কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। আর ওলী-আল্লাহগণের কবর যিয়ারত করা বরকত হাসিলের জন্যেও মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে এর অনুমতি দিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত কর। এটা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু সাবধান, কোন অযথা কথা সেখানে বলবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাজার সশস্ত্র ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে নিজের জননীর কবর যিয়ারত করেছেন। সেদিন যত মানুষকে কাঁদতে দেখা গেছে, এর চেয়ে বেশী কখনও দেখা যায়নি। সেদিনই তিনি এরশাদ করেন— আমি কেবল যিয়ারত করার অনুমতি পেয়েছি— মাগফেরাতের দোয়া করার নয়। ইবনে আবী মুশায়কা (রহঃ) বলেন ঃ একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কবরস্তান থেকে ফিরে এলে আমি আরয করলাম ঃ আপনি কোত্থেকে এলেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভাই আবদুর রহমানের কবর থেকে। আমি আরয করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রথম দিকে নিষেধ করেছিলেন, এরপর অনুমতি দিয়েছেন।

এই রেওয়ায়েত দৃষ্টে মহিলাদেরকে কবরস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। কেননা, তারা কবরস্তানে গিয়ে অনেক অশোভন কথাবার্তা বলে ফেলে। ফলে, কবর যিয়ারতে যে ছওয়াব হয়, গোনাহ তার চেয়ে বেশী হয়। এ ছাড়া পথে পর্দার খেলাফ করা এবং বেগানা পুরুষদের সামনে সাজসজ্জাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এগুলো কবীরা গোনাহ। আর কবর যিয়ারত করা কেবল সুন্নত। অতএব, সুন্নত আদায় করার জন্য এমন গোনাহ করা কিরূপে বৈধ হবে? অবশ্য যদি মহিলারা ছেঁড়া ও জীর্ণ বস্ত্র পরে বের হয় এবং কবরে গিয়ে দোয়া ছাড়া অন্য কিছু না বলে, তবে কোন দোষ নেই।

হযরত আবু যর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কবর যিয়ারতের মাধ্যমে তোমরা আখেরাতকে স্মরণ কর এবং মৃতদেরকে গোসল দাও। কেননা, আত্মাহীন শরীরের তদবীর করা একটি বড় উপদেশ।

আর জানাযার নামায পড়। এতে আশা করা যায়, দুঃখ অর্জিত হবে। দুঃখিত মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার ছায়ায় থাকে।

ইবনে আবী মুশায়কার রেওয়ায়েতে আছে— মৃতদের যিয়ারত কর, তাদেরকে সালাম কর এবং তাদের জন্যে দোয়া কর। এতে তোমাদের শিক্ষা অর্জিত হবে।

হযরত নাফে' বর্ণনা করেন— হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যে কবরের কাছ দিয়ে গমন করতেন, সেখানে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন— হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ) তাঁর পিতৃব্য হযরত হামযার কবর যিয়ারতের জন্যে কয়েক দিন পরপর গমন করতেন, কবরের কাছে নামায পড়তেন ও কাঁদতেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি প্রতি জুমআর দিনে নিজের পিতার অথবা যে কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করে, তার গোনাহ মার্জনা করা হয় এবং ছওয়াব লেখা হয়।

হযরত ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য কোন ব্যক্তি যদি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্যে দোয়া করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এক হাদীসে আছে— من زار قبرى وجبت له شفاعتى

অর্থাৎ, যে আমার কবর যিয়ারত করে, আমার শাফায়াত তার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে।

হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) বলেন ঃ যখন ফজর উদিত হয়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কবর শরীফকে আচ্ছন্ন করে নেয় এবং পাখা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে। সন্ধ্যা হলে এসব ফেরেশতা আকাশে চলে যায় এবং এ পরিমাণ অন্য ফেরেশতা নেমে আসে। তারাও তাই করে, যা পূর্ববর্তীরা করেছিল। এ ধারা ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্থিত হবেন এবং তাঁর সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর তাযীম করতে থাকবে।

কবর যিয়ারতে মুস্তাহাব হল, কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃতের প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো এবং মৃতের উদ্দেশে সালাম করা। কবরকে না মোছা, হাত না লাগানো এবং চুম্বন না করা। এসব কাজ খৃষ্টানদের রীতি। হযরত

নাফে' বলেন ঃ আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে একশ' বার বরং আরও বেশী বার দেখেছি, তিনি পবিত্র রওযার কাছে এসে বলতেন— সালাম নবী (আঃ)-এর প্রতি সালাম, আবু বকরের প্রতি সালাম এবং আমার পিতার প্রতি সালাম। এরপর তিনি ফিরে আসতেন।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন ঃ আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে দেখেছি— তিনি কবর শরীফের কাছে এলেন, দাঁড়ালেন এবং উভয় হাত উপরে তুললেন। এমনকি, আমার ধারণা হল তিনি নামাযের জন্যে আল্লাহু আকবার বললেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সালাম বলে ফিরে গেলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে, তার কাছ থেকে সে (মৃত ভাই) প্রীতি অর্জন করে যে পর্যন্ত সে সেখানে বসে থাকে এবং তার সালামের জওয়াব দেয়।

সোলায়মান ইবনে সহীম (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরয করলাম— ইয়া রসূলাল্লাহ, মানুষ আপনার কাছে উপস্থিত হয় এবং আপনার প্রতি সালাম করে। আপনি তাদের সালাম বুঝেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, বুঝি এবং তাদের সালামের জওয়াব দেই।

আসেম হজদরীর বংশধরদের একজন বললেন ঃ মৃত্যুর দু'বছর পর আমি আসেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি তো মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি বললেন ঃ আমরা জান্নাতের একটি বাগানে থাকি। আমরা আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ প্রতি জুমআর রাতে ও ভোরে আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযনী (রহঃ)-এর কাছে সমবেত হয়ে তোমাদের খবরাখবর শুনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনাদের দেহ একত্রিত হয়, না রূহ? তিনি বললেন ঃ দেহের নয়— আত্মার মোলাকাত হয়। আমি বললাম ঃ আমাদের যিয়ারত সম্পর্কে আপনারা অবগত হন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, জুমআর রাতে পরবর্তী দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমাদের যিয়ারতের খবর পাই। আমি বললাম ঃ অন্য দিনগুলোতে খবর পান না কেন? তিনি বললেন ঃ জুমআর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এতে অবগতি হয়।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে জুমআর দিন কবর যিয়ারত করতেন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি রবিবার পর্যন্ত যিয়ারত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি মৃতরা তাদের যিয়ারতকারীদেরকে জুমআর দিন, তার একদিন আগে এবং একদিন পরে পর্যন্ত চিনতে পারে।

বাশশার ইবনে গালেব নাজরানী বলেন ঃ আমি রাবেআ বসরীয়ার জন্যে অনেক দোয়া করতাম। এক রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ হে বাশশার, তোমার উপঢৌকন আমার কাছে উপর্যুপরি নূরের আলোয় রেশমী রুমালে বাঁধা অবস্থায় আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এগুলো এভাবে আসে কেন? তিনি বললেন ঃ যে মুসলমান মৃত বন্ধু-বান্ধবের জন্যে দোয়া করে এবং দোয়া কবুল হয়ে যায়, তার দোয়া এমনিভাবে নূরের আলোয় রেখে রেশমী রুমাল দিয়ে বেঁধে মৃতকে দিয়ে বলা হয়, এটা তোমার জন্যে অমুকের উপঢৌকন।

হাদীস শরীফে আছে— মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ফরিয়াদকারীর অনুরূপ। সে পিতা, ভাই অথবা বন্ধুর পক্ষ থেকে দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন কারও পক্ষ থেকে দোয়া পৌঁছে, তখন এটা তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়।

কবরের কাছে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মরুযী বলেন ঃ আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি— যখন তুমি কবরস্তানে যাবে, তখন সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা এখলাস পাঠ করে তার ছওয়াব কবরবাসীদেরকে বখশে দেবে। তারা তা পেয়ে যাবে। সুতরাং যিয়ারতকারী নিজের জন্যে এবং মৃতের জন্যে দোয়া করার ব্যাপারে গাফেল হবে না।

মৃত্যুর স্বরূপ ঃ মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নানা রকম ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণা প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কোন কোন লোক মনে করে মৃত্যু হচ্ছে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। এর সাথে না হাশর আছে, না পুনরুত্থান এবং না ভাল-মন্দ পরিণাম। মানুষের মৃত্যু জন্তু-জানোয়ার ও ঘাসের মৃত্যুর মতই। এ মত তাদের, যারা মুলহিদ তথা ধর্মদ্রোহী এবং আল্লাহ ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। কারও কারও ধারণা, মৃত্যুর কারণে মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়; কিন্তু কবর থেকে হাশর পর্যন্ত না কোন আযাবের কষ্ট অনুভব করে, না ছওয়াবের সুখ। কেউ কেউ বলে আত্মা অবশিষ্ট থাকে— মৃত্যুর কারণে অস্তিত্বহীন হয় না এবং ছওয়াব ও আযাব হয় আত্মার— দেহের নয়। দেহ কখনও উত্থিত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হবে না। এ সমস্ত উক্তি সত্যবিমুখ ও ভ্রান্ত। কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মৃত্যু কেবল অবস্থা পরিবর্তনের নাম। আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হয় আযাবে থাকে, না হয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে থাকে। দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ দেহের উপর তার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাওয়া এবং দেহ তার আনুগত্য থেকে

মুক্ত হয়ে যাওয়া। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আত্মার হাতিয়ার। আত্মা এগুলোকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। উদাহরণতঃ হাত দ্বারা সে ধরে, কান দ্বারা শুনে এবং চোখের দ্বারা দেখে। কিন্তু বস্তুনিচয়ের স্বরূপ আত্মা নিজেই জেনে নেয়। এজন্যে কোন হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে বিভিন্ন দুঃখজনক ঘটনায় সে নিজেই দুঃখ পায় এবং সুখের ঘটনায় নিজেই সুখ অনুভব করে। এ ধরনের যেসকল বিষয়ের সাথে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক নেই, সেগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও আত্মার সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। আর আত্মা যেসকল বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অর্জন করে, সেগুলো দেহ মরে যাওয়ার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি, কবরে আত্মার পুনরায় দেহের মধ্যে আগমন এবং এ আগমন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

মৃত্যুর কারণে দেহের বেকার হয়ে যাওয়া অর্ধাঙ্গ রোগীর অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া এবং তাতে আত্মার নিষ্ক্রিয়তার অনুরূপ। এমতাবস্থায় আত্মার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে এবং সে কোন কোন অঙ্গকে কাজে লাগায় ও কোন কোন অঙ্গ অবাধ্য হয়ে যায়। মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, সকল অঙ্গের নাফরমান হয়ে যাওয়া। এভাবে মৃত্যুর কারণে দেহের উপর আত্মার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায় এবং তার জ্ঞান, চেতনা, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ ইত্যাদি অব্যাহত থাকে।

মৃত্যুর কারণে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন দু'ভাবে হয়ে থাকে। এক, মানুষ তথা আত্মার কাছ থেকে চোখ-কান-হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পরিবার, স্ত্রী-পুত্র, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়া। মানুষের কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেয়া অথবা মানুষকে এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া— এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কেননা, যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হচ্ছে বিচ্ছেদ। উভয় অবস্থায় এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সমান। কখনও মানুষের ধন-সম্পদ লুটে নেয়া হয় এবং কখনও ধন-সম্পদ ঠিক জায়গায় থাকে, কিন্তু তার মালিককেই বন্দী করে নেয়া হয়। উভয় অবস্থায় যন্ত্রণা একই রূপ থাকে। মৃত্যুও তাই; অর্থাৎ মানুষকে তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও বিষয়-আশয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা এ জগতের অনুরূপ নয়। সুতরাং এ জগতে তার কোন সখের বস্তু থেকে থাকলে মৃত্যুর পর তার বিরহে সে নেহায়েত কষ্ট ভোগ করবে। পরজগতে থেকে সে ইহজগতের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করবে। এমনকি,

ইহজগতে সে কোন জামা পরিধান করে আনন্দিত হয়ে থাকলে তা হাতছাড়া হওয়ার কষ্টও সে অনুভব করবে। আর যদি সে ইহজগতে কেবল আল্লাহর যিকিরেই তৃপ্তি পেত, তবে মৃত্যুর কারণে অত্যন্ত সুখ ও স্বস্তি পাবে। কেননা, তখন বাধাসমূহ অপসারিত হয়ে যাবে এবং প্রিয়জন ও নিজের মধ্যে কোন অন্তরায় থাকবে না।

দ্বিতীয় পরিবর্তন হল, মৃত্যুর কারণে মানুষের সামনে এমনসব বিষয় উদঘাটিত হয়ে পড়া, যা জীবদ্দশায় উদঘাটিত হত না। যেমন— জাগ্রত মানুষের সামনে সে সব অবস্থা ফুটে উঠে না, যা স্বপ্নে ফুটে উঠে। মানুষ মাত্রই ঘুমন্ত। যখন মরবে, তখনই জাগ্রত হবে।

মৃত্যুর পর মানুষের সামনে যে অবস্থাটি সর্বপ্রথম ফুটে উঠবে, তা হল তার সৎকর্মের লাভ ও অসৎকর্মের ক্ষতি। অথচ এ অবস্থাটি তার অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থিত খাতায় লিখিত ছিল। কিন্তু দুনিয়ার ঝামেলার কারণে এর খবর ছিল না। যখন দুনিয়ার ঝামেলা থাকল না, তখন সমস্ত আমল তার কাছে ফুটে উঠল। এখন সে নিজের কুকর্ম দেখে এত অনুতাপ করে যে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তখন তাকে বলা হয়—

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

অর্থাৎ— নিজের হিসাব নেয়ার জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি প্রয়োজন অনুপাতে দুনিয়া অন্বেষণ করে, মৃত্যুর পর তার কোন বিরহ-যন্ত্রণা হয় না; বরং সে মনযিলে পৌঁছে আনন্দিত হয়। কেননা, মনযিলে পৌঁছাই তার উদ্দেশ্য ছিল— পাথেয় উদ্দেশ্য ছিল না।

অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর কারণে আত্মা অস্তিত্বহীন হয় না এবং তার উপলব্ধিও বিলুপ্ত হয় না। আল্লাহ তা'আলা শহীদদের সম্পর্কে এরশাদ করেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ -

অর্থাৎ— যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদের পালনকর্তার কাছে রিযিকপ্রাপ্ত ও প্রফুল্ল।

বদর যুদ্ধে অনেক কোরায়শ সরদার নিহত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকেন এবং বলেন ঃ হে অমুক, হে অমুক, আমার পালনকর্তা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। তোমাদের সাথে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে ওয়াদা করেছিলেন, তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কিনা? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন? তারা শুনবে কি? তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, তারা আমার কথা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনে। কিন্তু জওয়াব দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এ হাদীসটি হতভাগ্য আত্মার কায়েম থাকা, তার উপলব্ধি ও মারেফত বহাল থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। পূর্বোক্ত আয়াতটি প্রমাণ ছিল শহীদদের আত্মার ব্যাপারে। বলা বাহুল্য, মৃত দু'ধরনের— হতভাগ্য ও ভাগ্যবান।

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ কবর জাহান্নামের একটি গহ্বর অথবা জান্নাতের একটি উদ্যান। মৃত্যুর অর্থ যে কেবল অবস্থার পরিবর্তন, এ হাদীসটি তার সুস্পষ্ট দলীল। এ থেকে আরও বুঝা যায়, মৃতের জন্যে যে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অবধারিত থাকে, তা মৃত্যুর পরেই অবিলম্বে শুরু হয়ে যায়। তবে কোন কোন রকম আযাব ও ছওয়াব পরে হবে। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الموت قيامة فمن مات فقد قامت قيامته

অর্থাৎ, মৃত্যু হল একটি কিয়ামত। যার মৃত্যু হয়, তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

এক হাদীসে আছে— যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার ঠিকানা সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে পেশ করা হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাতে এবং দোযখী হলে দোযখে তার ঠিকানা দেখানো হয় এবং বলা হয়, এটা তোমার ঠিকানা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এতেই পৌছাবেন। তখন এসব ঠিকানা দেখে যে আনন্দ বা কষ্ট হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি দোযখীদের, তা না জানা পর্যন্ত কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مـن مـات غـريـبـا مـات شـهـيـد اووقى فـتـانى الـقـبـر وغـدى وريـح

علـيـه رزتـه مـن الـجـنـة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। তাকে কবরের দু'ফেতনা সৃষ্টিকারী ফেরেশতা থেকে বাঁচানো হয় এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার রিযিক জান্নাত থেকে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-কে বললেন ঃ (তার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাই? জাবের বললেন ঃ খুব ভাল কথা! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করে নিজের সামনে বসিয়ে বলেছেন, হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা আমার কাছে আশা কর, আমি তোমাকে দেব। তোমার পিতা আরয করল ঃ এলাহী, আমি তোমার এবাদত যথার্থরূপে করিনি। আমি আশা করি, তুমি আবার আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও, যাতে তোমার রসূলের পতাকাতলে যুদ্ধ করি এবং পুনরায় তোমার পথে মারা যাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি দুনিয়াতে ফিরে যাবে না, এটা পূর্বেই আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ যে ব্যক্তি মারা যায়, সে তার বাড়ীতে যা কিছু হয় সবই জানে। এমনকি, যখন তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হল, সে তাও জানে। মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন— আমি শুনেছি, মুমিনদের রূহ মুক্ত বিহঙ্গের মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা মন্দ কর্মের দ্বারা তোমাদের মৃতদেরকে লজ্জিত করো না। কেননা, তোমাদের কুকর্ম তোমাদের মৃত বন্ধুদের সামনে পেশ করা হয়। একারণেই হযরত আবুদারদা দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন— ইলাহী, আমি তোমার কাছে এমন কর্ম থেকে আশ্রয় চাই, যার কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে লজ্জিত হব। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আবুদারদার মামা ছিলেন এবং তাঁর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ কোথায় থাকে? তিনি বললেন ঃ সাদা পাখির আকারে আরশের ছায়ায় থাকে। আর কাফেরদের রূহ ভূ-গর্ভের সপ্তম স্তরে থাকে।

ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন ঃ কবরবাসীরা খবরের অপেক্ষায় থাকে। কোন মৃত তাদের কাছে গেলে তারা বলে, অমুক ব্যক্তি কেমন? মৃত বলে, সে তো দুনিয়া থেকে চলে এসেছে। তোমাদের কাছে আসেনি? তারা বলে, না। এরপর বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাকে হয়তো অন্য কোন পথে নিয়ে গেছে। আমাদের কাছে আসেনি।

কবরের অবস্থা ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে বলে ঃ হে উজাড়-গৃহ ব্যক্তি, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে কিসে ধোকায় ফেলে রাখল? তুমি কি জান না, আমি পরীক্ষাগার, অন্ধকারের ঠিকানা, একাকীত্বের নিবাস এবং কীটের আবাসভূমি? আমার সম্পর্কে তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করেছিল যে, তুমি আমার উপর বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতে? মৃত সাধু ব্যক্তি হলে তার পক্ষ থেকে কেউ জওয়াব দেয়— হে কবর, তুমি দেখ না, এ ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ করত এবং অসৎ কাজে নিষেধ করত? কবর বলে— তাহলে এখন আমি তার জন্য সবুজ হয়ে যাব, তার দেহ নূর হয়ে যাবে এবং আত্মা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চলে যাবে।

এয়াযীদ রাক্কাসী বলেন ঃ আমি শুনেছি, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ তাকে বলেন ঃ হে গর্তে পতিত একাকী বান্দা, তোমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজন তোমার কাছ থেকে চলে গেছে। আমার কাছে আজ তোমার কোন সহচর নেই।

হযরত কা'বে আহবার বলেন ঃ যখন নেক বান্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জেহাদ ইত্যাদি সৎ কাজসমূহ এসে তাকে ঘিরে রাখে। আযাবের ফেরেশতা যখন তার পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে, দূরে থাক। এ ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে এ পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকত। এরপর ফেরেশতা মাথার দিক দিয়ে আসে। তখন রোযা বলে, এদিকে তোমার পথ নেই। এ ব্যক্তি দুনিয়াতে অনেক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকত। ফেরেশতা দেহের দিক দিয়ে আসতে চাইলে হজ্জ ও জেহাদ বলে, এদিক থেকে দূরে থাক। সে এ দেহ দিয়ে হজ্জের জন্য অনেক শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে। ফেরেশতা হাতের দিক দিয়ে আসতে চাইলে তার সদকা ও দান-খয়রাত বলে, এ নেক ব্যক্তিকে আযাব থেকে মুক্ত রাখ। সে এ হাত দিয়ে অনেক দান-খয়রাত করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবুল হয়েছে। অতএব, তুমি এদিক দিয়ে পথ পাবে না। তখন এই মৃতকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলা হয়— তুমি পবিত্র হয়েই জীবন যাপন করেছ এবং পবিত্র হয়েই

মৃত্যুবরণ করেছ। এরপর তার কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে এবং তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পাতে। তার জন্যে জান্নাতী পোশাক আনা হয় এবং যতদূর দৃষ্টি যায়, তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। জান্নাত থেকে একটি প্রদীপ এসে যায়, যার আলোকে সে পুনরুত্থান পর্যন্ত অবস্থান করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দ ইবনে ওমায়র এক জানাযার সাথে চলার সময় বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— মৃতকে কবরে বসানো হয় এবং সে জানাযায় উপস্থিত লোকদের পায়ের শব্দ শুনে। তখন কবর ছাড়া কেউ তার সাথে কথা বলে না। কবর বলে ঃ হে উজাড়-গৃহ ব্যক্তি, আমার সম্পর্কে কেউ কি তোমাকে সতর্ক করেনি? আমি যে সংকীর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, ভয়াবহ ও কীটে পরিপূর্ণ, একথা কি তোমাকে কেউ বলেনি? অতএব, তুমি আমার জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?

কবরের আযাব ও মুনকির-নকীরের সওয়াল ঃ হযরত বারা' ইবনে আযেব বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে জনৈক আনসারীর জানাযায় গেলাম। তিনি কবরের উপরে মাথা নীচু করে তিনবার বললেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যখন ঈমানদার আখেরাতে উপস্থিতির পর্যায়ে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা এমন ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে দেন, যাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মত উজ্জ্বল। তাদের সাথে ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে সুগন্ধি ও কাফন থাকে। তারা তার দৃষ্টির সামনে বসে। যখন তার রূহ নির্গত হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে যায়। প্রত্যেক দরজা চায়, মুমিনের রূহ তার ভিতর দিয়ে গমন করুক। মুমিনের রূহ যখন উপরে আরোহণ করে, তখন ফেরেশতারা আরয করে— ইলাহী, সে তোমার অমুক বান্দা। আদেশ হয়, তাকে নিয়ে যাও এবং তার সম্মানের জন্য আমি যা কিছু প্রস্তুত করেছি, তা তাকে দেখিয়ে দাও। কারণ, আমি ওয়াদা করেছি—

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى -

অর্থাৎ, এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এ মাটি থেকেই পুনরায় উত্থিত করব।।

এভাবে রূহ কবরে ফিরে আসে এবং সে প্রত্যাগত লোকদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে তাকে প্রশ্ন করা হয়— তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? মুমিন জওয়াব দেয়— আমার রব আল্লাহ। আমার দ্বীন ইসলাম। আমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। এ জওয়াবের পর এক ঘোষক ঘোষণা করে— তুমি সত্য বলেছ। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মযবুত কথা দ্বারা পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে মযবুত রাখেন।

এরপর তার কাছে একজন সুবেশী ও সুগন্ধযুক্ত আগন্তুক এসে বলে— তোমার জন্যে পরওয়ারদেগারের রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ, যাতে চিরস্থায়ী আনন্দ রয়েছে। মুমিন বলে— তোমার জন্যেও কল্যাণের সুসংবাদ হোক, তুমি কে? আগন্তুক বলে— আমি তোমার নেক আমল। আমি তোমার অবস্থা জানি। তুমি আল্লাহ তা'আলার এবাদতে দ্রুত ধাবিত হতে এবং গোনাহের কাজে বিলম্ব করতে। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে— এ মুমিনের জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও এবং এদিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। শয্যা পাতা এবং জান্নাতের দরজা খোলা হলে মুমিন বলে— ইলাহী, কিয়ামত অবিলম্বে কায়েম কর, যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফের যখন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখেরাতের সম্মুখীন হয়, তখন দু'জন রুক্ষ মেযাজের ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের সাথে থাকে আগুনের পোশাক ও গন্ধকের জামা। তারা তার আশে-পাশে অবস্থান নেয়। যখন আত্মা নির্গত হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতা তার প্রতি অভিসম্পাত করে এবং আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেকটি দরজাই তার ভেতর দিয়ে এ আত্মার গমনকে অশুভ মনে করে। তার আত্মা যখন উপরে আরোহণ করে, তখন তাকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়। ফেরেশতারা আরয করে, ইলাহী, তোমার এ বান্দাকে আকাশও কবুল করল না এবং পৃথিবীও না। আল্লাহ বলেন ঃ তাকে

সরিয়ে নিয়ে যাও এবং আযাবের যে সরঞ্জাম আমি তার জন্যে তৈরী করেছি, তা দেখিয়ে দাও। আমি তার কাছে مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ الخ এর ওয়াদা করেছি। এভাবে কবরে আসার পর সে প্রত্যাগতদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে তাকে বলা হয়, তোমার রব কে? নবী কে? দ্বীন কি? সে জওয়াব দেয়— আমি জানি না। এরপর তার কাছে এক কুশ্রী, দুর্গন্ধযুক্ত ও কুবেশী আগন্তুক এসে বলে, তোমাকে আল্লাহর গযব এবং যন্ত্রণাদায়ক ও স্থায়ী আযাবের দুঃসংবাদ। সে বলে— আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গলের সংবাদ দিন, তুমি কে? আগন্তুক বলে— আমি তোমার বদ আমল। তুমি আল্লাহর নাফরমানিতে দ্রুতগামী এবং এবাদতে বিলম্বকারী ছিলে। আল্লাহ তোমাকে কুপ্রতিদান দিন। সে বলে, তোমাকেও কুপ্রতিদান দিন। এরপর তার উপর এক বধির ও বোবাকে নিয়োগ করা হয়, যার কাছে থাকে লোহার গদা। যদি জিন ও মানব সেটাকে তুলতে চায়, তুলতে পারে না। এই গদা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলে পাহাড় মাটি হয়ে যায়। এই বধির ও বোবা কাফেরকে আঘাত করলে সে মাটি হয়ে যায়। পুনর্বার তাতে প্রাণ ফিরে আসে। অতঃপর তার চোখের মাঝখানে এক আঘাত করে। তার চীৎকার জিন ও মানব ছাড়া পৃথিবীবাসী সকলেই শুনে। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে— এই কাফেরের জন্যে দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও এবং একটি দরজা দোযখের দিকে খুলে দাও। সেমতে তার জন্যে দু'টি তক্তা বিছিয়ে দেয়া হয় এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর সময় মৃতের নেক ও বদ আমলসমূহ আকৃতি ধারণ করে তার সামনে আসে। সে নেক আমলগুলোকে দেখে এবং বদ আমলগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন মুমিন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন ফেরেশতা তার কাছে রেশমী বস্ত্রে করে মেশক ও রায়হানের মাটি নিয়ে আসে। অতঃপর তার আত্মা এত সহজে বের করে, যেমন আটার মধ্য থেকে চুল বের করে নেয়া হয়। ফেরেশতা বলে— হে প্রশান্ত নফস, আল্লাহর সম্মান ও সুখের দিকে বের হয়ে এস। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আত্মা বের হওয়ার পর সেটাকে মেশক ও রায়হানের মধ্যে রেখে উপরে রেশমী বস্ত্র জড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর ইল্লিয়্যীন অর্থাৎ ঊর্ধ্বে বসবাসকারীদের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

অপরপক্ষে কাফেরের যখন মৃত্যু আসে, তখন তার কাছে ফেরেশতারা চটের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তার প্রাণ বের করে। বলা হয়— হে অপবিত্র প্রাণ, আল্লাহর আযাব ও লাঞ্ছনার দিকে বের হয়ে আয়। তুই তাঁর প্রতি রুষ্ট এবং তিনি তোর প্রতি ক্রুদ্ধ। এরপর প্রাণ বের হলে সেটাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। তাতে সে ছটফট করতে থাকে। অতঃপর উপর দিয়ে চট জড়িয়ে সিজ্জীন তথা কয়েদখানায় পাঠানো হয়।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— মুমিনের কবরে একটি সবুজ বাগান থাকে। তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণিমার রাতের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল হয়।

তোমরা জান, এ আয়াতের মর্ম কি? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় তার জন্যে সংকীর্ণ জীবন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে কবরে কাফেরের আযাব। তার উপর নিরানব্বইটি " তিন্নীন" ছেড়ে দেয়া হবে। তোমরা জান তিন্নীন কি? এগুলো হচ্ছে— অজগর। এদের প্রত্যেকের সাতটি করে ফণা হবে। এগুলো কাফেরের দেহকে কিয়ামত পর্যন্ত পিষ্ট ও নিষ্পেষিত করতে থাকবে।

হাদীসে উল্লিখিত নিরানব্বই সংখ্যাটি দেখে বিস্মিত না হওয়া উচিত। কারণ, সর্প ও বিচ্ছুর সংখ্যা মন্দ চরিত্র তথা অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদির সংখ্যা অনুসারে হবে। কেননা, এগুলোর মূল গুণাগুণ কয়েকটি মাত্র। অতঃপর এসব মূল থেকে কতিপয় শাখা নির্গত হয়েছে এবং শাখাসমূহও কয়েক প্রকারে বিভক্ত হয়েছে। নিজের সত্তার দিক দিয়ে সব প্রকারই মারাত্মক। এগুলোই স্বয়ং সাপ ও বিচ্ছুতে পরিণত হবে। তবে যে স্বভাবটি যবরদস্ত হবে, সেটি অজগরের ন্যায় দংশন করবে এবং যে স্বভাবটি দুর্বল হবে, সেটি বিচ্ছুর ন্যায় হুল মারবে। আর মাঝারি স্বভাবটি সাপের ন্যায় যন্ত্রণা দেবে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বুযুর্গগণ এসব মন্দ স্বভাবের ধ্বংসকারিতা ও এদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্তিকে নূরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেন। তবে এদের সংখ্যা নবুওয়তের নূর ছাড়া অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না।

মোটকথা, এ ধরনের হাদীসের বাহ্যিক অর্থ সঠিক এবং এতে অনেক রহস্য লুক্কায়িত, যা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের কাছে সুস্পষ্ট। সুতরাং কারও কাছে

এগুলোর স্বরূপ উদঘাটিত না হলে বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা মোটেই উচিত নয়। বরং বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াই কর্তব্য।

প্রশ্ন হয়, এটা অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। কেননা, আমরা কাফেরকে কবরে দীর্ঘ দিন দেখি; কিন্তু এসব সাপ-বিচ্ছু কখনও দেখা যায় না। সুতরাং অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বিশ্বাস স্থাপন করা কিরূপে সম্ভব? জওয়াব এই যে, এধরনের বিষয়কে তিন ভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়।

প্রথমত, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং মৃত কাফেরকে দংশন করে। কিন্তু এ কারণে আমরা তা জানি না যে, এগুলো দেখার যোগ্যতা আমাদের চর্মচক্ষে নেই। আখেরাত সম্পর্কিত এসব ব্যাপার বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সাহাবায়ে কেরাম হযরত জিবরাঈলের অবতরণে বিশ্বাস করতেন। অথচ তাঁকে দেখতেন না। তারা একথাও বিশ্বাস করতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে দেখেন। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে প্রথমে ফেরেশতা ও ওহীর প্রতি বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা অপরিহার্য। নবী এক বিষয় দেখতে পারেন, যা তাঁর উম্মত দেখতে পারে না— এটা বিশ্বাস্য ও সম্ভবপর হলে মৃতের বেলায় কেন সম্ভবপর হবে না? ফেরেশতা যেমন দুনিয়ার মানুষের অনুরূপ নয়, তেমনি কবরের সাপ-বিচ্ছুও দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর মত নয়। তাদের প্রজাতি ভিন্ন এবং যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাদেরকে জানা যায়, তাও ভিন্ন।

দ্বিতীয়ত, তুমি নিদ্রিত ব্যক্তির অবস্থা দেখ। সে কখনও স্বপ্নে দেখে, তাকে বিচ্ছু ও সাপ দংশন করছে। এতে তার ব্যথাও এমন হয় যাতে মাঝে মাঝে নিদ্রার মধ্যেই সে চীৎকার করে উঠে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায় এবং কখনও নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে। নিদ্রিত ব্যক্তি এসব জানতে পারে এবং ব্যথা তেমনি পায়, যেমন জাগ্রত ব্যক্তি পায়। অথচ মনে হয় না, সে নড়াচড়া করছে এবং তার আশেপাশে কোন সাপ-বিচ্ছুও দেখা যায় না। কিন্তু তার বেলায় সাপও থাকে এবং কষ্টও। অবশ্য সেটা তোমার প্রত্যক্ষণের বাইরে। অতএব, যে ক্ষেত্রে দংশনের কষ্ট অর্জিত, সেখানে সাপের কাল্পনিকতা অথবা চোখে দেখা উভয়টিই সমান।

তৃতীয়ত, তুমি জান, সাপ নিজে কষ্ট দেয় না বরং কষ্ট এর বিষের মাধ্যমে হয়। এরপর বিষও ব্যথা নয়; বরং তোমার মধ্যে বিষের যে প্রভাব হয়, কষ্ট তা থেকেই অনুভূত হয়। সুতরাং যদি বিষ ছাড়াই এমনি প্রভাব দেহের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে কষ্ট প্রচুর হবে। কিন্তু এই কষ্ট এছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যক্ত করা যায় না যে, যে কারণে এরূপ কষ্ট হওয়ার নিয়ম প্রচলিত, সেই কারণের প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করে দেয়া। উদাহরণতঃ যদি

মানুষের মধ্যে বাহ্যত কোন নারীর সাথে সহবাস ছাড়াই সহবাসের আনন্দ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এই আনন্দকে কিভাবে ব্যক্ত করবে? একথাই বলবে যে, এটা সহবাসের আনন্দ। এই সম্বন্ধের মাধ্যমে কারণ শনাক্ত হয়ে যাবে এবং তার ফল জানা হয়ে যাবে, যদিও দৃশ্যত কারণ উপস্থিত নয়। ফলাফলের জন্যেই তো কারণ তালাশ করা হয়। কারণের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হয় না। মৃত্যুর সময় মানুষের বদ-স্বভাবসমূহ কষ্টদায়ক হয়ে যায় এবং সে কষ্ট সাপ ও বিচ্ছুর কষ্টের অনুরূপ হয়। সাপ ও বিচ্ছু সেখানে থাকে না। বদ-স্বভাবের কষ্টদায়ক হয়ে যাওয়া এমন, যেমন মাশুকের মৃত্যুর পর ইশক আশেকের জন্যে কষ্টদায়ক হয়ে যায়। অর্থাৎ, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, পূর্বে যা ছিল আনন্দদায়ক, তা এখন কষ্টদায়ক হয়ে যায়। ফলে, মনের উপর এমন আযাব হতে থাকে, যাতে আশেক কামনা করতে থাকে যে, এই ইশক ও মিলন না হলেই ভাল হত! মৃতের আযাবের অবস্থাও হুবহু তেমনি। দুনিয়াতে সে মোহগ্রস্ত হয়ে ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের সাথে ইশক করতে থাকে! যদি জীবদ্দশায় এগুলো কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায় এবং ফেরত পাওয়ার আশা না থাকে, তবে দেখা যায়, তার কি শোচনীয় অবস্থা হয়! সে বাসনা করতে থাকে, এগুলো আমার হাতে কোনদিন না এলেই ভাল হত। আজ এহেন দুর্দিনের মুখ দেখতে হত না এবং হারানোর ব্যথা সইতে হত না। মৃত্যুতেও তাই হয়। অর্থাৎ, যাবতীয় পার্থিব প্রিয়বস্তু একযোগে হাতছাড়া হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? জওয়াব এই যে, কতক লোক প্রথম উপায়ের প্রবক্তা। তাদের মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় স্বীকার্য নয়। কেউ কেউ প্রথমটি অস্বীকার করে ও দ্বিতীয়টি মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ শুধু তৃতীয়টি স্বীকার করে। বাস্তব সত্য এই যে, তিনটি উপায়ই সম্ভব। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা তাই জানতে সক্ষম হয়েছি। মনোবলের সংকীর্ণতার কারণেই কেউ কেউ কতক উপায়কে অস্বীকার করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার যে সকল ক্রিয়াকর্মের সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত নয়, সেগুলোকেই অস্বীকার করে বসে। বান্দাকে আযাব দেয়ার এই উপায়ত্রয়কেই সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে একভাবে এবং কোন বান্দাকে অন্যভাবে আযাব দেন। কতক বান্দা এমনও থাকে, যাদেরকে তিন প্রকারেই আযাব দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কম ও বেশী আযাব থেকে নিজের আশ্রয়ে রাখুন।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— মৃত্যুর পর মানুষের কাছে দু'জন কৃষ্ণবর্ণ, নীল চক্ষুবিশিষ্ট ফেরেশতা আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নকীর। তারা মৃতকে জিজ্ঞেস করে, নবী সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য ছিল? মৃত ঈমানদার হলে জওয়াব দেয়, আমি তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বলতাম। উভয় ফেরেশতা বলে— আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম, তুমি একথা বলবে। এরপর তার কবর সত্তর গজ দৈর্ঘ ও সত্তর গজ প্রস্থ করে দেয়া হয়। কবরকে আলোকোজ্জ্বল করা হয় এবং মৃতকে বলা হয়— ঘুমিয়ে পড়। সে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজের পরিজনের মধ্যে গিয়ে তাদেরকে অবস্থা বলে আসি। তাকে বলা হয়— তুমি ঘুমিয়ে পড়। সেমতে সে নববধূর মত ঘুমিয়ে পড়ে, যাকে তার সর্বাধিক প্রিয়জনই জাগ্রত করে। এই মুমিনকেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাই জাগ্রত করবেন।

পক্ষান্তরে যদি মৃত মুনাফিক হয়, তবে জওয়াবে বলে— আমি জানি না। মানুষকে যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। উভয় ফেরেশতা বলে ঃ আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম তুমি একথা বলবে। এরপর মাটিকে আদেশ করা হয়, এর উপর মিলিত হয়ে যা। ফলে, মাটি তাকে এমনভাবে পিষ্ট করে দেয় যে, পাঁজরের হাড় এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। অতঃপর সর্বদা তাকে এমনিভাবে আযাব দেয়া হয়, যে পর্যন্ত পুনরুত্থান না হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন ঃ হে ওমর, তোমার কি দশা হবে যখন তুমি মরে যাবে! তোমার লোকজন তোমাকে নিয়ে যাবে এবং তোমার জন্যে দৈর্ঘে তিন হাত ও প্রস্থে দেড় হাত একটি গর্ত তৈরী করবে। তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে এবং সুগন্ধি লাগিয়ে কাঁধে তুলে নেবে। এরপর সেই গর্তে রেখে তোমার উপর মাটি ফেলে দেবে এবং দাফন করবে। তারা যখন তোমার কাছ থেকে ফিরে যাবে, তখন তোমার কাছে কবরে মুনকির, নকীর নামের দু'জন ফেরেশতা আসবে। তাদের আওয়াজ হবে বজ্রের মত কর্কশ, চক্ষু হবে বিদ্যুতের মত ঝলমলে, চুল হেঁচড়িয়ে যাবে এবং কবরকে দাঁত দিয়ে আঁচড়ে তারা তোমাকে নাড়া দেবে। তখন হে ওমর, তোমার কি অবস্থা হবে! হযরত ওমর আরয করলেন ঃ আমার জ্ঞান-বুদ্ধিও তখন বহাল থাকবে কি, যেমন এখন আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। হযরত ওমর বললেন ঃ তাহলে কোন চিন্তা করবেন না, তাদের জন্যে আমি যথেষ্ট হব।

এ হাদীসটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, মৃত্যুর পর জ্ঞান-বুদ্ধি বদলে

যায় না, কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলে যায়। মৃতব্যক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন ও সুখ-দুঃখ অনুভবকারী থেকে যায়; যেমন জীবদ্দশায় ছিল। মৃতের এই অংশে মৃত্যু ও অস্তিত্বহীনতা আসে না।

শিঙ্গার ফুঁক ঃ শিঙ্গার ফুঁক সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ -

অর্থাৎ— সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে, সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন, তারা নয়। অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ -

অর্থাৎ— যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন। কাফেরদের জন্যে এটা কঠিন।

يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ - فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ -

অর্থাৎ, তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা

কখন পূর্ণ হবে? তারা তো অপেক্ষা করছে এক মহাচীৎকারের, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে যখন তারা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে। ফলে তারা ওসিয়ত করতে পারবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে মানুষ কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগাল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এর ওয়াদাই দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

অতএব, যদি মৃতদের সামনে এই চীৎকারের আতংক ছাড়া অন্য কোন আতংক না থাকত, তবু একে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা, এটি এমন এক ভয়ংকর চীৎকার হবে, যাতে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবাই প্রাণত্যাগ করবে। কেবল আল্লাহ্ যাদেরকে বাঁচাতে চাইবেন, তারা বাঁচবে। বলা বাহুল্য, তারা হবে কয়েকজন ফেরেশতা। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

وكيف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى

الجبهة واصغى بالاذن ينظر متى يومر بنفخ -

অর্থাৎ— আমি কিরূপে স্বস্তি পেতে পারি এমতাবস্থায় যে, শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মুখে রেখে দিয়েছে এবং মাথা নত করে কান পেতে রেখেছে, কখন ফুঁক দেয়ার আদেশ হয়ে যাবে।

হযরত মুকাতিল বলেন ঃ হযরত ইসরাফীল (আঃ) তূরীর আকৃতি বিশিষ্ট একটি শিঙ্গায় মুখ লাগিয়ে রেখেছেন। এই শিঙ্গার মুখের বৃত্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান। হযরত ইসরাফীল নিজের দৃষ্টি আরশের দিকে তুলে অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়ার আদেশ হবে? প্রথমবার যখন তিনি ফুঁক দেবেন, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ভয়ের আতিশয্যে প্রাণত্যাগ করবে। কেবল চারজন ফেরেশতা বেঁচে থাকবেন। তাঁরা হলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আঃ) এরপর আযরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হবে, প্রথমে জিবরাঈলের জান কবয করার জন্যে। এরপর মীকাঈলের, এরপর ইসরাফীলের জান কবয করা হবে। এরপর আযরাঈলকে নিজেই মরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি বরযখ জগতে থাকবে। অতঃপর

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসরাফীলকে জীবিত করে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

অর্থাৎ— অতঃপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া হবে। হঠাৎ তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

অর্থাৎ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে জীবিত হওয়াকে পর্যবেক্ষণ করবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন— আমাকে যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীরূপে পাঠান, তখন শিঙ্গাওয়ালা ইসরাফীলকে বলে পাঠান। তিনি শিঙ্গাকে মুখে লাগিয়ে নেন এবং এক পা পিছনে ও এক পা সামনে রেখে ফুঁক দেয়া নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। অতএব, তোমরা ফুঁককে ভয় কর।

সুতরাং সে অবস্থায় মানুষের দুর্গতি, লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের চিত্রটি মনে মনে কল্পনা কর এবং সৌভাগ্যসূচক নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করার কথা চিন্তা কর। এরপর নিজেকেও তাদের মধ্যে ধরে নাও। সবার যেমন দুরবস্থা হবে, তোমারও তেমনি হবে। তারা যেমন বিস্ময়াবিষ্ট থাকবে, তেমনি তুমিও থাকবে। বরং দুনিয়াতে যারা আমীর, বিত্তবান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ও রাজা-বাদশাহ ছিল, তারা সেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাতারে লাঞ্ছিত, নীচ, হেয় ও পদদলিত ধূলিকণার অনুরূপ হবে। সেদিন বন্য জন্তুরা বন ও পাহাড় থেকে এসে পলায়নের স্বভাব ভুলে গিয়ে মানুষের সাথে মিলেমিশে যাবে। তাদের কোন গোনাহ্ না থাকলেও সেদিনের উত্থান, ভীষণ নাদ ও শিঙ্গার ফুঁকের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা লম্ফ-ঝম্প বিস্মৃত হয়ে মানুষের সাথে মিলে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ

অর্থাৎ, যখন বন্য প্রাণীদের একত্র সমাবেশ হবে।

এরপর অবাধ্য শয়তানরা আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থাপিত হওয়ার ভয়ে মাথা নীচু করে থাকবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا -

অর্থাৎ— সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি তাদেরকে শয়তানদের সহ একত্রে সমবেত করবই। অতঃপর নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করবই।

অতএব, এখানে নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর, কি হবে!

হাশরের ময়দান ঃ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর মানুষকে নগ্নপদে নগ্নদেহে খতনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে হাঁকানো হবে। সেটি হবে এক নরম, সমতল ও সাদা রঙের ময়দান, যাতে আত্মগোপন করার মত কোন উঁচু টিলা ও নীচু গর্ত থাকবে না। সেদিকে মানুষকে দলে দলে পৌঁছানো হবে। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া সত্ত্বেও ভূ-পৃষ্ঠের চারদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে এক জায়গায় সমবেত করবেন। সে সময় অন্তরসমূহ ধড়ফড় করতে থাকবে এবং চোখসমূহ নত থাকবে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর একটি সাদামাঠা ময়দানে হবে। তাতে কোন প্রকার দালান-কোঠা থাকবে না— যাতে মানুষ আত্মগোপন করতে পারে।

হাশরের যমীন দুনিয়ার যমীনের মত হবে না। দুনিয়ার যমীনের সাথে এটা কেবল নামেই অভিন্ন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

অর্থাৎ— যেদিন এ যমীন অন্য যমীনে পরিবর্তিত হবে এবং আকাশও পরিবর্তিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যমীনে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে। এর বৃক্ষ,পর্বতমালা, বন-জঙ্গল ও অন্যান্য সবকিছু লোপ পাবে এবং ওকাযের চামড়ার মত ছড়ানো হবে। যমীন রৌপ্যের মত সাদা হবে, যার উপর কোন রক্তপাত ও গোনাহ হয়ে থাকবে না। নভোমণ্ডলের চাঁদ, সূর্য ও তারকা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যখন সে ময়দানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হয়ে যাবে, তখন উপর থেকে তারকারাজি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, সূর্য কিরণবিহীন এবং চন্দ্র আলোবিহীন হয়ে যাবে। ভূ-পৃষ্ঠ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। ঠিক এ অবস্থায় হঠাৎ মাথার উপর থেকে আকাশ ঘুরতে ঘুরতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফেরেশতারা এর চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। আকাশ হবে ধুনিত তুলার মত এবং মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ নগ্নপদে, নগ্নদেহে

খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা (রাঃ) — যিনি এই হাদীস রেওয়ায়েত করেন— বলেন ঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা একে অপরকে উলঙ্গ দেখব, এটা তো বড় সর্বনাশের কথা! তিনি বললেন ঃ সেদিন মানুষ অন্য চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। কারও দেখার ফুরসতই থাকবে না। এতেই অনুমান করা যায়, সেদিনটি কেমন ভয়ংকর হবে! কেন হবে না? কতক মানুষ তো পেটের উপর এবং কেউ মাথার উপর ভর দিয়ে চলবে। ফলে অপরের দিকে তাকানোর সাধ্য কোত্থেকে হবে?

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তিন ভাবে উঠানো হবে। এক, সওয়ার হয়ে। দুই, পায়ে হেঁটে এবং তিন মাথার উপর ভর দিয়ে। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, মাথার উপর ভর দিয়ে মানুষ কেমন করে চলবে? তিনি বললেন ঃ যিনি তাদেরকে পায়ের উপর ভর দিয়ে চালিয়েছেন, তিনি মাথার উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম।

মানুষ যে বিষয়ের সাথে পরিচিত নয়, তাকে অস্বীকার করা মানুষের স্বভাব। উদাহরণতঃ যদি মানুষ সাপকে পেটের উপর ভর দিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে না দেখে, তবে বলবে, পা ব্যতীত চলা সম্ভব নয়। আর যে কাউকে পায়ে চলতে না দেখে, সে পায়ে চলাকেও সুকঠিন মনে করবে। এই দৃষ্টিতে মানুষের উচিত, কিয়ামতের কোন আশ্চর্য বিষয় যদি তার নজরে না পড়ে, এরপর হঠাৎ দেখতে পায়, তবে সে তাকেও অস্বীকার করতে থাকে। অথচ সেটা একটা বাস্তব বিষয়।

এরপর হাশরের ময়দানে কি পরিমাণ ভিড় হবে, তাও লক্ষণীয়! সেখানে সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীনের বাশিন্দা অর্থাৎ, ফেরেশতা, জিন, মানব, শয়তান, বন্য জন্তু, হিংস্র প্রাণী ও পশুপক্ষী একত্র সমবেত হবে। অতঃপর তাদের মাথার উপর সূর্য অত্যন্ত তেজ সহকারে তাপ বিকিরণ করতে থাকবে। দুনিয়াতে সূর্যের যে প্রখরতা, তা বদলে যাবে এবং জনতার মাথা থেকে মাত্র দু'ধনুক দূরে অবস্থান করবে। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং নৈকট্যশীলগণ ছাড়া অন্য কেউ এই ছায়ায় স্থান পাবে না। তখন কিছু লোক আরশের ছায়াতলে থাকবে এবং কিছু লোক প্রখর রৌদ্রতাপে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকবে। ভিড়ের ধাক্কায় একজনের কাঁধ অন্যজনের কাঁধের সাথে মিলিত থাকবে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার সামনে যাওয়ার ভয় ও লজ্জা সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ফলে, তাদেরকে এক সাথে কয়েক প্রকারের উত্তাপ সইতে হবে। যেমন,

সূর্যের উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ, লজ্জা ও ভয় থেকে উদ্ভূত অন্তর্জ্বালা ইত্যাদি। এ সকল তাপ ও জ্বালার ফলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম বেরুতে থাকবে এবং ময়দানে প্রবাহিত হতে থাকবে। এরপর মানুষের শরীরের দিকে উত্থিত হতে শুরু করবে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যার যতটুকু মর্তবা হবে, সে অনুপাতে তার ঘাম উপরে উঠবে। সেমতে কারও ঘাম উরু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কারও কান পর্যন্ত এবং কারও মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত হবে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে একথা পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। তীব্র ব্যাকুলতার কারণে ঘাম তাদের মুখের লাগাম হয়ে যাবে।

অতএব, হে মিসকীন, হাশরবাসীদের ঘাম এবং দুঃখ-দুর্দশা চিন্তা কর। এই কষ্টে পড়ে কেউ কেউ আরয করবে, এলাহী, আমাদেরকে এহেন বেদনা ও অপেক্ষার কষ্ট থেকে মুক্তি দাও যদিও আমরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হই। এই হবে হিসাব-নিকাশ ও আযাবের পূর্ববর্তী কষ্ট। তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে। জেনে রাখ, যদি দুনিয়াতে কারও ঘাম আল্লাহর পথে অর্থাৎ হজ্জ, জেহাদ, রোযা, নামায ও কোন মুসলমানের কল্যাণ সাধনে বের না হয়ে থাকে, তবে তার ঘাম সেদিন ভয় ও লজ্জার কারণে কিয়ামতের ময়দানে বের হবে এবং তার কষ্ট অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মূর্খতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হলে মানুষ নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে কষ্ট স্বীকার করা ও ঘাম বের হওয়া সহজ ও স্বল্পস্থায়ী বিষয়। পক্ষান্তরে হাশরের ময়দানে ঘাম বের হওয়া অত্যধিক কষ্টকর ও দীর্ঘস্থায়ী। কেননা, সে দিনটিই এমন যে, এতে মেয়াদ ও তীব্রতা উভয়টিই অধিক।

কিয়ামত দিবসের দীর্ঘতা ঃ কিয়ামত দিবসে মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের মন হবে ত্যক্ত-বিরক্ত। কেউ তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। তিনশ' বছর ধরে তারা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। না কোন লোকমা খাবে, না পানির কোন ঢোক গিলবে। বাতাসের কোন ঝাঁপটাও তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে না। হযরত কা'ব ও কাতাদাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ— সেদিন মানুষ বিশ্ব-পালকের পথ পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

মানুষ তিনশ' বছর পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকবে। বরং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক জায়গায় এমনভাবে জমায়েত করবেন, যেমন তূণের মধ্যে তীরসমূহকে খচ্খচ্ করে ভরে দেয়া হয়। তিনি পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত তোমাদের প্রতি দৃকপাত করবেন না।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ তুমি সেদিনকে কি মনে কর, যেদিন মানুষ পায়ের উপর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মেয়াদ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। এ সময়ে তারা কোন লোকমা খাবে না এবং এক চুমুক পানিও পান করবে না। অবশেষে পিপাসার আতিশয্যে যখন তাদের ঘাড় আলাদা হয়ে যাবে, তখন দোযখে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে গরম পানির ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। অসহ্য কষ্টের সম্মুখীন হয়ে তারা একে অপরকে বলবে, চল, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যার ইযযত ও সম্মান রয়েছে, তাঁকে খুঁজে বের করি, যাতে সে আমাদের জন্যে শাফায়াত করে। অতঃপর তারা যে পয়গম্বরেরই দ্বারস্থ হবে, তিনিই তাদেরকে "নফসী, নফসী" বলে সরিয়ে দেবেন এবং বলবেন, আজ আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ এত বেশী, যা আর কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অবশেষে আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) যার জন্যে আদেশ পাবেন, তার জন্যে শাফায়াত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّامَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا

অর্থাৎ— যার জন্যে আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা পছন্দ করবেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও জন্যে শাফায়াত উপকারী হবে না।

এখন সে দিনের দৈর্ঘ চিন্তা কর। হাদীস শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, সেদিনটি মুমিনের জন্যে ততটুকু হালকা ও সামান্য হবে, যতটুকু সময়ের মধ্যে সে দুনিয়াতে একটি ফরয নামায আদায় করত; বরং এর চেয়েও সহজতর মনে হবে। অতএব তুমি চেষ্টা কর, যাতে এই ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কারণ, যে পর্যন্ত তোমার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অবশিষ্ট আছে, সে পর্যন্ত ব্যাপারটি তোমার এখতিয়ারাধীন।

সওয়াল প্রসঙ্গ ঃ হে মিসকীন, এসব অবস্থার পর তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে যে সওয়াল করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা কর। তুমি যখন কিয়ামতের সংকটময় অবস্থায় থাকবে, তখন হঠাৎ আকাশের প্রান্ত থেকে বিরাটকায়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা উত্থিত হবে। তাকে নির্দেশ দেয়া হবে— পাপীদের মাথার চুল ধরে সর্বশক্তিমানের সামনে পেশ হওয়ার স্থানে নিয়ে এস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে একজন ফেরেশতা রয়েছে। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী ব্যবধান মুসাফিরের এক বছর পর্যন্ত চলার পথের সমান। তখন কেউ কেউ ভয়ের আতিশয্যে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করে বসবে— পালনকর্তা তোমাদের ভেতরেই রয়েছেন কি? ফেরেশতারা সজোরে বলবে, আমাদের রব পবিত্র এবং তিনি আমাদের মধ্যে নন। তবে তিনি পরে আসবেন। এরপর ফেরেশতারা মানুষদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি বাস্তবরূপ লাভ করবে—

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ -

অর্থাৎ— আমি অবশ্যই তাদেরকে সওয়াল করব, যাদের প্রতি রসূল প্রেরিত হয়েছে এবং রসূলগণকেও অবশ্য সওয়াল করব, অতঃপর তাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

সওয়ালের শুরু হবে পয়গম্বরগণ থেকে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -

অর্থাৎ— যেদিন আল্লাহ পয়গম্বরগণকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি জওয়াব পেয়েছ? তাঁরা বলবে ঃ আমরা জানি না। তুমিই অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

অনুমান কর, সেদিনটি কেমন কঠিন হবে, যেদিন পয়গম্বরগণও হতভম্ব হয়ে যাবেন। এ প্রশ্নটির জওয়াব তাঁদের জানা ছিল, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কি বললেন, তা জানা থাকবে না।

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি রেসালত পৌঁছিয়েছ কি? তিনি আরয করবেন, হাঁ। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে কেউ পয়গাম পৌঁছিয়েছে কি? তারা আরয করবে— আমাদের কাছে তো কোন সতর্ককারী আসেনি!

হযরত ঈসা (আঃ)-কে ডেকে সওয়াল করা হবে, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, আমাকে ও আমার জননীকে দু'খোদা মেনে নাও? এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বছরের পর বছর পর্যন্ত অস্থির থাকবেন। অতঃপর ফেরেশতারা এসে এক এক ব্যক্তিকে ডেকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি, হে অমুক মহিলার পুত্র, পেশ হওয়ার জন্যে যথাস্থানে উপস্থিত হও। এই আওয়াজে মানুষ প্রকম্পিত হবে এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হবে। কেউ কেউ বাসনা প্রকাশ করবে, তাদের কুকর্ম হিসাবের জন্যে পেশ না করে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেই ভাল হাত। সওয়ালের পূর্বে আরশের নূর প্রকাশিত হবে এবং হাশরের ময়দান উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেক মানুষ মনে করতে থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা বুঝি সওয়ালের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাকে ছাড়া কেউ আল্লাহকে দেখছে না এবং সওয়াল বুঝি কেবল তাকেই করা হবে— অন্য কাউকে নয়। এরপর জিবরাঈলকে বলা হবে— দোযখ আমার কাছে নিয়ে এস। জিবরাঈল দোযখের কাছে এসে বলবেন— মালিকের আদেশ পালন কর। দোযখ একথা শুনেই ক্রোধে জ্বলে উঠবে এবং উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে চীৎকার করবে। মানুষ তার তর্জন-গর্জন শুনে ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দোযখের রক্ষীরা নাফরমান বান্দাদের দিকে এগিয়ে আসবে। চিন্তা কর, তখন মানুষের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে! ভয়-ভীতিতে তাদের মন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। যালেম ও নাফরমানদের মধ্যে হায় হায় রব উঠবে এবং সিদ্দীকগণ "নফসী, নফসী" বলতে থাকবেন। ইত্যবসরে দোযখ দ্বিতীয় চীৎকার দিবে। তখন ভয় ও আতংক দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শক্তি শিথিল হয়ে যাবে। তারা জেনে নিবে তারা গ্রেফতার হবে। অতঃপর তৃতীয় চীৎকারের সাথে সাথে মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। দুঃখে যালেমদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে উদ্দেশ করে সওয়াল করবেন— তোমরা কি জওয়াব পেয়েছিলে? পয়গম্বরগণের এই শাসন দেখে গোনাহগারদের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং পিতা-পুত্রের কাছ থেকে, ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। অতঃপর প্রত্যেককে ধরে এনে আল্লাহ্ তা'আলার

সামনে পেশ করা হবে। তিনি কম-বেশী, প্রকাশ্য ও গোপন আমল সম্পর্কে সওয়াল করবেন এবং হাত-পা ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞেস করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন— কিয়ামতের দিন কি আমরা পরওয়ারদেগারকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ দুপুরের মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি মতবিরোধ কর? সবাই বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার চাঁদ মেঘমুক্ত আকাশে দেখার ব্যাপারে সন্দেহ কর কি? সবাই আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারেও তোমরা কোন সন্দেহ ও দ্বিধা করবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন ঃ আমি কি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি? তোমাকে সরদার করিনি? তোমাকে স্ত্রী দেইনি? ঘোড়া ও উটকে তোমার অনুগত করিনি? বান্দা বলবে ঃ জী হাঁ, এ সকল নেয়ামত তুমি দিয়েছিলে। আল্লাহ্ এবার বলবেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাত হবে এ ধারণা তোমার ছিল না? বান্দা বলবে— না। আল্লাহ্ বলবেন— আচ্ছা, তাহলে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি।

দাঁড়িপাল্লা ঃ এরপর দাঁড়িপাল্লার চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। সওয়ালের পর মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, যাদের কোন নেকী থাকবে না, তাদের জন্যে একটি কাল ঘাড় দোযখ থেকে বের হবে। পাখী যেমন মাটি থেকে দানা চয়ন করে, তেমনি সে ঘাড়টি তাদেরকে তুলে দোযখে ফেলে দেবে এবং দোযখ তাদেরকে গিলে ফেলবে। দুই, যাদের কাছে কোন বদী থাকবে না। তাদের জন্যে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করত, তারা দণ্ডায়মান হোক। এই ঘোষণা শুনে তারা দণ্ডায়মান হবে এবং জান্নাতে চলে যাবে। এরপর যারা তাহাজ্জুদ পড়ত, তাদের সাথেও এমনি আচরণ করা হবে। এরপর তাদের সাথেও করা হবে, যাদেরকে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ্র যিকর থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। তৃতীয় দল এমন লোকদের, যারা নেক আমলের সাথে বদ আমলও মিশ্রিত করেছে। বদ আমল তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন থাকবে না। তাদের নেক আমল বেশী কি বদ আমল বেশী, তা আল্লাহ্ তা'আলার খুব ভালই জানা থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও পরিস্থিতি জানিয়ে দিতে চাইবেন, যাতে ক্ষমা করার সময় তাঁর অনুগ্রহ এবং শাস্তি দেওয়ার সময় তাঁর ন্যায়বিচার ফুটে উঠে। নেক আমল ও বদ

আমল সম্বলিত আমলনামাসমূহ উড়ানো হবে এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তখন মানুষের চোখগুলো আমলনামার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। নেকীর পাল্লা ঝুঁকে পড়ে কি বদীর পাল্লা। এটা হবে অত্যন্ত ভয় ও আশংকার মুহূর্ত। ফলে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি উড়ে যাবে।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে হযরত আয়েশা আখেরাত স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। ফলে, তাঁর গরম অশ্রু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গণ্ডদেশে পতিত হলে তিনি জেগে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আয়েশা, কাঁদছ কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আখেরাত স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাঁ। কিন্তু তিন জায়গায় মানুষ কেবল নিজেকেই স্মরণ করবে। প্রথম, যখন দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হবে এবং আমলসমূহ ওজন করা হবে। দাঁড়িপাল্লা হালকা হল কি ভারী হল— তা দেখে নেয়া পর্যন্ত এই আত্মমগ্নতা অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়, যখন আমলনামাসমূহ উড়িয়ে দেয়া হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে কি বাম হাতে আসে, সে অপেক্ষায় মানুষ নিজেকে ছাড়া সবকিছু ভুলে যাবে। তৃতীয়, পুলসিরাতে থাকাকালে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা মানুষকে মানদণ্ডের উভয় পাল্লার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা সজোরে ঘোষণা করবে, অমুক ভাগ্যবান হয়েছে। সে আর কখনও হতভাগ্য হবে না। এ ঘোষণার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টি শুনতে পাবে। আর যদি পাল্লা হালকা হয়, তবে ফেরেশতা সবাইকে শুনিয়ে ঘোষণা করবে। অমুক এমন হতভাগা হয়েছে যে, আর কোনদিন ভাগ্যবান হবে না। নেকীর পাল্লা হালকা হলে দোযখের ফেরেশতা লোহার গদা হাতে নিয়ে আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আসবে এবং যারা দোযখের ভাগে পড়বে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে ডেকে বলবেন ঃ হে আদম, দাঁড়াও এবং যারা দোযখে যাওয়ার, তাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দাও। তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ তাদের সংখ্যা কত হবে? আল্লাহ বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে খুবই চিন্তিত হলেন এবং কখনও মুখে হাসি ফুটালেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এই সদা বিমর্ষ অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা আমল কর এবং প্রফুল্ল থাক। কারণ, সেই

সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমাদের সাথে দু'টি সম্প্রদায় থাকবে, যাদেরকে মানুষের বিপরীতে দাঁড় করালে তাদের সংখ্যা বেশীই থাকে। এছাড়া আদমের যে সব সন্তান ও শয়তানের যত আওলাদ মারা গেছে, তারাও এই হাজারের মধ্যে রয়েছে। তাদের সংখ্যাও অনেক বেশী। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ সে দুটি সম্প্রদায় কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। রাবী বলেন ঃ একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আশান্বিত ও আনন্দিত হলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমল কর এবং প্রফুল্ল থাক। কসম সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমরা কিয়ামতে এমন হবে, যেমন উটের পাঁজরে কাল দাগ অথবা ঘোড়ার চোখে ঘর্ষণের দাগ।

পারস্পরিক হক দেয়ানোর কথা ঃ দাঁড়িপাল্লার আতংক জানার পর এখন উচিত যে, এই আতংক ও আশংকা থেকে সে ব্যক্তি মুক্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে এবং শরীয়তের দাঁড়িপাল্লায় নিজের আমল ও কথাবার্তা ওজন করবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমার হিসাব নেয়ার পূর্বে তুমি তোমার নিজের হিসাব নাও। নিজের হিসাব নেয়ার অর্থ মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক গোনাহ থেকে খাঁটি তওবা করা, অপরের হক কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেয়া এবং মুখে অথবা হাতে কারও মানহানি করে থাকলে অথবা অন্তর দ্বারা কারও প্রতি কুধারণা করে থাকলে তা মাফ করিয়ে নেয়া। মুমিনের এমনভাবে মৃত্যুবরণ করা উচিত যাতে কারও কোন হক অথবা কর্তব্য তার যিম্মায় অবশিষ্ট না থাকে। এরূপ মুমিন হিসাব ব্যতিরেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি কেউ হক আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামতের দিন হকদাররা এসে তাকে ঘিরে ফেলবে। কেউ হাত ধরবে, কেউ মাথার চুল এবং কেউ জামার কলার চেপে ধরে বলবে— তুমি আমার উপর যুলুম করেছ, তুমি আমাকে গালি দিয়েছ, তুমি আমার সাথে উপহাস করেছ, তুমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমাকে ঠকিয়েছ, তুমি প্রতিবেশী হয়েও আমাকে কষ্ট দিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি। হকদারদের প্রচণ্ড ভিড় দেখে সে হয়রান-পেরেশান হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে এই আশায় মাথা তুলে তাকিয়ে থাকবে যে, তিনিই তাদের কবল থেকে তাকে মুক্তি দেবেন। এমনি অবস্থায় তার কানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে—

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ -

অর্থাৎ— আজকের দিনে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ কোন যুলুম হবে না।

এরপর তার সারা জীবনের পরিশ্রম-লব্ধ নেক আমলসমূহ কেড়ে নিয়ে হকদারদের হকের বিনিময়ে প্রদান করা হবে। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমাদের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতে অনেক নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কারও প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে থাকবে, কারও ধন-সম্পদ আত্মসাত করে থাকবে, কাউকে খুন করে থাকবে এবং কাউকে প্রহার করে থাকবে। ফলে, তার নেকীসমূহ এসব হকদারকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার সমস্ত নেকী দেয়ার পরও হক অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে হকদারদের পাপসমূহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ -

অর্থাৎ— পৃথিবীতে সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী তোমাদের মতই উম্মত।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল সৃষ্টিই পুনরুত্থিত হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়বিচার এমন হবে যে, তিনি শিংবিহীন জন্তুর হক শিংবিশিষ্ট জন্তুর কাছ থেকে নেবেন। অতঃপর বলবেন— মাটি হয়ে যাও। তখন কাফের আশংকা করবে, হায়, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম!

অতএব , হে মিসকীন, তোমার কি দশা হবে, যেদিন তুমি তোমার আমলনামা নেকীশূন্য পাবে, অথচ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে নেকী উপার্জন করেছিলে? তুমি বলবে, আমার নেকী কোথায় গেল? উত্তরে তোমাকে বলা হবে, তোমার নেকীসমূহ তোমার হকদারদের আমলনামায় চলে গেছে। শুধু তাই নয়, তুমি তোমার আমলনামাকে গোনাহে পরিপূর্ণ দেখতে পাবে; অথচ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তুমি এসব গোনাহ

থেকে আত্মরক্ষা করেছিলে। তুমি জিজ্ঞেস করবে— ইলাহী, এসব গোনাহ তো আমি কখনও করিনি। এগুলো আমার আমলনামায় কেন? উত্তর হবে— এগুলো সে সব লোকের গোনাহ, যাদেরকে তুমি গালি দিয়েছিলে, যাদের গীবত করেছিলে, ক্ষতি করেছিলে এবং ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকিয়েছিলে।

পুলসিরাত ঃ অতঃপর হে মিসকীন, নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ -

অর্থাৎ, যেদিন আমি পরহেযগারদেরকে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে রহমান আল্লাহর কাছে একত্রিত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

অতঃপর এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ, তাদেরকে চালনা কর জাহান্নামের পথে এবং তাদেরকে থামিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ভয়াবহ অবস্থাসমূহের পর মানুষকে সিরাতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এটি দোযখের উপর নির্মিত। তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো ও চুলের চেয়ে অধিক সরু একটি পুল। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে জীবন যাপন করবে, সে আখেরাতের পুলসিরাতে হালকা হবে এবং নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে অধিক পাপের কারণে যার পৃষ্ঠদেশ ভারী হবে, পুলসিরাতের প্রথম ধাপেই তার পদস্খলন ঘটবে এবং সে দোযখে পতিত হবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— পুলসিরাত দোযখের মাঝখানে স্থাপিত হবে। পয়গম্বরগণের মধ্যে আমি উম্মতকে নিয়ে তাতে অবতরণ করব। সেদিন পয়গম্বরগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না। সকল পয়গম্বর এ কথাই বলবেন— "আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ বাঁচাও।" দোযখে সা'দানের কাঁটার মত কাঁটা থাকবে। (সা'দান এক প্রকার ঘাস, যাকে উট খুব চিচিয়ে খায়। এর কাঁটার আকৃতি স্তনের অগ্রভাগের মত।) তোমরা

সা'দানের কাঁটা দেখেছ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আকৃতি সে রকমই হবে; কিন্তু বড় কতটুকু হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের আমল অনুসারে সে কাঁটা তাদের গায়ে বিদ্ধ হবে। কেউ কেউ তো তার বদ আমলের কারণে ধ্বংসই হয়ে যাবে। কেউ নিষ্পেষিত হয়ে সরিষার মত হয়ে যাবে এবং পুনরায় নিষ্পেষিত হবে।

আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, মানুষ দোযখের পুলের উপর দিয়ে গমন করবে। তার উপর থাকবে কাঁটা এবং অগ্রভাগ বাঁকানো লোহার শলাকা, যা ডান ও বাম দিক থেকে এসে মানুষকে জড়িয়ে ধরবে। পুলের উভয় পার্শ্বের ফেরেশতারা বলবে— ইলাহী, বাঁচাও, ইলাহী, বাঁচাও। কোন কোন লোক বিদ্যুতগতিতে পুল পার হয়ে যাবে— কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, কেউ হাঁটার মত এবং কেউ দৌড়ের বেগে অতিক্রম করবে। যারা দোযখের স্থায়ী অধিবাসী, তারা মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। কিন্তু যারা গোনাহের কারণে যোযখে যাবে এবং জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে, তাদের জন্যে শাফায়াতের অনুমতি হবে এবং তারা একদিন না একদিন মুক্তি পাবে।

শাফায়াত ঃ আযাবের যোগ্য বলে প্রমাণিত কোন কোন ঈমানদারের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কৃপা করতে চাইবেন। সেমতে তাদের সম্পর্কে শাফায়াত করার জন্যে তিনি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি দেবেন। এ কাজের জন্য যাঁরা অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন, তারা হলেন পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মর্তবা ও সদাচরণের অধিকারী ব্যক্তি। তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাফায়াত কবুল করবেন। অতএব, তাঁদের কাছে শাফায়াতের মর্তবা হাসিল করার জন্য মানুষের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর কয়েকটি উপায় রয়েছে—

(১) কোন মানুষকে কখনও হেয় মনে করবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর "বেলায়েত" (বন্ধুত্ব) বান্দাদের মধ্যে গোপন রেখেছেন। অতএব, তোমার দৃষ্টিতে যে হেয় হতে পারে, সে আল্লাহ্র ওলী হতে পারে।

(২) কোন গোনাহকে কখনও ছোট মনে করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর গযব তাঁর অবাধ্যতাসমূহের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন। অতএব, যে গোনাহকে তুমি সামান্য মনে করবে, তার মধ্যে আল্লাহ্র গযব নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

(৩) কোন আনুগত্য ও এবাদতকে ক্ষুদ্র মনে করবে না। কারণ, আল্লাহ্

তা'আলা নিজ সন্তুষ্টি তাঁর এবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে গোপন রাখতে পারেন। অতএব, যে এবাদতকে তুমি ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে, তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিও থাকতে পারে।

শাফায়াতের প্রমাণ কোরআন শরীফ ও হাদীসে অনেক বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى -

অর্থাৎ— অচিরেই আপনার পালনকর্তা আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি পাঠ করলেন ঃ

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ

وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত এবং যে অবাধ্যতা করে, তার জন্য তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

এরপর তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই উক্তি তেলাওয়াত করলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ -

অর্থাৎ— তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত তুলে বললেন ঃ ইলাহী, আমার উম্মতের কি হবে? একথা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমার হাবীবের কাছে যাও এবং কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস কর। সেমতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি উম্মতের কারণে কাঁদছি। অথচ এসবই আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে একথা আরয

করলে নির্দেশ হল ঃ যাও, আমার হাবীবকে বলে দাও, আমি তার উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন— আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে। এক, এক মাসের ব্যবধান থেকে আমার ভীতি। দুই, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারও জন্য তা হালাল ছিল না। তিন, আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। এর মাটিকেও পবিত্র করার উপাদান করা হয়েছে। অতএব, নামাযের সময় হয়ে গেলে আমার উম্মত পানি না পেলেও নামায পড়তে পারে। কেননা, তায়াম্মুমের মাটি সর্বত্রই মওজুদ রয়েছে। নামায পড়ার জন্য বিশেষ জায়গারও শর্ত নেই। কারণ, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠই সেজদার স্থান। চার, আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পাঁচ, প্রত্যেক নবী বিশেষ ভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আমি বিশ্বমানবের জন্যে প্রেরিত হয়েছি। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন আমি নবীগণের ইমাম হব। কিন্তু তাই বলে গর্ব করি না। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার। এজন্য গর্ব করি না। ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে যারা উত্থিত হবে, আমি হব তাদের প্রথম ব্যক্তি। আমি প্রথম সুপারিশকারী হব এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমার হাতে থাকবে হামদের পতাকা। আদম (আঃ) ও অন্য সবাই এর তলে থাকবে। আরও এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয়। আমি চাই , আমার দোয়াটি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য কিয়ামতের দিন ব্যবহার করব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের জন্য স্বর্ণের মিম্বর বিছানো হবে। তাঁরা তার উপর বসবেন। কিন্তু আমার মিম্বর খালি থাকব। আমি তাতে বসব না এবং পরওয়ারদেগারের সামনে এই আশংকায় দাঁড়িয়ে থাকবে যে, আমাকে না আবার জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয় অথচ আমার উম্মত পেছনে থেকে যায়। আমি আরয করব ঃ পরওয়ারদেগার, আমার উম্মত! আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করবেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার উম্মতের সাথে আমার কি আচরণ প্রত্যাশা কর? আমি আরয করব ঃ ইলাহী! তাদের হিসাব দ্রুত সম্পন্ন হোক। এভাবে আমি সুপারিশ করতে থাকব। অবশেষে যারা দোযখে প্রেরিত হয়ে গেছে, তাদেরও মুক্তির আদেশনামা আমি পেয়ে যাব। দোযখের দারোগা মালেক বলবে ঃ হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে গযবের আগুনের কোন প্রাপ্য রাখেননি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে গোশত আনা হল এবং তা থেকে একটি বাহু তাঁকে দেয়া হল। কারণ, এটা তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি বাহুর মাংস দাঁত দিয়ে কাটলেন, অতঃপর বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি মানুষের সরদার হব। এর কারণ কি তোমরা জান? আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এক ময়দানে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে চোখের সামনে রাখবেন। সূর্য মাথার উপরে নিকটেই থাকবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত থাকবে। তারা একে অপরকে বলবে ঃ দেখ না, আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে? এমন কোন লোক তালাশ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করবেন। সেমতে তারা বলবে, চল হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে যাই। তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি মানব-পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সেজদা করিয়েছেন। আজ আপনার পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় আছি। আদম (আঃ) জওয়াবে বলবেন, আজ আমার পরওয়ারদেগার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। এরূপ ক্রুদ্ধ পূর্বেও হননি এবং পরেও হবেন না। এছাড়া তিনি আমাকে জান্নাতের একটি ফল খেতে বারণ করেছিলেন। আমি তাঁর আদেশ মান্য করিনি। তাই আমার নিজের প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে পড়েছে। তোমরা হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করবে, আপনি পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে প্রথম রসূল হয়ে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা আখ্যা দিয়েছেন। আজ আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখুন, আমাদের কী দুরবস্থা! তিনি জওয়াব দেবেন, আজ আল্লাহ্ তা'আলা অত্যধিক রাগান্বিত। এরূপ রাগ এর পূর্বেও হননি এবং পরেও হবে না। এছাড়া আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি বদ দোয়া করেছিলাম। তাই আমি নিজের চিন্তায়ই বাঁচি না। তোমরা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও। সেমতে তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করবে, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর এবং সকল মানুষের মধ্যে আপনিই তাঁর খলীল। দয়া করে পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দেবেন, আমার পরওয়ারদেগার আজ এমন ক্রুদ্ধ যে, এর আগে তিনি কখনও এরূপ হননি এবং পরেও হবেন না। তাছাড়া, আমি তিনবার অসত্য বলেছিলাম। তাই আমি এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ আপনাকে একাধারে রেসালত ও কালাম উভয়টি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখন পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমাদের দুরবস্থা তো আপনার অজানা নেই। হযরত মূসা (আঃ) জওয়াব দেবেন, আমার পরওয়ারদেগার এত রাগান্বিত যে, এর আগে কখনও এরূপ হননি এবং পরেও হবেন না। আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর আদেশ ছাড়াই খুন করেছিলাম। তাই আমি নিজেকে নিয়েই উৎকণ্ঠিত। তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহর রসূল, মরিয়ম (আঃ)-কে প্রদত্ত তাঁর কলেমা এবং তাঁর রূহ। আপনি মাতৃক্রোড়ে থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত ঈসা (আঃ) জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলার অভূতপূর্ব ক্রোধের উল্লেখ করে বলবেন, আমি আজ নিজের চিন্তায়ই মগ্ন। তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যাও।

অতঃপর মানুষ আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ আপনার আগের ও পেছনের সকল গোনাহ্ মার্জনা করেছেন। পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমি আরশের নীচে উপস্থিত হয়ে পরওয়ারদেগারের উদ্দেশে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার সামনে এমন বিষয় খুলে দেবেন, যা পূর্বে কারও কাছে খোলেননি। এরপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা তোল। চাও, যা চাইবে, পাবে। শাফায়াত কর। তোমার শাফায়াত কবুল হবে। সেমতে আমি মাথা তুলে বলব, উম্মতী, উম্মতী, ইয়া রব অর্থাৎ, আমার উম্মতকে মাফ করে দাও। এরশাদ হবে, হে মুহাম্মদ, তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে ভেতরে পৌছে দাও। বাকী দরজাগুলোতে তোমার উম্মত অন্যদের সাথে শরীক। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতের দু'কপাটের মধ্যে দূরত্ব এতটুকু, যতটুকু মক্কা ও হেমইয়ারের মধ্যে অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যে রয়েছে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তিনটি অসত্য ভাষণও উল্লিখিত আছে। এক— তারকারাজি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ঃ هٰذَا رَبِّي এ আমার পরওয়ারদেগার! দুই— কাফেরদের উপাস্য মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে চুরমার করার পর বলেছিলেন—

بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا

অর্থাৎ, বরং এটা তাদের এই বড় মূর্তির কাজ। তিন—কাফেররা তাঁকে মেলায় নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেছিলেন—اِنِّىْ سَقِيْمٌ —আমি অসুস্থ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতের আলেম ও সৎ ব্যক্তিরাও সুপারিশ করবে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, এক ব্যক্তিকে আদেশ করা হবে— ওঠ এবং সুপারিশ কর। সে উঠে আপন বংশধর ও পরিবার-পরিজনের জন্য এবং আমল অনুযায়ী দু'এক ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করবে।

হাউযে কাওছার ঃ হাউয একটি অনন্যসাধারণ দান, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এর গুণাগুণসম্বলিত অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, তিনি দুনিয়াতে এর জ্ঞান এবং আখেরাতে এর স্বাদ নসীব করবেন। এই হাউযের প্রভাব এই যে, কেউ এর পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হয় না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হালকা নিদ্রার পর যখন গাত্রোত্থান করলেন,তখন তাঁর চোখে-মুখে হাসির রেখা সুস্পষ্ট ছিল। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন ঃ একটি আয়াত আমার প্রতি এই মুহূর্তে অবতীর্ণ হয়েছে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ الخ অর্থাৎ, আমি আপনাকে কাওছার দান করলাম।

তিনি আরও বললেন ঃ তোমরা জান কাওছার কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি একটি নির্ঝরিণী, যা আমার পরওয়ারদেগার আমাকে জান্নাতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে একটি বরকতময় হাউয আছে। আমার উম্মত কিয়ামতের দিন এই হাউযে যাবে। এর পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ (মেরাজের সফরে) আমি জান্নাত পরিভ্রমণ করেছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল একটি নহরের উপর, যার দু'সারি মোতি নির্মিত খিলানসমূহ শূন্যগর্ভ ছিল।

আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা কাওছার, যা আপনাকে আপনার রব দান করেছেন। এরপর ফেরেশতা তাতে হাত লাগালে দেখা গেল এর মাটি ইযফির জাতীয় মেশ্‌ক।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, ইন্না আ'তাইনা সূরা অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ কাওছার জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর। এর কিনারা স্বর্ণের এবং এর পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং মেশ্‌কের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এই পানি মুক্তা ও প্রবালের কংকরের উপর প্রবাহিত।

দোযখ ও তার ভয়ানক অবস্থা ঃ লোক সকল, তোমরা ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল দুনিয়ার ধান্দায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের সম্পর্কে গাফেল হয়ে আছ। অথচ এখান থেকে তোমাদের একদিন না দিন চলে যেতে হবে। অতএব, এখানকার চিন্তা বাদ দিয়ে তোমরা সে জায়গার কথা চিন্তা কর, যেখানে তোমরা অবতরণ করবে। অর্থাৎ এটা জানা হয়ে গেছে যে, জাহান্নামের আগুন সকলেরই অবতরণস্থল। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّاوَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থাৎ,— তোমাদের প্রত্যেকেই সেখানে (জাহান্নামে) অবতরণ করবে। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।

এ আয়াত দৃষ্টে অবতরণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত এবং মুক্তি পাওয়া সন্দিগ্ধ। সুতরাং এখন মনে মনে এই অবতরণস্থলের ভয়াবহতা চিন্তা কর। এতে আশা করা যায়,আত্মরক্ষার প্রেরণা জাগ্রত হবে।

হাশরের ময়দানে মানুষ যখন সুপারিশকারীর সুপারিশের ফলাফল জানার অপেক্ষা করবে, তখন অপরাধীদেরকে গভীর অন্ধকার এসে ঘিরে ফেলবে এবং তাদেরকে স্ফুলিঙ্গ বিস্তারকারী আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তাদের কানে আসবে, যা ক্রোধের পরিচায়ক। তখন অপরাধীরা নিজেদের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং সবাই নতজানু হয়ে বসে পড়বে। দোযখের এক ফেরেশতা একথা বলতে বলতে বের হবে ঃ কোথায় অমুকের পুত্র অমুক, যে দুনিয়াতে দীর্ঘ আশা পোষণ করে সৎ কাজে বিলম্ব করত এবং মন্দ কাজে জীবন বরবাদ করত। ফেরেশতা লোহার গদা নিয়ে তার প্রতি ধাবিত হবে এবং আযাবের দিকে টেনে নিয়ে উপুড় করে দোযখের গভীরে নিক্ষেপ করবে। এরপর বলবে, স্বাদ আস্বাদন কর এবং এই অগ্নিশালাতেই বন্দী থাক। এখানে খেতে হবে

আগুন, পান করতে হবে আগুন, বস্ত্র হবে আগুনের এবং শয্যা হবে আগুনের।

দোযখের সাতটি স্তর একটি অপরটির উপরে রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জাহান্নাম, এরপর সাকার, এরপর লাযা, এরপর হুতামা, এরপর সাঈর, এরপর জাহীম এবং সর্বনিম্ন স্তরকে বলা হয় হাবিয়া। হাবিয়ার গভীরতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই; যেমন দুনিয়ার কামনা-বাসনারও কোন সীমা নেই। দোযখের স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্য তেমন, যেমন মানুষের দুনিয়া নিয়ে মত্ত হওয়ার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। কেউ কেউ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকে, আবার কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে আগুনের শাস্তিও তাদের বিভিন্নরূপ হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কণা পরিমাণও যুলুম করবেন না। এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি দোযখে যাবে, তার উপর উপর্যুপরি সব রকম আযাব হওয়া অপরিহার্য নয়, বরং প্রত্যেকের আযাব একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত হবে, যা তার নাফরমানীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এরপরও যে ব্যক্তি ন্যূনতম আযাব ভোগ করবে, তার অবস্থা এমন হবে যে, সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়, সে কষ্টের তীব্রতার বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখে ন্যূনতম আযাব হবে ঃ দু'টি আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। যার ফলে তার মগজ উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করতে থাকবে। দেখ, যার হালকা আযাব হবে, তারই যখন এই অবস্থা হবে, তখন যে ব্যক্তি কঠোর আযাব ভোগ করবে, তার কি অবস্থা হবে? আগুনের আযাবের ব্যাপারে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তবে আঙ্গুল আগুনের কাছে নিয়ে যাও এবং এ থেকে দোযখের আগুন কেমন হবে,তা অনুমান করে নাও। কিন্তু তোমার এই অনুমানও সঠিক হবে না। কেননা, দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুল্য নয়। তবে দুনিয়াতে কোন শাস্তি আগুনের শাস্তির তুলনায় কঠোরতম নয় বিধায় দোযখের শাস্তি বুঝবার জন্যে দুনিয়ার আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নতুবা দোযখীদেরকে দোযখের আগুনের পরিবর্তে দুনিয়ার আগুন দেয়া হলে তারা খুশীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ, দোযখের আগুনের কষ্ট অনেক বেশী। এর তুলনায় দুনিয়ার আগুন যেন সুখের বস্তু। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ার আগুনকে রহমতের পানি দ্বারা ধৌত করার পর এটা দুনিয়ার মানুষের ব্যবহারোপযোগী

হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশে জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে। ফলে, এখন সেটা কাল অন্ধকারে পরিণত হয়ে আছে। অন্য এক হাদীসে আছে, দোযখ তার পরওয়ারদেগারের কাছে অভিযোগ করে বলল ঃ ইলাহী, আমার কতক অংশ কতক অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ্ তাকে দু'টি শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন— একটি শীতকালে ও একটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে তুমি যে অসহ্য গরম অনুভব কর, সেটা দোযখের শ্বাসেরই উত্তাপ। আর শীতকালে যে কনকনে শীত পড়ে, সেটা তারই শ্বাসের প্রভাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক ঐশ্বর্যে লালিত অপরাধীকে উপস্থিত করে আদেশ করা হবে একে আগুনে ডুবিয়ে আন। ডুবানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুনিয়াতে কখনও সুখ পেয়েছিলে কি? সে বলবে, না। পক্ষান্তরে যে মুমিন দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্ট ভোগ করবে, তাকে এনে আদেশ করা হবে, একে জান্নাতে ডুবিয়ে আন। ডুবানোর পর তাকে প্রশ্ন করা হবে, দুনিয়াতে তুমি কখনও কষ্ট ভোগ করেছ কি? সে বলবে, না।

দোযখীদের দেহ্ থেকে এত বেশী দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ প্রবাহিত হবে যাতে দোযখীরা ডুবে যাবে। কোরআনের ভাষায় এই পুঁজের নাম "গাস্সাক"। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি জাহান্নামের এক বালতি গাসসাক দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তবে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। দোযখীরা পিপাসায় কাতরোক্তি করলে এই পুঁজ তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। সেমতে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ -

অর্থাৎ— তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং সেটা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হবে। চারদিক থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু; কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا -

অর্থাৎ— তারা পানির জন্যে কাতরোক্তি করলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটা কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!

এরপর তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেয়া হবে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ -

অর্থাৎ— অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীরা, তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে। অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি— পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মত।

আরও বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنِ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ— এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে। এর মোচা সাপের ফণার মত। জাহান্নামীরা এটা ভক্ষণ করবে, অতঃপর এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি এর সঙ্গে তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। পরে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে জাহান্নাম।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ -

অর্থাৎ— তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদেরকে পান করানো হবে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا -

অর্থাৎ— আমার কাছে আছে শৃঙ্খল, জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি যাক্কুমের একটি ফোঁটা দুনিয়ার স্থলভাগে পড়ে যায়, তবে পরিবেশ দূষণের কারণে দুনিয়ার সকল মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। অতএব, এটা যাদের খাদ্য হবে, তাদের কি দশা হবে!

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ের উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে আগ্রহী হও এবং যে বিষয়ে সতর্ক করেছেন, তাকে ভয় কর ও সতর্ক হও। অর্থাৎ তাঁর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং জাহান্নামকে ভয় কর।

জান্নাত ও তার অপার সুখ ঃ দোযখের বিপরীতে জান্নাত ও তার অশেষ আনন্দের কথাও স্মরণ করা দরকার। কেননা, যে ব্যক্তি এতদুভয়ের যে কোন একটি থেকে দূরে থাকবে, সে অবশ্যই অপরটিতে অবস্থান করবে। অতএব, দোযখের ভয়াবহতা চিন্তা করে অন্তরে ভয় সৃষ্টি করার সাথে সাথে জান্নাতের অনন্ত সুখ ও আনন্দের কথা ভেবে অন্তরে আশার সঞ্চার করা জরুরী।

জান্নাতের অবস্থা জানতে চাইলে তোমার উচিত কোরআন মজীদ পাঠ করা। এ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনার চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং সূরা আর-রহমানের وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সূরা ওয়াকেয়া ও অন্যান্য সূরা পাঠ কর। আর যদি হাদীসের দৃষ্টিতে জান্নাতের বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাও, তবে এক্ষেত্রে জান্নাতের কয়েকটি বিষয়ই বর্ণনা সাপেক্ষ।

(১) জান্নাতের সংখ্যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা আর-রহমানের

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্য নির্মিত। এর যাবতীয় আসবাবপত্র এবং অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই রৌপ্য নির্মিত হবে। এছাড়া আরও দু'টি জান্নাত থাকবে, যাতে আসবাবপত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছু হবে স্বর্ণ নির্মিত।

(২) জান্নাতের দরজাসমূহ মৌলিক এবাদতের সংখ্যানুসারে বিভিন্ন রূপ হবে। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দু'টি জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে। জান্নাতের দরজা আটটি। যে ব্যক্তি নামাযী হবে, তাকে নামাযের দরজা দিয়ে, যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, তাকে রাইয়্যান দরজা দিয়ে, যে ব্যক্তি দাতা হবে, তাকে দানের দরজা দিয়ে এবং যে ব্যক্তি মুজাহিদ হবে, তাকে জেহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। তবে কেউ এমনও হবে, যাকে সকল দরজা দিয়েই ডাকা হবে।

(৩) জান্নাতের কক্ষ ও সুউচ্চ স্তরও বিভিন্নরূপ হবে। মানুষের বাহ্যিক এবাদত ও আন্তরিক এবাদতের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে, তেমনি এগুলোর ছওয়াবেও পার্থক্য থাকবে। সুতরাং কেউ যদি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর পেতে চায়, তবে এবাদতের প্রতিযোগিতায় তার সকলের অগ্রে থাকার চেষ্টা করা উচিত। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীরা উচ্চস্তর বিশিষ্টদেরকে নিজেদের উপরে এমনভাবে দেখবে, যেমন তোমরা তারকাসমূহকে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে যেতে দেখ। কারণ, জান্নাতীদের মধ্যেও মর্তবার অনেক তফাৎ হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এই স্তরসমূহ কি কেবল পয়গম্বরগণই পাবেন? তাদের ছাড়া অন্যরা কি পাবে না? তিনি বললেন ঃ কেন পাবে না! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এই স্তরসমূহের অধিকারী তারা হবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

হযরত জাবের বর্ণনা করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন আমাদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে জান্নাতের জানালাসমূহের বর্ণনা দেব। আমি বললাম ঃ খুব ভাল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ জান্নাতের জানালা হবে মণিমুক্তা নির্মিত। এগুলো দিয়ে ভেতরের বস্তু বাইরে এবং বাইরের বস্তু ভিতরে মনে হবে। এগুলোর সুখ ও আনন্দ কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কেউ মনে মনেও কল্পনা করেনি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এসব জানালা কারা পাবে? তিনি বললেন ঃ যারা সালামের প্রসার ঘটায়, আহার করায়, সর্বদা

রোযা রাখে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমায়, তখন নামায পড়ে। আমরা বললাম ঃ এসব কাজের শক্তি কার আছে? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের এই শক্তি রয়েছে। আমি তোম্যদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার পর সালাম করে অথবা সালামের জওয়াব দেয়, সে সালামের প্রসার ঘটায়। যে নিজের পরিবার-পরিজনকে পেট ভরে আহার করায়, সে খাদ্য খাওয়ায়। আর যে রমযানের রোযা রাখে এবং প্রতিমাসে তিনটি করে রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখে। যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, সে রাতে নামায পড়ে, যখন অন্যরা অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজারীরা ঘুমায়।

(৪) জান্নাতের প্রাচীর, যমীন, বৃক্ষ ও নহর সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, যারা এগুলোতে থাকবে, তারা এসবের আকৃতি দেখে কতই না আনন্দিত হবে! পক্ষান্তরে যারা এ থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কতই না পরিতাপ করবে!

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাত প্রাচীরের এক ইট হবে রৌপ্যের এবং এক ইট স্বর্ণের। এর মাটি হবে জাফরান এবং কাদা মেশক। এক হাদীসে আছে— জান্নাতের নহরসমূহ মেশকের টিলা অথবা মেশকের পাহাড় থেকে নির্গত। অন্য এক রেওয়ায়েতে রসূল করীম (সাঃ) বলেন— জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী একশ' বছর চললেও তা শেষ হবে না। কোরআন মজীদে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (সুদীর্ঘ ছায়ায়) বলা হয়েছে।

হযরত আবু উমামা বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম বলাবলি করতেন, আল্লাহ তা'আলা বেদুঈন ও তাদের সমস্যাদির দ্বারা আমাদেরকে উপকার পৌছান। একবার জনৈক বেদুঈন এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে কষ্টদায়াক বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন। জান্নাতে কোন কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকবে, এটা আমার জানা ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কোন্ বৃক্ষের কথা বলছ? সে আরয করল ঃ আমি বদরী বৃক্ষের কথা বলছি, যাতে কাঁটা থাকে। তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ অর্থাৎ, কন্টকহীন বদরী বৃক্ষের তলে। আল্লাহ তা'আলা এই বৃক্ষের কাঁটা কেটে দেবেন এবং প্রত্যেক কাঁটার জায়গায় একটি ফল লাগাবেন। প্রত্যেক ফলের উৎকৃষ্ট স্বাদ হবে এবং একটি অপরটির সাথে মিলবে না।

(৫) জান্নাতীতের পোশাক, শয্যা, আসন, তাঁবু ইত্যাদিও উৎকৃষ্টতর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ -

অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীদেরকে স্বর্ণের কংকণ ও মোতি পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী। কোরআনের আয়াতসমূহে এর আরও অনেক বিবরণ রয়েছে। হাদীসেও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে— যে জান্নাতে দাখিল হবে, সে নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে। সে অভাবগ্রস্ত হবে না। তার বস্ত্র পুরাতন হবে না। যৌবন অক্ষুণ্ন থাকবে। জান্নাতের নেয়ামত এমন, যা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং মনও কল্পনা করেনি।

(৬) জান্নাতীদের আহার্য বস্তু সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের খাদ্য, ফলমূল, মোটা তাজা পাখি, মান্না ও সালওয়া, মধু, দুধ, আরও অসংখ্য প্রকারের বস্তু হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে—

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا -

অর্থাৎ— যখনই তারা সেখানকার কোন ফল খাওয়ার জন্যে পাবে, তখনই বলবে— এটা তো আমরা পেয়েছিলাম ইতিপূর্বে। বস্তুত তাদেরকে এক রকম খাদ্যই দেয়া হবে। জান্নাতীদের পানীয় দ্রব্যের অবস্থাও অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ছওবান (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। এক পর্যায়ে সে বলল ঃ পুলসিরাতে সর্বপ্রথম কারা অবতরণ করবে? তিনি বললেন ঃ ফকীর-মুহাজিরগণ। ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জান্নাতে যাওয়ার পর তারা কি উপঢৌকন পাবে? তিনি বললেন ঃ মাছের কলিজার কাবাব। সে বলল ঃ এরপর তাদের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের বলদ, যেগুলো জান্নাতের কিনারায় খায়-দায়। এগুলো তাদের জন্যে যবাই করা হবে। সে প্রশ্ন করল ঃ তারা পানি কী পান করবে?

তিনি বললেন ঃ তারা "সালসাবিল" নামক ঝরনা থেকে পানি পান করবে। ইহুদী বলল ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের জওয়াবে বললেন ঃ জান্নাতীদের এক একজনকে একশ' পুরুষের পানাহার ও সহবাসের শক্তি দান করা হবে। ইহুদী বলল ঃ যে পানাহার করে, তার পায়খানা করার প্রয়োজন হয়। তিনি বললেন ঃ পায়খানার পরিবর্তে তাদের ত্বক থেকে মেশকের মত প্রবাহিত হবে। এতেই পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের পাখী দেখে তুমি তা খাওয়ার ইচ্ছা করলে তোমার সামনেই পাখীটি যবাই হয়ে ভাজা হয়ে যাবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ—এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন— জান্নাতীদের মধ্যে সত্তরটি স্বর্ণের পিয়ালা পেশ করা হবে। প্রত্যেকটিতে নতুন ধরনের খাদ্য থাকবে, যা অন্যটিতে থাকবে না।

(৭) হূর ও গেলমানের গুণাবলী কোরআন মজীদ নানা জায়গায় বর্ণনা করেছে এবং হাদীসে অধিক ব্যাখ্যাসহকারে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহর পথে একবার সকালে অথবা বিকালে যাওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারও পা রাখার জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে কোন রমণী পৃথিবীতে এসে গেলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল উজালা হয়ে যাবে এবং সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যাবে। তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা মূল্যবান।

আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন–

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

অর্থাৎ, এই রমণীগণ যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ।

আয়াতের তাফসীরে তিনি এরশাদ করেন— পর্দার অন্তরালে তাদের মুখাকৃতি আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখা যাবে। তাদের অলংকারের সামান্য

মোতিও পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে দেবে। তাদের দেহে সত্তরটি কাপড় এমন থাকবে যে, মানুষের দৃষ্টি সেগুলো পার হয়ে যাবে। তাদের গোছার মগয অস্থির ভিতরে দৃষ্টিগোচর হবে।

হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—মে'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতের ইয়াবযখ নামক এক জায়গায় গেলাম। সেখানে মোতি, সবুজ পান্না ও লাল পদ্মরাগ মণির তাঁবু ছিল। তাঁবুর রমণীরা আমাকে ' আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ' বললে আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম ঃ এই কণ্ঠস্বর কোন্ রমণীদের? তিনি বললেন ঃ এই রমণীগণ তাঁবুর মধ্যে পর্দানশীন। তারা পরওয়ারদেগারের কাছে আপনাকে সালাম করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ

অর্থাৎ, সুলোচনা ও তাঁবুতে অবস্থানকারিণী রমণীগণ।

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (পবিত্র স্ত্রীগণ) আয়াতাংশের তাফসীরে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ পবিত্র হওয়ার অর্থ তারা হায়েয, প্রস্রাব-পায়খান, থুথু, বীর্য, প্রসব ইত্যাদি থেকে পবিত্র হবে।

আবদুলাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির অধীনে এক হাজার খেদমতগার থাকবে। প্রত্যেক খেদমতগার এমন কাজ করবে, যা অন্যে করবে না। হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, জান্নাতে সুলোচনা রমণীগণ গান গায় এবং বলে— আমরা অপরূপা সুন্দরী রমণী। ভদ্রলোকদের জন্যে আমাদেরকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ

অর্থাৎ, তারা বাগানে সম্বর্ধিত হবে।

আয়াতাংশের তাফসীরে ইয়াহইয়া ইবনে কাছির বলেন ঃ জান্নাতে রাগ ও সঙ্গীত থাকবে।

আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতী

ব্যক্তির শিয়র ও পায়ের কাছে বসে দু'জন হূর অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে গীত শুনায়। মানুষ ও জিন উৎসাহভরে এই গীত শুনে।

আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) শুভ লক্ষণ পছন্দ করতেন। মাগফেরাত আশা করার মত নেক আমল আমাদের নেই বিধায় আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর অনুকরণে শুভ লক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আশা করছি, আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের পরিণাম শুভ করবেন। সেমতে আমরা এই গ্রন্থটি রহমতের আলোচনা দ্বারা সমাপ্ত করছি।

রসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ্ তা'আলার একশ'টি রহ্মত থেকে মাত্র একটি রহ্মত পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে নাযিল করেছেন। এ থেকেই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী পরস্পর দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। তিনি নিরানব্বইটি রহ্মত পেছনে রেখেছেন। সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন বান্দাদের প্রতি রহ্মত করবেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচ থেকে একটি লিখিত কাগজ বের করবেন। তাতে লেখা থাকবে— আমার রহ্মত আমার গযবের উপর প্রবল। আমি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিকতর মেহেরবান। এরপর দোযখ থেকে জান্নাতীদের দ্বিগুণ সংখ্যক লোক বের হয়ে যাবে।

এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেন— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান হবেন এবং বলবেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে একজন করে ইহুদী ও খৃস্টানকে দোযখে নিক্ষেপ করেছি।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— যখন দোযখীরা দোযখে একত্রিত হবে এবং তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুসংখ্যক মুসলমানও থাকবে, তখন কাফেররা মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করবে— তোমরা কি দুনিয়াতে মুসলমান ছিলে না? তারা জওয়াব দিবে, হাঁ, ছিলাম। কাফেররা বলবে— তাহলে তোমাদের ইসলাম তোমাদের জন্যে উপকারী হল না কেন? আজ তোমরা ও তো আমাদের সাথে দোযখে রয়েছ। মুসলমানরা বলবে— আমরা অনেক গোনাহ্ করেছিলাম। তাই সাজাপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই কথাবার্তা শুনবেন এবং আদেশ করবেন, দোযখে যে সকল মুসলমান রয়েছে, তাদের সকলকে বের করে দাও। অতঃপর আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে বের করে আনা হবে। এটা দেখে কাফেররা বলবে— হায়, আমরাও মুসলমান হলে এমনিভাবে মুক্তি পেতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, প্রায়ই কাফেররা বাসনা করবে, যদি তারা মুসলমান হত!

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী জননীর যে অনুকম্পা, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুকম্পা তার চেয়ে অনেক বেশী।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার সৎকর্ম পাপকর্মের তুলনায় বেশী হবে, সে বে-হিসাব জান্নাতে দাখিল হবে। যার সৎকর্ম ও পাপকর্ম সমান সমান হবে, সে সামান্য হিসাবের পর জান্নাতে দাখিল হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শাফায়াত সে ব্যক্তির জন্যে, যার পিঠ পাপকর্মের বোঝায় অত্যধিক ভারী হবে।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— কিয়ামতের দিন আরশের নীচ থেকে ঘোষণা করা হবে— হে উম্মতে মুহাম্মাদী, আমার যে হক তোমাদের যিম্মায় ছিল, তা আমি মাফ করে দিলাম। এখন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল হক রয়েছে, সেগুলো তোমরা একে অপরকে মাফ করে দাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ্ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অপার ও অসীম রহমতের সুসংবাদ দেয়। সেমতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সাথে সেই আচরণ না করেন, যার আমরা যোগ্য এবং তাঁর কৃপা, দান, অনুগ্রহ ও রহমতের আচরণই যেন আমাদের নসীব হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا -